৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা □ এপ্রিল-জুন ২০০৬ □ রবিউল আউয়াল-জমাদিউল আউয়াল ১৪২৭ □ চৈত্রজ্যৈষ্ঠ ১৪১২-১

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক
রেজিঃ নং - ডিএ ২০/৭৬

৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬
রবিউল আউয়াল-জমাদিউল আউয়াল ১৪২৭
চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৪১২-১৩

সৌজন্য কপি

সম্পাদক
মোঃ ফজলুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
ডঃ আ. ন. ম. আবদুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
এম. এ. আহাদ
মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ

গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল-জুন ২০০৬

রবিউল আউয়াল-জমাদিউল আউয়াল ১৪২৭

চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৪১২-১৩

যোগাযোগ :

নির্বাহী সম্পাদক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩[illegible]

সম্পাদনা সহকারী ঃ মোঃ আইয়ুব আলী

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মনসুর আহমেদ

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA

[A Quarterly Research Journal of the Islamic Foundation Bangladesh]

Regd. No. DA 20/76

April-June 2006

Editor

MD. Fazlur Rahman

Executive Editor

Dr. A. N. M. Abdur Rahaman

Associate Editor

M. A. Ahad

Mohammad Harunur Rashid

Edited and published by MD. Fazlur Rahman, Director General, Islamic Foundation Bangladesh. Printed at the Islamic Foundation Press Agargaon, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Bangladesh.

E-mail : info@Islamicfoundation - bd.org

Website : WWW.Islamicfoundation - bd.org

Price : Tk. 40.00

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং-৪৩.২০.১৬.০০.০০.০৩.২০০৫-২০

তারিখ ঃ ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬

প্রিয় সহকর্মী,

আপনি নিশ্চয় একমত হবেন যে, আমাদের মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী এবং ভেষজ ব্যবহারের দিক থেকে বিবেচনায় বেশী করে নিম গাছ লাগানোর কোন বিকল্প নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিম গাছকে (Azadirachta indica) একুশ শতকের গাছ হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদেরকেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

নিম গাছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো কীটনাশক হিসেবে এর ব্যবহার। ফসলের ক্ষেতে কৃষকেরা নিমের বিভিন্ন ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা-মাকড় দমন করতে পারে। রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় ধ্বংস হয় বটে তবে তাতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এ ছাড়া রাসায়নিক কীটনাশক ফসলের মাধ্যমে মানব দেহে প্রবেশ করে নানা রকম রোগেরও বিস্তার ঘটায়। অন্যদিকে নিমের কাঙ্খিত ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবেশ ও আমাদের জনগণকে রাসায়নিক কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারি। এ ছাড়া চাল, ডাল, গম ইত্যাদি খাদ্যজাত দ্রব্য ছাড়াও কাপড়-চোপড় পর্যন্ত পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিমের শুকনো পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিমগাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং মাটিতে পানির স্তর ধরে রাখার কারণে মরুময়তারোধকারী। একটি পূর্ণ বয়স্ক নিমগাছ ১০টি এয়ারকুলারের সমান শীতলতা দেয় বলে নিমগাছকে প্রাকৃতিক এয়ারকুলারও বলা যায়। পরিবেশ বান্ধব এ গাছ ঔষধ প্রস্তুত, পরিবেশ রক্ষা এবং প্রসাধনী প্রস্তুতে বিশেষ অবদান রাখে। এর পাতা, বাকল, ফুল, ফল, বীজ সবকিছুই মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। নিমগাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ। এর চারা উৎপাদনও সহজ এবং সুলভমূল্যে সর্বত্রই পাওয়া যায়।

আমাদের চলমান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে আরো গতিশীলতা আনয়ন এবং বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ বাছাইপূর্বক রোপণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে বিবেচনায় আমাদেরকে দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে নিমগাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা ইতোমধ্যে সারাদেশে এক কোটি নিমগাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নিয়েছি। বন বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাছে বেশ কিছু চারা মজুদ রয়েছে। বেসরকারী নার্সারীগুলোতেও যথেষ্ট পরিমাণ চারা মজুদ রয়েছে। তদুপরি আগামী মে-জুন মাসে নতুন চারা উৎপাদন মৌসুমে এক কোটি নিম চারা উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে আপনার মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর সমূহকে নিমগাছ লাগানোর ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বন বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা প্রয়োজনে বেসরকারী নার্সারী থেকে নিমচারা সংগ্রহ করে রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনার মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশ প্রদানের জন্য আপনার ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

শুভেচ্ছান্তে—

আপনার একান্ত

(খালেদা জিয়া)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডি.ও. নং ৪৩.৫৪.১৬.০০.০০.০১.২০০৩- **০৯ ডিসেম্বর, ২০০৩**

বিষয় ঃ যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন।

প্রিয় সহকর্মী,

উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে অনেক বাধা এবং বাস্তব অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসাবে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বছরে ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন ইনডেক্স-এ আমাদের এই অগ্রগতির স্বীকৃতি রয়েছে। অবশ্য আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

২। কোনো জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন-মাত্রা বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হচ্ছে সেখানকার নারীদের অবস্থা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, বাংলাদেশের নারীরা উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করছে। নারীর উন্নয়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছি। প্রণয়ন করেছি এসিড দমন আইন ২০০২ এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২।

৩। তথাপি কিছু কিছু সামাজিক কুপ্রথা নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথে এবং নারী নির্যাতন রোধে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। এর একটি হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যৌতুক ব্যবস্থা সরাসরি, এবং কিছু ক্ষেত্রে ছদ্মাবরণে, সমাজে টিকে রয়েছে। ফলে নারীরা যৌতুকের নামে সহিংসতা ও অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, দেশের নারী নির্যাতনের মূল একটি কারণ হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকের কারণে সহিংসতা রোধে আইন রয়েছে। কিন্তু যৌতুক একটি জটিল সামাজিক প্রপঞ্চ (অবশ্য এর সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবেচনাও জড়িত থাকে, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষেত্রে)। সেজন্য যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনও দরকার। আমাদের দেশের কোনো ধর্ম এবং শাশ্বত মূল্যবোধ যৌতুক ও যৌতুক সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠুরতা সমর্থন করে না। যৌতুক প্রথা দেশ ও জাতি হিসাবে আমাদের জন্য সম্মানের নয়। দাবী করে যৌতুক নেয়া, আর দাবী ছাড়া যৌতুক নেয়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। এই কুপ্রথা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

৪। সরকার নারী নির্যাতন রোধে বদ্ধপরিকর। তবে অমানবিক যৌতুক প্রথার শিকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত বিধায় এর পূর্ণাঙ্গ উচ্ছেদের জন্য সামাজিক প্রচেষ্টা নিতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক জীবনে আমাদেরকে সর্বপ্রকারের যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। আমাদেরকে এ জন্য সকল স্তরে যৌতুক নিবারণ এবং সচেতনতা সৃষ্টিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। আমাদেরকে সমাজ জীবনে এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, যৌতুক একটি নিপীড়নমূলক ও অসম্মানজনক বিষয়। যৌতুক বিনিময়, গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ের জন্যই লজ্জার।

৫। বর্ণিত অবস্থায় একটি সুস্থ, সম্মানজনক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের পথে অন্তরায়, বিষবৃক্ষ-রূপ যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনে আপনার ব্যক্তিগত/প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি। আশা করি আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সকলে এই কুপ্রথা থেকে দেশকে একদিন মুক্ত করতে পারবো।

শুভেচ্ছান্তে,

আপনার একান্ত

(খালেদা জিয়া)

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা পত্রিকাটির চলমান সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে-এর ৪৫ বছর পূর্ণ হলো। যে কোন পত্রিকার জন্য ৪৫ বছর নিঃসন্দেহে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। আজকের এই শুভ মুহূর্তে মৌলিক ইসলামী আদর্শ প্রচারে এ পত্রিকাটির আমরা আরও গৌরবদীপ্ত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং আমরা আমাদের সর্বস্তরের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

এ সংখ্যাটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পত্রিকাটির ৪৫ বৎসর পূর্তির এ শুভ মুহূর্তে আমরা আমাদের প্রিয় স্বাধীনতার ৩৫ বৎসর উদ্‌যাপন করেছি। মহান এ দিবসটি আমাদের জাতীয় জীবনের এক ঐতিহাসিক ও গৌরবদীপ্ত অধ্যায় ও মাইলফলক। আমরা তাই স্বাধীনতার জন্য অকাতরে আত্মদানকারী শহীদদের অবদানের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করছি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শাহাদত বরণ করেছেন তাঁদের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবার পরিজনদেরকেও আমরা শ্রদ্ধা জানাই ও তাঁদের মঙ্গল কামনা করছি।

বর্ষপরিক্রমায় আবারও পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস বিশেষ রহমত হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মহান জন্ম ও ওফাতের স্মৃতিবিজড়িত এ মাসে আমরা স্মরণ করছি উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ্ নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাব ও তিরোধান, তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী ও আদর্শ। আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাঁর করুণাসিক্ত হয়ে মানব জাতির হিদায়াত ও নাজাতের উসিলা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তাঁরই প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নিঃসন্দেহে সমগ্র মানব সভ্যতার চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধন ও মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখতে তাঁর অনুপম আদর্শ বর্তমান ও অনাগত মানব জাতির জন্য শাশ্বত এক পাথেয় হিসেবে এবং সুনিশ্চিতভাবেই কার্যকর ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ্।

নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রতি খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মমত্ববোধ ও কল্যাণ কামিতার এক মহান মূর্ত প্রতীক। তিনিই অবহেলিত ও লাঞ্ছিত নারী সমাজকে মুক্তি ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, নারী-পুরুষ একে অপরের পরিচ্ছদ। মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির পথিকৃত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই। ইসলামই নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করেছে। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে এক শ্রেণীর নারীদের মধ্যে যে অশ্লীলতা ও রুচিবোধহীন আচরণ ও কার্যকলাপ চলছে তা ইসলাম কখনো সমর্থন করেনা। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একটি রুচিশীল ও সুশিক্ষিত নারী সমাজ গঠনই নিশ্চিত করতে চায়।

সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে পর্যায়ক্রমে মানব সভ্যতার ব্যাপক উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নের গতিধারা বেগবান হয়েছে। উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে নারীর অবদান বা পদচারণা লক্ষ্য করা যায় না। এতদসত্ত্বেও ধর্ষণ, কর্মক্ষেত্রে অগ্নিদগ্ধ, নানাবিধ শারীরিক নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাসসহ নারী সমাজ মারাত্মকভাবে নানাবিধ নির্যাতন-জুলুমের শিকার হচ্ছে।

এমনি প্রেক্ষাপটে গত ৮ মার্চ সারা বিশ্বব্যাপি পালিত হয়েছে বিশ্ব নারী দিবস। এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নারীকে দেবে সমতা'। তবে আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে পারি যে, বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে জাতীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত নারী সমাজের সুদৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি হয়েছে। তবে স্মর্তব্য যে, অতীব আবেগ তাড়িত হয়ে যেন আমরা নারীকে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথ হতে কোনক্রমেই বিচ্যুত না করি। অতএব, নারী ক্ষমতায়নের সঙ্গে এ অতীব জরুরী বিষয়টির প্রতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষভাবে নীতি নির্ধারকদের সচেতনভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অতএব, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে দেশ গড়ার মহান এক ব্রত বিবেচনা করে পুরুষের পাশাপাশি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে নারীর অধিকতর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির ক্ষেত্রগুলি অধিকতর বেগবান হবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং আল্লাহ্‌র অসীম রহমত কামনা করছি।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় খুলাফা-ই রাশিদূন-এর কর্মধারা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন / ৯
মানব জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রভাব
ড. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন / ৩০
হযরত শাহজালাল (র)-এর জীবন ও কর্ম
মোঃ হাবিবুর রহমান / ৪৬
মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) : ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর অবদান
ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও ড. মোঃ ছানাউল্লাহ / ৫৮
বিবাহ এবং শিশুর উপর এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব
ড. মোঃ ময়নুল হক / ৭৩
বাংলা কাব্যে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের ব্যবহার : অতীত ও বর্তমান
ড. মোঃ আবদুল করিম ও মোঃ শাহজাহান কবীর / ৯২
বাংলা উপন্যাসে মুসলিম প্রয়াস : প্রথম পর্ব
শেখ রেজাউল করিম / ১০৯
ইবনুল জাওযীর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম' একটি পর্যালোচনা
ড. মোঃ রহিম উল্যাহ / ১১৯
আল্লামা কুরতুবী (র) ও তাঁর তাফসীর পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা
ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ ও মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী / ১৩২
গণিত শাস্ত্রের উদ্ভব ও উৎকর্ষ সাধনে মুসলমানদের অবদান : পর্যালোচনা
ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন / ১৪১
বিবাহোত্তর ওয়ালীমা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও দেশীয় প্রচলন
মোঃ আকতার হোসেন / ১৫৫
ইসলামে সন্তানের প্রতিপালন : পর্যালোচনা
ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ / ১৬৮
হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) : তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান
মোঃ জাকির হোসেন / ১৮৩
দ্বীন ঃ আল কুরআনের একটি মৌলিক পরিভাষা
আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুসা / ২০১
স্বদেশী আন্দোলনের মুসলিম সাহিত্য প্রয়াস : 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য'
আছমা সুলতানা / ২১২
হাদীস শাস্ত্রে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা)-এর অবদান
তাহেরা আরজু খান / ২১৮

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় লেখার নিয়মাবলী

- পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা টাইপ/কম্পিউটার কম্পোজ করা দুই কপি—গবেষকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ নির্বাহী সম্পাদক বরাবর আবেদনপত্রসহ পাঠাতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে"এ্যাপল"-এ কম্পোজকৃত Floppy Disk-সহ জমা দিতে হবে। **প্রতিটি প্রবন্ধ টাইপ/কম্পোজকৃত অবস্থায় ১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।** প্রবন্ধ জমা দেয়ার সময় আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, এটি প্রবন্ধ/বই আকারে অন্য কোন প্রকাশনা সংস্থা বা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি।
- সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় যৌথ লেখকদের লেখা তুলনা-মূলক বেশি জমা হচ্ছে। এই ধরনের যৌথ লেখার কারণে প্রকারান্তরে পত্রিকার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। বিধায়, সম্মানিত লেখক/গবেষকদের যৌথ লেখা পাঠানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।
- তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে—ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২০-২২। পত্রিকা থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে—মোহাম্মদ আজরফ, আবুল হাশিম : জীবন ও চিন্তাধারা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, ঢাকা, পৃ.৮-১৩।
- কুরআনুল করীমের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম'-এর অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।
- **কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধসমূহ কম্পোজ করার পর কপি মিলিয়ে জমা দেওয়া হয় না। ফলে সম্পাদনা এবং প্রুফ পর্যায়ে রেফারেন্স গ্রন্থের সাথে কপি মিলাতে গিয়ে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়। এতে সন-তারিখ এবং কুরআনুল করীম হতে উদ্ধৃত সূরা ও আয়াত নম্বরে ভুল পাওয়া যায়। এ বিষয়গুলো আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল প্রবন্ধ জমা দিতে হবে।**
- রচনা মনোনীত হলেও তা প্রকাশের অগ্রিম প্রতিশ্রুতিপত্র দেয়া হয় না এবং অমনোনীত লেখা ফেরতও দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত ও তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকের।
- প্রকাশিত রচনার ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।
- পত্রিকার জন্য লেখা, বিনিময় পত্রিকা এবং গ্রন্থ সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি নির্বাহী সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- জুলাই থেকে শুরু করে প্রতি তিন মাস অন্তর **'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'** প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখাসহ (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকাসহ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য গ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায়।
- **একত্রে কমপক্ষে ৫ কপি পত্রিকা নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩০% হারে এজেন্সী কমিশন দেয়া হয়। এজেন্ট হওয়া বা এজেন্সী সুবিধা গ্রহণের জন্য কোনরূপ আবেদন পত্রের প্রয়োজন হয় না। ৫ কপির কম ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার অনুরূপ হারে কমিশন প্রযোজ্য হবে।**
- আগ্রহী ব্যবসায়ী এবং হকারগণও সারা দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে কোন বিক্রয় কেন্দ্র থেকে উপরোক্ত সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় খুলাফা-ই রাশিদূন-এর কর্মধারা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন*

মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর যে চারজন প্রধান সাহাবী ইসলাম সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, ইতিহাসে তাঁদেরকেই 'খুলাফা-ই-রাশিদূন' নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় 'খিলাফাতে রাশিদা'। খুলাফা-ই-রাশিদূন' এর শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী না থাকলেও বিশ্ব ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিক নয়, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও খুলাফা-ই রাশিদুন-এর শাসন আমলকে মানব ইতিহাসের 'স্বর্ণ-যুগ' বলে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা কায়িমে খুলাফা-ই-রাশিদূন যে আদর্শ রেখে গেছেন তা তুলে ধরা এবং সে আলোকে একটি আদর্শ ও কল্যাণকর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধটি লেখা। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ওপরে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা হলো।

ইসলামী সমাজ

সংক্ষেপে বলতে গেলে কুরআন-সুন্নাহ্ ও খুলাফা-ই-রাশিদুন-এর আদর্শের ওপর ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। এ সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা হলো মানব জাতি এক ও অভিন্ন পিতা-মাতা থেকে উদ্ভূত এবং একই চরম লক্ষ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ একটি পরিবার সদৃশ। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "হে মানুষ ! তোমাদের সেই মহান রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সকলকে একই মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন।"[১] মানব জাতির এই ঐক্যের ধারণা গড়ে ওঠেছে আদম ও হাওয়া (আ)-এর অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের আলোকে। প্রতিটি মানব সন্তানই প্রথম পিতা ও প্রথম মাতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব পরিবারের একজন সদস্য।

---

* প্রাবন্ধিক, লেখক, গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।

১. আল কুরআন, সূরা আন্ নিসা ঃ ১

www.pathagar.com

অতএব, অভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগের ব্যাপারে তার তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন তার ওপর অভিন্ন দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। মানুষ যখন উপলব্ধি করবে তাঁরা সকলেই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আদম ও হাওয়া (আ)-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, তখন আর বর্ণ-বিদ্বেষ, সামাজিক অবিচার কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের অবকাশ থাকবে না। অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের দরুন লোকেরা যেমন প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ, তেমনি সামাজিক আচরণেও তারা হবে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও হাদীসে প্রকৃতি ও উৎসের দিক থেকে মানবীয় ঐক্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো বর্ণগত অহমিকা ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে নির্মূল করা এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথকে সুগম করে তোলা (আল কুরআন ৪ ঃ ১ ; ৭ ঃ ১৮৯ ; ৪৯ ঃ ১০-১৩)।

ইসলামে সামাজিক জীবনের পটভূমি হিসেবে উৎস ও লক্ষ্যের এই একতা ও অভিন্নতার ওপরই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা হলো সমাজের পরিপূরক। এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। ব্যক্তি তাঁর সমাজের অভিন্ন কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে দায়ী। এখানে কোন রাষ্ট্র ব্যক্তিকে উৎপীড়ন এবং তার স্বাধীন সত্তাকে হরণ করতে পারে না, অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিও সমাজকে শোষণ এবং রাষ্ট্রকে দুর্নীতিগস্ত করার অধিকারী নয়। এখানে পরস্পরের সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে পুরোপুরি সমতা। সর্বোপরি এখানে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রয়েছে একটি গঠনমূলক মিশ্রক্রিয়া।[২]

ইসলামে মানবীয় ঐক্যের ধারণা শুধু এর উৎসের মধ্যেই নয়, বরং এর চূড়ান্ত লক্ষ্যের মধ্যেও নিহিত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জন। আমরা সবাই তাঁর কাছেই ফিরে যাব। কুরআনের ভাষায়— আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন-মৃত্যু সবকিছুই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। মহান আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাই তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

খিলাফতের ধারণা

'খিলাফত' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কারো স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর 'খলীফা' শব্দের অর্থ প্রতিনিধি (deputy) স্থলবর্তী। এর বহুবচন 'খুলাফা'।[৩] 'খলীফা' শব্দের বিশেষ অর্থ মহানবী (সা)-এর প্রতিনিধি।[৪] পবিত্র কুরআনে 'খলীফা' শব্দটি একবচনে মাত্র দু'বার এবং বহুবচনে সাতবার ব্যবহার করা হয়েছে।[৫] ইসলামে 'খিলাফত' এমন একটি শাসন

---

২. হামমুদাহ আবদালাতি, *ইসলামের রূপ-রেখা,* I.I.F.S.O-১ম সং, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

৩. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic,* Macdonald and Evants LTD. London, 1980, p. 257.

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৯ম খ., ইফাবা, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ৩৯৩।

৫. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খ., ইফাবা ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৭০।

www.pathagar.com

ব্যবস্থার নাম যা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ্ কর্তৃক পরিচালিত। এই শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ শাসক। মানুষের মর্যাদা হলো, সে সর্বোচ্চ শাসকের প্রতিনিধি বা খলীফা এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে সর্বোচ্চ শাসকের আইনের অনুগামী। খলীফার কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহ্র আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।[৬]

খিলাফত সম্পর্কে খুলাফা-ই-রাশিদুন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খিলাফত একটি নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কিংবা নেতৃত্ব দেওয়া তাঁদের মতে খিলাফত নয় বরং তা বাদশাহী বা রাজতন্ত্র। খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবীগণ পোষণ করতেন, আবু মূসা আশআরী (রা) তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে—ইমামত অর্থাৎ খিলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।[৭]

ইসলামের এই খিলাফত সার্বজনীন। আল্লাহ্র এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁদের বিধান ও আইন মান্যকারী সকল মানুষই আল্লাহ্র দেয়া এই প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকারী। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাঁদেরকে তিনি এই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন।"[৮]

বস্তুত এই সার্বজনীনতার ভাবই ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পোপবাদ এবং পাশ্চাত্য ধারণা-ভিত্তিক ধর্ম রাষ্ট্র (Theocracy) প্রভৃতির পঙ্কিলতা হতে পবিত্র রাখে এবং এক নিখুঁত ও পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যেখানে জনগণকেই নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক বলে মনে করে, সেখানে ইসলাম 'মুসলিম' জনগণকে কেবল খিলাফতেরই অধিকারী বলে অভিহিত করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেও সাধারণ জনগণের ভোট গ্রহণ করা হয় এবং জনমতের ভিত্তিতেই এক একটি সরকার চলে। ইসলামী গণতন্ত্রও অনুরূপভাবে মুসলিম জনগণের নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণের পক্ষপাতী। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য ধারণায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিরংকুশ,

---

৬. আবুল আলা মওদুদী, সাইয়েদ, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,* (আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত), মওদুদী রিসার্স একাডেমী, ১ম সং, ১৯৯৭, পৃ. ১১৭।

৭. ইবন সাআদ, *আত্-তাবাকাত,* ৪র্থ খ. বৈরুত, ১৯৫৭, পৃ. ১১৩।

৮. আল কুরআন, সূরা আন্ নূর ঃ ৫৫।

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচারী এবং সীমাহীন শক্তির মালিক। পক্ষান্তরে ইসলামের ধারণা অনুসারে সার্বজনীন খিলাফত আল্লাহ্ তা'আলার আইনের অনুসরণকারী মাত্র।[৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামের উৎসমূলে খিলাফত কথাটির সাথে ইমামত কথাটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামী সরকার ব্যবস্থাপনায় কখনো খলীফা, কখনো ইমাম, কখনো আমীর ইত্যাদি কথা প্রযুক্ত হয়। ঐতিহাসিক ইব্ন খালদুন (জন্ম ৭৩২/১৩৩২ খ্রি.- ৮০৮/১৪০৬) এবং মনীষী আল-মাওয়ারদী প্রমুখও কখনো খিলাফত ও খলীফা আবার কখনো বা ইমামত ও ইমাম শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১০]

খুলাফা-ই-রাশিদূন

মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবী আবু বকর (রা)-এর (১১/৬৩২ সনে) খলীফা নিযুক্তির মাধ্যমে ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। তাঁর খিলাফত আমল থেকে আলী (রা)-এর খিলাফত আমল (৪০/৬৬১) পর্যন্ত মুসলিম জাহানে যাঁরা রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদেরকে 'খুলাফা-ই-রাশিদূন' বলে অভিহিত করা হয়। এদের মোট সংখ্যা ছিল চারজন। এবং খিলাফতকালের মুদ্দৎ ছিল ত্রিশ বছর।[১১] আর এরই মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যৎবাণী— 'আমার পরে খিলাফত হবে ত্রিশ বছর' এর বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়। এই চার খলীফার সময়কালকে ইতিহাসে 'খিলাফাতে রাশিদার' যুগ বলা হয়ে থাকে।

ইসলামে নবুওয়াতের পর এই খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ। এজন্য ইসলামের খলীফাগণ কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব বিধি-বিধান ও নির্দেশ দান করেন তা অবশ্যই আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় তাঁরা যে অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন তা আমাদেরকে আজও মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'তোমরা আমার ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের আদর্শ গ্রহণ করবে।' (ইবনে মাজাহ্)। এ কারণেই খলীফা নির্বাচনের সময় তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা ও দক্ষতার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে আরো অধিক লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি নবীর সংস্পর্শে নিজেকে কতখানি পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিদ্যা ও নৈতিক গুণাবলী কতটুকু আছে। আবু বকর সিদ্দীক (রা) (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪), উমার ফারুক (রা) (১৩/৬৩৪-২৩/৬৪৪), উসমান গণী (রা), (২৩/৬৪৪-৩৫/৬৫৬) এবং আলী (রা) (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬১)- এই চারজনকে পর্যায়ক্রমে খলীফার পদে নির্বাচন করায় উপরোক্ত নীতির নিগূঢ় তাৎপর্য ও যথার্থতা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে।

---

৯. আবুল আলা মওদুদী, সাইয়েদ, *ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন,* (মাওঃ আবদুর রহীম অনূদিত), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ২৪।

১০. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৯ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

১১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা,* লায়ন্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৮০, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

বস্তুত ইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধান এরই ভিত্তিতে হয়ে থাকে। রাসূলের কার্যাবলীকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ হতে তা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর একটিমাত্র যুক্ত শব্দ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সেটি হলো 'ইকামতে দ্বীন' এ শব্দটিও এতই ব্যাপক যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সব রকমের কাজই এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়। সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, আইন ও শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন, বিচার ব্যবস্থা কায়িম করা, সেনাবাহিনী পরিচালনা করা, এক কথায় সব তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক কাজ সম্পন্ন করাই খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবন এসব মহান দায়িত্ব সম্পাদনেই অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর পরে যারা তাঁর, প্রতিনিধি, ও স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবন এই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন।[১২]

মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবা-ই-কিরামের ক্ষেত্রে খিলাফতের প্রশ্নে দু'টি চিন্তাধারা উদ্ভব হয়। একটি চিন্তাধারা অনুযায়ী মহানবী (সা)-এর প্রতিনিধিত্বের পদ বা মর্যাদা 'খাস' হিসেবে গণ্য। যেমন ইসলামের প্রথম চার খলীফাকে খুলাফা-ই খাস বলা হয়। অন্য চিন্তাধারা অনুযায়ী এই মর্যাদা কোন বিশেষ মর্যাদা নয়, বরং এ মর্যাদা আম বা সাধারণ মর্যাদা। এটা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) (জন্ম ১১১৪/১৭০৩)-এর অভিমত। আর প্রতিটি মুসলিম যিনি প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী তিনিই খলীফা হতে পারেন।[১৩] তবে কুরআন ও হাদীস হতে খলীফার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, সে আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'খুলাফা-রাশিদূন' ই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।[১৪]

খুলাফা-ই রাশিদূন-এর নির্বাচন পদ্ধতি

নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্বশীল নাগরিকগণ 'সকীফায়ে বণী সায়িদা' নামক স্থানে মিলিত হয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন। সর্ব প্রথম উমার (রা) আবু বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন। এরপর মসজিদে নববীতে সর্বস্তরের জনগণ বায়'আত গ্রহণ করেন। খলীফা নির্বাচিত হয়েই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব কর্তব্য ও নীতি-নির্ধারক মূলনীতি সমন্বিত এক ভাষণ দান করেন।[১৫]

---

১২. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
১৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।
১৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

পরবর্তী দু'খলীফা (উমার ও উসমান রা.) নির্বাচনের পদ্ধতিতে তারতম্য লক্ষণীয়। আবু বকর (রা) নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রধান সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে উমার ফারুক (রা)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন। ঐতিহাসিক তাবারী (জন্ম ২২৪/৮৩৮-মৃত ৩১০/৯২৩)-এর মতে আবু বকর (রা) তাঁর ওফাতকালে উমার (রা)-এর সম্পর্কে ওসীয়ত লিখান। অতঃপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন ঃ 'আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি আপনারা কি তার ওপর সন্তুষ্ট ? আল্লাহ্‌র শপথ ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং আপনারা তাঁর নির্দেশ শুনবেন এবং আনুগত্য করবেন।" উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে; আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[১৬] এভাবে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা)-এর নিরপেক্ষ সুপারিশ এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে উমার ফারুক (রা) মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। উমার (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি নীতি নির্ধারণী ভাষণ দান করেন।

দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনী বোর্ড' আধুনিক পরিভাষায় 'নির্বাচন কমিশন' গঠন করেন। অন্যদের ছাড়াও উসমান এবং আলী (রা)ও এ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই ছয় জনই খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য উমার (রা) খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন।[১৭]

কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলীফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করেন। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাঁদের সাথেও আলোচনা করেন। এভাবে জনমত যাঁচাই করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই উসমান (রা)-এর পক্ষে।[১৮] তাই তাঁকেই খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয় এবং সাধারণ জনসমাবেশে তাঁর বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর শাহাদতের (৩৫/৬৫৬) পর মদীনার পরিবেশ ফিতনা-ফাসাদের ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মিসর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীগণ মদীনায় প্রবল তাণ্ডবের সৃষ্টি করে। প্রধান সাহাবীগণের অধিকাংশ সামরিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্য

---

১৬. আত্ তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক,* আল মাতবা আতুল ইস্তিকামাহ, কায়রো, ১৯৩৯, পৃ. ৬১৮

১৭. আল-আসকালানী, ইবন হাজার, *ফাতহুল বারী,* ৭ম খ. আল-মাতবাআতুল খাইরিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৫ হি. পৃ. ৪৯।

১৮. ইব্‌ন কাসীর, *আল-বিদায়াওয়ান নিহায়া,* ৭ম খ., মাতবাআতুস-সাআদাহ্, মিসর, তা.বি. পৃ. ১৪৬।

www.pathagar.com

রাজধানীর বাইরে অবস্থান করছিলেন। উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত খলীফার পদ শূন্য থাকে। কিছুলোক আলী (রা)-কে খলীফা করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ 'এটা করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা তো শূরার সদস্য এবং বদরী সাহাবীগণের কাজ। তাঁরা যাঁকে খলীফা করতে চান, তিনিই খলীফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবো।'[১৯] ইমাম তাবারী আলী (রা)-এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা হচ্ছে— 'গোপনে আমার বায়'আত অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জী অনুযায়ী।'[২০] শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর আলী (রা)-কেই খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

আলী (রা)-এর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করবো ? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছিনা, নিষেধও করছিনা। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালভাবে বিবেচনা করতে পারো।'[২১] তিনি যখন ভাষণে পুত্রদেরকে শেষ ওয়াসিয়ত করছিলেন, ঠিক সে সময়ে জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আপনার উত্তরসুরী মনোনয়ন করছেন না কেন ? জবাবে তিনি বলেন, 'আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)।'[২২]

আমাদের এ নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফা-ই-রাশিদূনের নিয়োগ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত না হলেও প্রত্যেকটি পদ্ধতিতেই জনমতকে নির্বাচনের ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রেই জনমতকে উপেক্ষা করা হয়নি। বস্তুত প্রকৃত গণতন্ত্রের এটাই মৌলিক ভাবধারা এবং এটা জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রত্যেক যুগে ও অবস্থায়ই কার্যকর হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপন্তু এ মৌলিক ভাবধারাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও দাবীসহকারে রক্ষা করে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের যে কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

খিলাফতে রাশিদার বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম যে একটি শূরাভিত্তিক খিলাফত দাবী করে—তৎকালীন মুসলিম সমাজের সদস্যরা একথা ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তাই সেখানে কোন বংশানুক্রমিক বাদশাহী বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় নি এবং খিলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা তদবির করেন নি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালান নি। বরং জনগণ তাঁদের স্বাধীন মর্জীমত পর পর চারজন সাহাবীকে তাঁদের খলীফা নির্বাচিত করেন। মুসলিম মিল্লাত এ

---

১৯. ইব্ন কুতায়বাহ্, *আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ,* ১ম খ. কায়রো, ১৯৬৯, পৃ. ৪১।

২০. *আত্ তাবারী* ৩য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০।

২১. আল-মাসউদী, *মুরুজুয যাহাব,* ২য় খ. আল-মাতবাতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১৩৪৬ হি. পৃ. ৪৬।

২২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদা (সত্যাশ্রয়ী খিলাফত) বলে গ্রহণ করেছেন। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটাই ছিল খিলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি। এই খিলাফতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হলো ঃ

১. নির্বাচন ভিত্তিক খিলাফত

খিলাফত সম্পর্কে খুলাফা-ই-রাশিদূন এবং অন্যান্য সাহাবীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, খিলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানগণের পারস্পরিক পরামর্শ এবং স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তা কায়িম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণ করা খিলাফত নয় বরং তা বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।

২. শূরা ভিত্তিক সরকার গঠন

খুলাফা-ই-রাশিদূন সরকারের কার্যনির্বাহ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিগণের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজ করতেন না। সুনান দারিমীতে মায়মুন ইবন শাহ্‌রানের একটি বর্ণনায় আছে যে, আবু বকর (রা)-এর নীতি ছিল, তাঁর সামনে কোন বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ্‌র ফায়সালা কি ? সেখানে কোন ফায়সালা না পেলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হতেন। রাসূলের সুন্নায়ও তার ফায়সালা না পেলে জাতীয় শীর্ষস্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিগণের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে সিদ্ধান্ত হতো, সে অনুযায়ী ফায়সালা করতেন।[২৩] উমার (রা)-এর কর্মনীতিও ছিল অনুরূপ।[২৪]

পরামর্শের ব্যাপারে খুলাফা-ই-রাশিদূন-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শূরার সদস্যগণের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উমার (রা) এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খিলাফতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এভাবে,—আমি আপনাদের যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তা হচ্ছে আপনাদের কার্যাদিও আমানতের যে ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সঙ্গে শরীক। আমি আপনাদেরই একজন। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আবার যার ইচ্ছে একমতও হতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমার মতামতকে আপনাদের সমর্থন করতেই হবে এমন কোন কথা নেই এবং আমি তা চাইও না।[২৫]

৩. বায়তুলমাল একটি আমানত

খুলাফা-ই-রাশিদূন বায়তুলমালকে আল্লাহ্‌ এবং জনগণের আমানত মনে করতেন। বেআইনীভাবে বায়তুলমালের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা ও বেআইনীভাবে কিছু বেরিয়ে

---

২৩. ইমাম দারিমী, *সুনান দারিমী,* বাবুল ফুতইয়া ওয়ামাফীহি মিনাশ শিদ্দাতি।

২৪. আলী মুত্তাকী, শায়খ, *কানযুল উম্মাল,* ৫ম খ. দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৯৫৫, হাদীস নং- ২২৮১।

২৫. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ,* আল-মাতাবাআতুস সালফিয়া, মিসর, ২য় সং, ১৩৫২ হি. পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

যাওয়াকে তাঁরা জায়িয মনে করতেন না। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থে বায়তুলমাল ব্যবহার তাঁদের মতে হারাম ছিল। তাঁদের মতে খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, রাজা বাদশাহ্‌রা জাতীয়ভাণ্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজেদের খাহিশ মতো স্বাধীনভাবে তাতে তসরূপ করতো। আর খলীফা তাকে আল্লাহ্ এবং জনগণের আমানত মনে করে সত্য, ন্যায়-নীতি মুতাবিক এক একটি পাই পয়সা হিসাব করে উসূল করতেন। আর ঠিক সেভাবেই হিসেব করে ন্যায়-নীতি অনুসারে তা ব্যয়ও করতেন।

এ ব্যাপারে খুলাফা-ই-রাশিদূন-এর কর্মধারা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পরদিন কাপড়ের থান কাঁধে নিয়ে বিক্রি করার জন্য বেরিয়েছেন। কারণ, খলীফা হওয়ার পূর্বে এটিই ছিল তাঁর জীবিকার অবলম্বন। পথে উমার (রা)-এর সাথে দেখা। তিনি বললেন, মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে খিলাফতের কাজ চলতে পারে না। চলুন আবু উবায়দা (বায়তুল মালের খাজাঞ্চী)-এর সাথে আলাপ করি। তারপর উমার (রা) আবু উবায়দার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, একজন সাধারণ মুহাজিরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এ ভাতা মুহাজিরগণের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির সমানও নয়; আবার সবচেয়ে দরিদ্র্য ব্যক্তির পর্যায়েও নয়। এমনিভাবে তাঁর জন্য একটা ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিল বার্ষিক চার হাজার দিরহামের কাছাকছি। কিন্তু তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওয়াসিয়ত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আট হাজার দিরহাম বায়তুলমালকে ফেরত দেবে। উমার (রা)-এর নিকট তা আনা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ আবু বকর (রা)-এর ওপর রহম করুন। উত্তরসুরীদেরকে তিনি মুশকিলে ফেলেছেন।[২৬]

বায়তুলমালে খলীফার অধিকার কতটুকু এ প্রসঙ্গে খলীফা উমার (রা) একদা তাঁর এক ভাষণে বলেন, গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে এক জোড়া কাপড়। কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার-পরিজনের জন্য। এছাড়া আল্লাহ্‌র সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ আর কিছু নয়।[২৭]

আবু বকর (রা) এবং উমার (রা)-এর বেতনের মান যা ছিল, আলী (রা)ও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। সারা জীবন কখনো একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার শীতের মৌসুমে জনৈক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে বসে আছেন আর শীতে কাঁপছেন।[২৮] শাহাদতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসেব নিয়ে দেখা গেল মাত্র সাতশ দিরহাম। তাও তিনি এক পয়সা এক পয়সা করে সঞ্চয় করেছেন একটা

---

২৬. আলী মুত্তাকী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২৮০-২২৮৫।

২৭. ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

২৮. ইব্‌ন কাসীর, ৮ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

www.pathagar.com

গোলাম খরীদ করার জন্য।[২৯] একবার তার আপন ভাই আকীল (রা) তাঁর কাছে টাকা দাবী করেন বায়তুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেন, 'তুমি কি চাও তোমার ভাই মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক।'[৩০]

৪. রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি ছিল, রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নিজের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করতেন, স্বীয় রাষ্ট্রে তাঁরা কোন নীতি মেনে চলতেন ? খিলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসব বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মসজিদে নববীতে গণ বায়'আত ও শপথের পর আবু বকর (রা) যে ভাষণ দান করেন, তা সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'হে লোক সকল ! আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত। আমি নিজে ইচ্ছে করে এ পদ গ্রহণ করি নি। এর প্রতি কোন লোভও আমার ছিল না। এখনও আপনারা ইচ্ছে করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হতে কাউকে এ পদের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশিত পথে চলি, ততক্ষণ তোমরা আমার অনুসরণ করবে ও আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাঁদের হক আদায় না করা পর্যন্ত তাঁরা আমার কাছে সবল ও শক্তিশালী। আর যারা সবল তাদের নিকট থেকে হকদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট দুর্বল। মনে রেখো আমি অনুসরণকারী মাত্র, কোন নতুন পথের উদ্ভাবক নই।[৩১]

উমার (রা) তাঁর এক ভাষণে বলেন, লোক সকল ! মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই। আমার ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি। এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো। আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, খারাজ বা আল্লাহ্র দেয়া ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল) থেকে বেআইনীভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবো না। আর অন্যায়ভাবে তার কোন অংশও আমি ব্যয় করবো না।[৩২]

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে আমর ইবনুল আস (রা)-কে প্রেরণকালে আবু বকর (রা) যে হিদায়াত দান করেন, বিশ্ব ইতিহাসে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে। এবং সর্বকালের শাসকদের জন্য তা চির অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বলেন, 'আমর ! আপন প্রকাশ্য

---

২৯. ইব্ন সাআদ, ৩য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩০. ইব্ন কুতায়বা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৩১. ইব্ন হিশাম, *আস সীরাতুন নববিয়্যাহ,* ৪র্থ খ., মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবী, মিসর, ১৯৩৬, পৃ. ৩১১ ও *আত তাবারী,* ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০ (ছায়াবলম্বনে লিখিত)।

২. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

www.pathagar.com

অপ্রকাশ্য সকল কাজে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। তাঁকে লজ্জা করে চলো। কারণ, তিনি তোমাকে এবং তোমার সকল কর্মকাণ্ডকেই দেখতে পান। ... পরকালের জন্য কাজ করো। তোমাদের সকল কর্মে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখো। সঙ্গী-সাথীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে, যেন তারা তোমার সন্তান। মানুষের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়িয়োনা। বাহ্য কাজের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে আচরণ করো। নিজেকে সংযত রাখবে, তোমার প্রজা সাধারণও ঠিক থাকবে।[৩৩]

উমার (রা) শাসনকর্তাদের কোন এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেন ঃ 'মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক বলে বসার জন্য আমি তোমাদেরকে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের ওপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করছিনা। বরং আমি তোমাদেরকে এজন্য নিযুক্ত করছি যে, তোমরা সালাত কায়িম করবে, মানুষের মধ্যে ইনসাফের ফায়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বণ্টন করবে।[৩৪]

বায়'আতের পর উসমান (রা) প্রথমে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন, 'শোন আমি অনুসরণকারীমাত্র নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। এক. আমার খিলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো। ২. যে সব ব্যাপারে পূর্বে কোন নীতি-পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সে সব ব্যাপারে সকলের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবো। ৩. আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।[৩৫]

আলী (রা) কায়িস ইবন সা'দকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবারকালে মিসরবাসীদের নামে যে ফরমান দান করেন, তাতে তিনি বলেন, 'সাবধান ! আমি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ মুতাবিক আমল করবো, আমার ওপর এ অধিকার তোমাদের রয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অধিকার অনুযায়ী আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ কার্যকর করবো। তোমাদের অগোচরেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো। প্রকাশ্য জনসমাবেশে এ ফরমান পাঠ করে শোনাবার পর কায়িস ইব্‌ন সা'আদ ঘোষণা করেন, 'আমি তোমাদের সাথে এভাবে আচরণ না করলে তোমাদের ওপর আমার কোন বায়'আত নেই।'[৩৬]

আলী (রা) জনৈক গভর্ণরকে লিখেন, 'তোমাদের এবং জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করোনা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা

---

৩৩. আলী মুত্তাকী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩১৩।

৩৪. *আত্ তাবারী,* ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০-৫৫১।

www.pathagar.com

এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তাঁরা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারেনা। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্য বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় হয় ক্ষুদ্র। তাঁদের জন্য ভাল মন্দ হয়ে দেখা দেয়, আর মন্দ গ্রহণ করে ভাল'র আকার। আর সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।'[৩৭]

আলী (রা) কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অনুরূপ কাজও করেছেন। তিনি নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন। জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন। ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ-কারবারে প্রতারণা করছে কি না ? এ দৈনন্দিন ঘোরাঘুরির ফলে কোন অত্যাচারিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতো না যে, মুসলিম জাহানের খলীফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ, তাঁর পোশাক থেকে বাদশাহীর কোন পরিচয় পাওয়া যেতো না। তাঁর আগে আগে পথ করে দেয়ার জন্য কোন রক্ষীবাহিনীও দৌড়ে যেতো না।[৩৮]

৫. আইনের প্রাধান্য

এ খলীফারা নিজেকেও আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম) সমান মনে করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি (কাজী) নিযুক্ত বলেও খলীফাদের বিরুদ্ধে রায়দানে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন স্বাধীন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে। একবার উমার (রা) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর মধ্যে এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে যায়িদ ইবন সাবিত (রা)-কে শালিস নিযুক্ত করেন। বাদী-বিবাদী উভয়ে যায়িদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়িদ (রা) দাঁড়িয়ে উমার (রা)-কে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি উবাই (রা)-এর সাথে বসলেন। অতঃপর উবাই (রা) তাঁর আর্যী পেশ করলেন, উমার (রা) অভিযোগ স্বীকার করলেন। নিয়মানুযায়ী যায়িদ (রা)-এর উচিত ছিল উমার (রা) কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন। উমার (রা) নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন, "যতক্ষণ যায়িদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং উমার সমান না হয়, ততক্ষণ যায়িদ বিচারক হতে পারে না।"[৩৯]

এমন একটি ঘটনা ঘটে জনৈক খ্রিস্টানের সাথে আলী (রা)-এর। কুফার বাজারে আলী (রা) দেখতে পেলেন, জনৈক খ্রিস্টান তাঁর হারানো লৌহবর্ম বিক্রি করছে। আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেন নি, বরং কাজীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি [আলী (রা)] সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দান করলেন।[৪০]

---

৩৭. *ইব্ন কাসীর*, ৮ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩৮. প্রাগুক্ত পৃ. ৪-৫।

৩৯. ইমাম বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা*, ১০ম খ. দায়িরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, ১ম সং, ১৩৫৫ হি. পৃ. ১৩৬।

৪০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান (র) বর্ণনা করেন যে, একবার আলী (রা) এবং জনৈক যিম্মী বাদী-বিবাদী হিসেবে কাজী শুরাইহ্-এর আদালতে উপস্থিত হন। কাজী দাঁড়িয়ে আলী (আ)-কে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি [আলী (রা)] বলেন, 'এটা তোমার প্রথম বে-ইনসাফী'।[৪১]

৬. বংশ-গোত্রের পক্ষপাতমুক্ত শাসন

খিলাফতে রাশিদার আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইসলামের নীতি এবং প্রাণশক্তি অনুযায়ী তখন বংশ-গোত্র এবং দেশের পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হতো। কারো সাথে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা হতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পরে আরবের গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ঝঞ্ঝার বেগে। এ পরিবেশে আবু বকর (রা) এবং তারপরে উমার (রা) নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে কেবল আরবের বিভিন্ন গোত্রে নয়, বরং আরব নওমুসলিমদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং আপন বংশ-গোত্রের সাথে কোন প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এর ফলে সব রকম বংশ গোত্রবাদ বিলীন হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দাবী অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক প্রাণশক্তি ফুটে ওঠে। আবু বকর (রা) তাঁর খিলাফতকালে আপন কোন লোককে সরকারী পদে নিয়োগ করেন নি। উমার (রা) তাঁর গোটা শাসনামলে তাঁর গোত্রের একজন মাত্র ব্যক্তিকে (যার নাম ছিল নু'মান ইব্ন আস) বসরার নিকটে 'মায়দান' নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহশিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই আবার এ পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।[৪২] এদিক থেকে এ দু'জন খলীফার কর্মধারা সত্যিকার আদর্শ ভিত্তিক ছিল।

৭. গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

সমলোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল খিলাফতে রাশিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। খলীফাগণ সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের কোন সরকারী দল ছিল না। আবার বিরোধী দলেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ঈমান এবং বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। চিন্তাশীল, উচ্চবুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সামনে সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হতো। কোন কিছুই গোপন করা হতো না। ফায়সালা হতো দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। কারো দাপটে, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ কিংবা দলাদলির ভিত্তিতে নয়। কেবল শূরার মাধ্যমেই খলীফাগণ জাতির সামনে উপস্থিত হতেন না বরং দৈনিক পাঁচবার জামাআতে এবং

---

৪১. ইব্ন খাল্লিখান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান,* ২য় খ, মাকতাবাতুন নাহ্ যাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৪৮, পৃ. ১৬৮।

৪২. ইব্ন আবদুল বার, *আল-ইসতিআব,* ১ম খ. দায়িরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, তা. বি. পৃ. ২৯৬।

www.pathagar.com

বছরে দু'বার ঈদের জামা'আতে ও হাজ্জ-এর মহাসম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। এছাড়া তাঁদের নিবাস ছিল জনগণের মধ্যেই। কোন দারোয়ান ছিল না তাঁদের গৃহে। সব সময় সকলের জন্য তাঁদের দ্বার উন্মুক্ত থাকতো। তাঁরা হাট-বাজারে জনগণের মধ্যে চলা-ফেরা করতেন। তাঁদের কোন দেহরক্ষী ছিল না, ছিল না কোন রক্ষী-বাহিনী। তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার স্বাধীনতা ছিল সকলেরই। এবং এর জন্য কোন ধরা-বাধা নিয়ম ছিল না।

এ স্বাধীনতা ব্যবহারের তাঁরা কেবল অনুমতিই দিতেন না, বরং এ জন্য লোকজনকে উৎসাহিতও করতেন।[৪৩]

৮. আনুগত্য ও জবাবদিহিতা

এ যুগে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, সত্যকে গ্রহণ করার মত মানসিকতা এবং খলীফাগণের জবাবদিহিতার এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা)-এর একটি ঘটনা। একদিন তিনি জুম'আর খুতবায় মত প্রকাশ করেন যে, কোন ব্যক্তিকে যেন বিবাহে চারশ দিরহামের বেশি মহর ধার্যের অনুমতি না দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এমন নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার নেই। পবিত্র কুরআনে স্তূপিকৃত সম্পদ (কিন্তার) মহর হিসেবে দান করার অনুমতি দিচ্ছে। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী ? তখন উমার (রা) এই বলে তাঁর মত প্রত্যাহার করেন যে, একজন স্ত্রীলোক সঠিক বলেছেন আর একজন পুরুষ (উমার) ভুল করেছে।[৪৪] আর একবার সালমান ফারসী (রা) প্রকাশ্য মজলিকে তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করলেন এ বলে যে, 'আমাদের সকলের ভাগে একখানা চাদর পড়েছে। আপনি দু'খানা চাদর কোথায় পেলেন' ? উমার (রা) তৎক্ষণাৎ স্বীয়পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, দ্বিতীয় চাদরখানা তিনি পিতাকে ধার দিয়েছেন।[৪৫] একদা তিনি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি কোন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তা হলে তোমরা কি করবে ? বিশর ইবন সা'আদ (রা) বললেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মত সোজা করে দেবো। উমার (রা) বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।[৪৬]

আলী (রা)-এর একটি ঘটনা। গর্ভবতী এক ব্যভিচারিণীকে উমার (রা)-এর নিকট বিচারের জন্য আনা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা (রজম) করার নির্দেশ দিলেন। তখন আলী (রা)

---

৪৩. আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ, *খেলাফত ও রাজতন্ত্র,* (গোলাম সোবহান সিদ্দীকী অনূদিত), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সং, ১৯৯৩, পৃ. ৯২।

৪৪. ইব্ন কাসীর, *তাফসীরু কুরআনিল আযীম,* ১ম খণ্ড, তা. বি. পৃ. ৪৬৭।

৪৫. আত্ তাবারী, মুহিবুদ্দীন, *আর রিয়াযুন নাযিরা ফীমানাকিবিল আশারা,* ২য় খণ্ড, তা. বি. পৃ. ৫৬।

৪৬. আলী মুত্তাকী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৪১৪।

www.pathagar.com

একথা বলে তাঁর এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদিও এ মহিলাকে রজম (হত্যা) করার একটা পথ আপনাকে দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর গর্ভের সন্তানের জন্য অনুরূপ কোন পথ করে দেন নি। তখন উমার (রা) তাঁর হুকুম রহিত করে বললেন, আলী (রা) না হলে উমার (রা) ধ্বংস হয়ে যেত।[৪৭]

খলীফা উমার (রা) ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে দামিশ্ক জয়ের প্রাক্কালে খালিদ সাইফুল্লাহ (রা)-কে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনারত অবস্থায় তিনি তাঁর পদচ্যুতি এবং তাঁর পদে আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নিযুক্তির খবর প্রাপ্ত হন। খলীফার এই আদেশ তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে সেনাপতির প্রতীক চিহ্ন খুলে আবু উবাইদাহকে দিয়ে নিজে তাঁর অধীনে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হন।[৪৮] আনুগত্যের এরূপ নযীর বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া সুকঠিন।

৯. সহজ-সরল জীবন যাপন

খুলাফা-ই-রাশিদূন অত্যন্ত সাদা-সিদে জীবন যাপন করতেন। তাঁদের জীবনে রাজকীয় জাঁকজমক ছিল না। তাঁদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও বেশভূষা ছিল অতি সাধারণ। তাঁদের মজলিসে ধনী-গরীব, আমীর উমরাহদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। সামান্যতম কর্মেও তাঁদের লজ্জা ছিল না।

রাজ্য বিস্তার

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে (৬৩৪-৬৪৪ সাল) মুসলমানগণ লিবিয়ার ত্রিপোলী থেকে সুদূর আফগানিস্তান এবং আর্মেনিয়া থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু ও ভারতের গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করেন। তখন সিরিয়া, ইরাক, ইরানসহ সমগ্র অঞ্চল ছিল মুসলমানদের দখলে।

তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর আমলেই (৬৪৪-৬৫৬ সাল) স্পেনের আন্দালুসিয়া মুসলমানদের দখলে আসে। পূর্ব দিকে তারা জায়হুন (অক্সাস) নদী-অতিক্রম করে চীনের বেশ কিছু অঞ্চলও করায়ত্ত করে। সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ, রোডস এবং ক্রীট চলে আসে মুসলমানদের শাসনাধীনে। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর তখনো পনের বছর পূর্ণ হয়নি। এরইমধ্যে মুসলিম খিলাফত পূর্বে ও পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, যা ছিল গোটা ইউরোপ মহাদেশের সমান।[৪৯] মুসলমানদের এ বিজয় যত দ্রুতই হোক না কেন বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খিলাফতের কোন অঞ্চল হতে কখনো কোন অসন্তোষ দেখা দেয়নি।[৫০]

---

৪৭. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,* ইফাবা, ঢাকা, ২য় সং, ২০০৫, পৃ. ১০৭।

৪৮. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

৪৯. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্, *ইসলাম পরিচয়,* (মুহাম্মদ লুতফুল হক অনূদিত), ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

৫০. তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর হত্যার মাধ্যমেই ইসলামে সর্বপ্রথম ফিতনা সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থা

খুলাফা-ই-রাশিদূন এর শাসন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা এবং প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

মদীনাকে রাজধানী করে সমগ্র মুসলিম জাহান এক কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র দেশকে কতকগুলো প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বিচার, আইন, রাজস্ব ও সামরিক ব্যবস্থার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং খলীফা এবং তিনি প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

খুলাফা-ই-রাশিদূন-এর আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসনকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে সমগ্র খিলাফতকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এই প্রদেশগুলোকে জেলায় এবং জেলাগুলোকে মহাকুমায় বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রদেশে শাসনভার ওয়ালী বা গভর্ণর এর উপর ন্যস্ত ছিল। সকল বিষয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন। ওয়ালীগণ সালাতের জামাআতে ইমামত করতেন এবং শুক্রবার জুমুআর খুতবা পাঠ করতেন। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে রাজ ভবন ছিল। জেলার শাসনকর্তার নাম ছিল আমিল এবং মহাকুমার শাসনকর্তার উপাধি ছিল আমীন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজস্ব সচিব (সাহিবুল খারাজ), অর্থ সচিব (সাহিবু বাইতিল মাল) এবং আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যেক প্রদেশে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা

মহানবী (সা)-এর আমলে যে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, খুলাফা-ই-রাশিদূন এর আমলে তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খিলাফতে রাশিদার রাজস্ব প্রধানত দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল। (ক) অমুসলিমদের নিকট থেকে সংগৃহীত রাজস্ব, (খ) মুসলমানদের নিকট থেকে সংগৃহীত রাজস্ব।

অমুসলিমদের নিকট থেকে সংগৃহীত রাজস্বের মধ্যে ছিল- খারাজ ও জিযিয়া।

খারাজ

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগ দখলকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকেই খারাজ বলা হয়।[৫১] সর্বপ্রথম ইরাকের কূফা নগরে এই খারাজ বা ভূমিকর আরোপ করা হয়। মূলত পূর্ব থেকেই এ সব এলাকার অমুসলিম অধিবাসীগণ পারস্য সম্রাটকে ভূমিকর দিয়ে আসছিলেন। তারা একর প্রতি ২৭ দিরহাম ভূমিকর প্রদান করতেন বলে জানা যায়।

---

৫১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মাওলানা, *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ৪র্থ, ১৯৮৭, পৃ. ২২৫।

www.pathagar.com

উমার (রা) প্রচলিত এই কর ব্যবস্থাকে গ্রহণ না করে নতুনভাবে 'খারাজ' পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তার এই পদ্ধতিই 'ইসলামী খারাজ' বা ভূমিকর হিসেবে পরিচিত। উমার (রা) চাষীদের জন্য সহজসাধ্য ও আদায়যোগ্য করারোপের উদ্দেশ্যে সকল চাষযোগ্য জমির জরিপ করান এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর ভিত্তি করে খারাজ নির্ধারণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে (পৃ. ৩৮) উল্লেখ করেছেন যে, কূফায় বিজিত 'সাওয়াদ' বা গ্রামাঞ্চলের জরিপকৃত মোট ভূমির পরিমাণ ছিল তিন কোটি ষাট লক্ষ একর।

খলীফা উমার (রা) দু'টি পদ্ধতিতে খারাজ গ্রহণ করতেন ঃ ১. খারাজ মুয়ায্যাফ বা নির্ধারিত খারাজ ও ২. খারাজ মুকাসামাহ্ বা উৎপাদনের অংশ ভিত্তিক খারাজ। প্রথম পদ্ধতিতে জমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট খারাজ আরোপ করা হয়। জমি চাষ করা হোক বা না হোক এই খারাজ প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে জমির ওপর কোন নির্দিষ্ট খারাজ থাকে না, বরং প্রকৃত উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ ভূমিকর হিসেবে প্রদান করতে হবে।[৫২]

মুসলমানগণ বিজিত দেশের জমি সে দেশের জমি মালিকদের দখলেই রেখে দিতেন যদিও তা গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবেই গণ্য ছিল। তবে উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমে নামে মাত্র বার্ষিক কর ধার্য্য ছিল। এক হিসেবে দেখা গেছে ইরাকের প্রতি পৌণে এক বিঘা গমের জমির ওপর খারাজের পরিমাণ ছিল বার্ষিক দু'দিরহাম। এর দ্বারাই কর ধার্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যবের ওপর খারাজের পরিমাণ ছিল তার অর্ধাংশ। ইরাকে অন্যতম ফসল ছিল খেজুর। এই খেজুরের ওপর ইরাকের বাণিজ্য নির্ভরশীল ছিল। অথচ তার ওপর কোন প্রকার শুল্ক ছিল না। এই সামান্যতম কর ধার্য্যের পর হযরত উমার (রা)-এর শাসনামলে ইরাকের খারাজের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ কোটি দিরহাম।[৫৩]

জিযিয়া

যে সব দেশ মুসলমানগণ অধিকার করে বা যে সব দেশ ইসলামী হুকুমাতের সাথে নিজেরা যুক্ত হয় সে সব স্থানের অমুসলিম অধিবাসীদের যিম্মী বলা হয়। এই যিম্মীগণের জান-মালের হিফাযত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলমান শাসকদের অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এসব নিরাপত্তা বিধানের বিনিময়ে তাদের নিকট হতে যে কর মুসলিম প্রশাসন গ্রহণ করে তাকে জিযিয়া বলা হয়।

আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে জিযিয়া তিন প্রকারে ধার্য করা হতো। (ক) বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, (খ) ৪০ দিরহাম ও (গ) বার্ষিক ১২ দিরহাম। কেবলমাত্র সামরিক কারণের বিনিময়ে জিযিয়া আদায় করা হতো এ কারণে যে,

---

৫২. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর ড., *উশর বা ফসলের যাকাত*, বাইতুল হিকমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম সং, পৃ. ৬০।

৫৩. মিরাঠী, কাযী জয়নুল আবেদীন, *খেলাফতে রাশেদা*, (মাও. আঃ রাকীব অনূদিত), ফায়েজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১ম সং, ২০০১, পৃ. ২৪৬।

www.pathagar.com

১. জিযিয়া কেবলমাত্র সে সকল ব্যক্তিদের নিকট হতে গ্রহণ করা হতো যাদের জন্য সামরিক সেবা কার্যকর হতে পারে। অর্থাৎ বিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের পুরুষগণই কেবল এর আওতাভুক্ত ছিল। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিরা জিযিয়ার আওতাভুক্ত ছিল না। বিত্তহীনদেরও জিযিয়া প্রদান করতে হতো না।

২. কোন কারণ বশত মুসলমান প্রশাসক নিরাপত্তা বিধানে অপারগ হলে, সে সব ক্ষেত্রে জিযিয়া প্রদান করতে হতো না। যেমন হযরত উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে জিহাদের প্রয়োজনে যখন হামাস হতে মুসলিম সৈনিকদের সরে আসতে হয়, তখন সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হতে উসুলকৃত জিযিয়া ফেরত দেয়া হয়।[৫৪]

মুসলমানদের নিকট থেকে সংগৃহীত রাজস্ব

নিম্নরূপ রাজস্ব খিলাফতে রাশিদার যুগে মুসলমানদের নিকট হতে আদায় করা হতো ঃ

১. যাকাত

মুসলমানদের ব্যবসার পণ্য, পশু সম্পদ[৫৫], সোনা-রূপা ও নগদ অর্থ নিসাব পরিমাণ পৌঁছলে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে ধার্য্য ছিল যা বৎসরে একবার আদায় করা হতো। যাকাতের বিশদ বিবরণ তুলে ধরা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এ কথা সত্য যে, যাকাতের সম্পদ ধনীদের থেকে নেয়া হতো এবং কুরআন সুন্নাহ্‌র নির্ধারিত খাতেই শুধু তা ব্যয় করা হতো।

উসর

তখন মুসলমানদের জমি হতে উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশ আদায় করা হতো। একে 'আল উশর' নামে আখ্যায়িত করা হয়। 'উশর' শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। ইসলামে জমির ফসলের যাকাতকেই উশর বলা হয়। যে সব জমিতে নিয়মতান্ত্রিক পানি সেচের ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ যে সব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে সেখান থেকে উৎপন্ন ফসলের 'উশর' $\frac{১}{১০}$ আদায় করা হতো। কিন্তু যে সব জমিতে পানি সেচ সন্তোষজনক ছিল না, অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিকে সিক্ত করা হতো সেখান থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা হতো। খারাজের ন্যায় উশর বার্ষিক নয় বরং উৎপাদিত প্রতিটি ফসলের জন্যই তা প্রযোজ্য।

খুমুস

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা দেয়ার নিয়ম রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রবর্তন করেন এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুসারে তা তিনভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার ও বাকী দু'ভাগ সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ইন্তিকালের পর পঞ্চমাংশ পুরোটাই সামরিক খাতে ব্যয় হতো। খনিজ সম্পদ থেকেও এক পঞ্চমাংশ আদায় করা হতো।

---

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

৫৫. পশু সম্পদের আলাদা নিসাব রয়েছে। ফিক্‌হ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

www.pathagar.com

নগর শুল্ক

বর্ণিত রাজস্বসমূহ ছাড়াও নগর শুল্ক আদায়ের নিয়ম ছিল। কোন মুসলমান বণিক অন্য দেশে ব্যবসার পণ্য নিয়ে প্রবেশ করলে তার নিকট হতে নগর শুল্ক আদায় করা হতো। হযরত উমার (রা) নির্দেশ দেন যে, মুসলানদের নিকট হতে যে দেশ যে নিয়মে নগর শুল্ক আদায় করে সে দেশের ব্যবসায়ীদের নিকট হতেও ঠিক একই নিয়মে নগর শুল্ক আদায় করা হবে। বছরে একবার শুল্ক আদায় করা হতো। অবশ্য দু'শত দিরহামের কম মূল্যের পণ্যে কোন শুল্ক ধার্য্য করা হতো না।[৫৬]

আলাফে

ইসলামী সাম্রাজ্যের বেওয়ারিশ ও খাস জমি, বিদ্রোহীদের নিকট হতে বাজেয়াপ্ত জমি, অনাবাদী ও অন্যান্য ভূমি হতে যে সব রাজস্ব আদায় হতো তাই 'আলাফে' নামে পরিচিত। আলাফে ছাড়াও রাষ্ট্রীয় চারণভূমি 'হিমা' নামে পরিচিত ছিল এবং তার কর বাবদও প্রচুর অর্থ আদায় হতো। রাষ্ট্রীয় যে কোন কল্যাণমূলক খাতে তা ব্যয় করার নীতি ছিল।

রাজস্ব আদায়ে সতর্কতা

খিলাফতে রাশিদার শাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা হতো। যাতে যিম্মীদের ওপর কোন প্রকার যুলুম না হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রা) কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে খারাজ আদায়ের পর উমার (রা) কূফা ও বসরা হতে দশজন নির্ভরযোগ্য লোক থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। তাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলতে হতো যে, খারাজ বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম কারো ওপর কোন প্রকার যুলুম বা অত্যাচার করা হয়নি এবং যা কিছু আদায় হয়েছে তা লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করেছে। ইমাম আবুল ফারাজ্ ইবন জাওযী (র) উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইবন মায়মুন (রা) হযরত উমার (রা)-এর শাহাদাতের কয়েক দিন পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যান। এ সময় তিনি দেখেন উমার (রা) হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান ও উসমান ইব্‌ন হানীফের সাথে অসন্তোষে বলেছেন, আপনারা ইরাকে রাজস্ব আদায়ে কি পন্থা গ্রহণ করেন ? আপনারা নির্দিষ্ট অংকের অধিক আদায় করেন কিনা এ সম্পর্কে আশংকা হচ্ছে। জবাবে তাঁরা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এটা হতে পারে না। হযরত উমার (রা) বলেন, 'যদি আমি বেঁচে থাকি তা হলে এমন অবস্থা করে যাবো যাতে ইরাকের বিধবাদের অন্যের মুখাপেক্ষী না থাকতে হয়।' এ ঘটনার মাত্র চারদিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৫৭]

দিওয়ানুল খারাজ

বিশাল সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায় ও বণ্টন কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হযরত উমার (রা) যে রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে 'দিওয়ানু খারাজ' বলা হয়ে থাকে। তাঁর আমলে একটি বিশেষ

---

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণ করে ধন-সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতে অর্থ আয় ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ আরব ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। তাঁর এ বণ্টন নীতি ইতিহাসে বিরল।

বায়তুলমাল

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রাপ্তির পর সঙ্গে সঙ্গে তা বণ্টন করে দেয়ার ফলে বায়তুলমাল গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু উমার (রা)-এর যুগে বিজিত সাম্রাজ্য হতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতে থাকলে প্রাপ্ত অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। ওয়ালিদ বিন হিশামের পরামর্শে উমার (রা) বায়তুলমাল বা কোষাগার নির্মাণ করে আব্দুল্লাহ্ বিন আরযানকে প্রথম কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কোষাগারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়। বায়তুলমালের প্রথম দফতর স্থাপন করা হয় মদীনা মুনাওয়ারায় এবং তার অধীনে প্রত্যেকটি ইসলামী প্রদেশের রাজধানীতে এক একটি প্রাদেশিক দফতর খোলা হয়। এ দপ্তরগুলো প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বাসগৃহের সংলগ্ন স্থানে নির্মাণ করা হয় যাতে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

সামরিক ব্যবস্থা

মহানবী (সা)-এর সময়ে সমগ্র জাতির সমন্বয়ে সৈন্য বাহিনী গঠিত হতো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সকল মুসলমান অংশ গ্রহণ করতেন। খলীফা উমার (রা) সর্বপ্রথম নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি পদাতিক, অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ তিন শ্রেণীর বাহিনী গঠন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহী সৈন্যগণ বর্ম, লৌহ শিরানস্ত্র, ঢাল, তলোয়ার ও দীর্ঘ বর্ম, পদাতিক বাহিনী ঢাল, তলোয়ার, বর্শা ও তীর এবং বুট জুতা ব্যবহার করতো। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা অগ্র পশ্চাৎ, মধ্যে ও দু'পার্শ্বে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করতো। প্রত্যেক দশজন সৈন্যের ওপর একজন আরিফ এবং প্রতি এক'শর ওপর একজন কায়িদ থাকতেন। কায়িদের ওপর আমীর ও সিপাহসালারগণ থাকতেন। সমগ্র খিলাফত ন'টি জুনদে বা সামরিক সেক্টরে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জুনদে চার হাজার করে সৈন্য মোতায়েন করে রাখা হতো।

বিচার ব্যবস্থা

খিলাফতে রাশিদার যুগে বেসামরিক বিচারক দ্বারাই বিচার কার্য সম্পাদিত হতো। খলীফা সর্বোচ্চ বিচারপতি ছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনি নিম্ন আদালতের রায়ের আপীল প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারতেন। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করে প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক জেলার জন্য একজন করে কাজী নিযুক্ত করেন। সুষ্ঠু বিচারের জন্য উমার বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন। কাজীগণ কোনরূপ প্রভাবিত না হয়ে কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা'-কিয়াসের আলোকে বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন।

ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা

খুলাফা-ই-রাশিদুন এর আমলে ধর্মীয় শাসনকার্যের জন্য নির্দিষ্ট কোন বিভাগ না থাকলেও জনগণ নিজেরাই এ কাজ সম্পন্ন করতেন এবং সৈন্য বাহিনীর মাধ্যমেও প্রচারকার্য পরিচালনা করা

www.pathagar.com

হতো। তাঁদের অতুলনীয় মানবিক গুণ, সদয় ব্যবহার, ন্যায় পরায়ণতা ইত্যাদিতে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

খলীফা নিজেই মদীনার মসজিদে ইমামত করতেন এবং হজ্জ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। খলীফার নির্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও কর্তব্য হিসেবে নিয়মিত মসজিদে ইমামত করতেন। ফলে প্রত্যেক প্রদেশে অসংখ্য মসজিদ গড়ে ওঠে। একমাত্র খলীফা উমার (রা)-এর শাসনামলেই আরবে চার হাজার মসজিদ বর্তমান ছিল। ইসলামী আইন কানুন মোতাবেক রাষ্ট্র শাসিত হতো। কুরআন হাদীস পাঠদানের জন্য খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কুরআন হাদীস ছাড়াও ফিক্‌হ, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, গণিত শাস্ত্র (ফারায়িয) ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করা হতো।

জনহিতকর কার্যাবলী

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খুলাফা-ই-রাশিদূন ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মাণ, নতুন নতুন শহর নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ, চারণ ভূমি সৃষ্টি, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করে জনসাধারণের সুখ-শান্তি আনয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। হযরত উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর সময় বিপুল পরিমাণ খাল ও কুপ খনন, বাঁধ ও সেতু নির্মাণ এবং অতিথি ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। উমার (রা)-এর যুগে খননকৃত খালগুলোর মধ্যে নহরে মাকিল, নহরে মূসা, নহরে সাদ ও নহরে আমীরু মু'মিনীন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নহরে আমীরুল মু'মিনীন সেই খাল যা নীল নদের ফুসতাত হতে কেটে লোহিত সাগরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। উনসত্তর মাইল দীর্ঘ এই খালটি এত প্রশস্ত ছিল যে, তার ভেতর দিয়ে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতে পারতো। হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে মিহরাজ বাঁধ নির্মাণ করা হয়; যা দ্বারা খায়বারের দিক হতে আসা প্লাবন থেকে মদীনা শহরকে রক্ষা করা হতো।

হরত আলী (রা)-এর যুগে নির্মিত হয় ফোরাত সেতু, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় খুবই উপকারে আসে। ইসলামের ইতিহাসে খলীফা উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম ডাক বিভাগ চালু করে এক দেশের সাথে আরেক দেশের সেতুবন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হন।[৫৮] তাঁর এ অমূল্য অবদান ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে থাকবে।

এখানে আমরা ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় খিলাফাতে রাশিদার যে আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছি, তা ছিল আলোর মিনার স্বরূপ। সর্বকালে ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ মিনারকেই মডেল বা আদর্শ মনে করতে হবে। এবং সে আলোকেই কল্যাণ রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-৩৫৪।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

মানব জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রভাব

ড. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন*

এ জগতসমূহের একমাত্র ও একক স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আমরা তাঁরই সৃষ্ট আবদ বা বান্দা মাত্র। তিনি আমাদের জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, লালন-পালন কর্তা ও একমাত্র রব। সকল বিপদ আপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষাকারী। তাই আমাদের মৌলিক সম্পর্ক হল আল্লাহর সাথে। অস্তিত্বের প্রতিটি পরতে পরতে আমরা তাঁরই মুখাপেক্ষী। বিপদ-আপদে আমরা শুধুমাত্র তাঁকেই ডাকি তাঁর কাছেই সাহায্য চাই প্রতিনিয়ত। তিনি আমাদের যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের সমাধানকারী। এজন্যই আল্লাহ্ আমাদের মা'বুদ, আমরা তাঁর আবদ বা বান্দা। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ইবাদতের মাধ্যমে। এজন্যই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহর বাণী ঃ "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না"[১]। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কাজে নির্দিষ্ট যিকির ও ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে করে বান্দা সার্বক্ষণিক তাঁর মা'বুদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে।

এছাড়াও ইবাদত হলো বান্দার উপর আল্লাহর হক বা অধিকার। আমাদের জীবনের সূচনাই হয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে। ইবাদতই হলো মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা গন্তব্য। এখন প্রশ্ন হলো, ইবাদত শব্দের অর্থ কী ? আল্লাহ্ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন ? তিনি আমাদের নিকট কি চান ? তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য কি ? কিভাবে আমরা তাঁর ইবাদত করব ? এ সকল প্রশ্নের আলোকে আমরা ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

ইবাদতের অর্থ

ইবাদত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো Submission, Humiliation 'আত্মসমর্পণ', আল্লাহ্র মুকাবিলায় আত্ম অবমাননা— নিজেকে হীন ও নগণ্য মনে করা।[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

১. আল কুরআন, ৪ : ৩৬

২. লিসানুল আরব, ৩ : ২৭১-৪

www.pathagar.com

ইবাদত হচ্ছে চূড়ান্ত মাত্রায় নিজের নগন্যতা ও হীনতা প্রকাশ করা। তা পাওয়ার অধিকার কেবল তারই যিনি মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। আর এ কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষেই এরূপ নির্দেশনা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। যেমন আল্লাহ্‌র ঘোষণা ঃ

"তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোই ইবাদত করবে না"।[৩]

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, অভিধানে ইবাদত বলা হয় হীনতা ও নীচতাকে। যেমন বলা হয়, "ত্বারিকুন, মুআব্বাদুন" অর্থাৎ বড়ই নিচু রাস্তা। অনুরূপ বলা হয়, "বায়িরুন মু'আব্বাদুন," নিজ মালিকের খুব বাধ্য উট।[৪]

আসলে উবুদিয়াত খুশু-খুযুকেই বলে।[৫]

প্রকৃত আবেদ বা ইবাদতকারী বান্দাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আল্লাহ্ বলেন ঃ "মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু সিজদারত-বিনয়াবনত দেখবেন। তাঁদের মুখ-মণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।"[৬]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে মানুষের ঐ সকল কথা ও কর্মকে বোঝায় যা আল্লাহ্‌র নিমিত্তে সম্পাদন করতে ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যে কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করলে তিনি সন্তুষ্ট হন।

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন : আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নির্দেশিত ত্বরীকা অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করাই শরয়ী ইবাদত এবং যে সমস্ত কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় হয় তাই ইবাদত।[৭]
- আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহকে পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে বর্জন করাই ইবাদত, আর এটাই হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। তিনি আরো বলেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় ঃ মহব্বত, বিনয়, নম্রতা, ভীতি ও ভয়ের সমষ্টির নাম ইবাদত।[৮]

এক কথায় ইবাদত হল মহব্বত ও ভালবাসা। যেমন আল্লাহ্‌র বানী ঃ বলুন যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।[৯]

---

৩. আল কুরআন, ১১ : ২৬
৪. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর,* ১, ২৭
৫. মাওলানা মোঃ আবদুস সাত্তার, *তাফসীরে সূরায়ে ফাতেহা,* পৃ. ৪৬২
৬. আল কুরআন, ৪৮ : ২৯
৭. ইবনে তাইমিয়া, *কিতাবুত্‌তাওহীদ,* পৃ. ১৪
৮. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর,* ১, ২৭
৯. আল কুরআন, ৩ : ৩১

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ (সা) তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়পাত্র না হব।[১০]

ঈমান ও আমলের পরিপূর্ণতার নাম আবদিয়াত তথা গোলাম বা দাসত্ব।

আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতিটি কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে কার্যে পরিণত করা এবং তাঁদের মধ্যে নিজের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা বিলীন করে দেওয়া। আবদিয়াত বা দাসত্বের এই স্থান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন।

অতএব গোলাম হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নিষেধের যৌক্তিকতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানার অধিকারও আমাদের নেই। তাই এর চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন নেই বরং যে আদেশই হয় তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আব্দ বা গোলাম বলেছেন কিন্তু চাকর বলেননি। কেননা চাকরের কাজ নির্ধারিত কিন্তু গোলামের কাজ নির্ধারিত নেই। মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টির ইবাদত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। আল্লাহর বানী ঃ "জগতের এমন কোন বস্তু নেই যে আল্লাহ্র প্রশংসায় তাসবীহ পড়নো। যদিও তোমরা সে তাসবীহ উপলব্ধি করতে অক্ষম।"[১১]

কিন্তু মানুষের ইবাদতের কোন পরিধি বা পরিসীমা নির্ধারিত নেই। এক সময়ে নিদ্রা যাওয়া ইবাদত, অন্য সময়ে প্রস্রাব পায়খানায় যাওয়াও ইবাদত। যেহেতু প্রস্রাব পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি কাজই ইবাদত যদি তা শরীয়তের নির্ধারিত সীমার মধ্যে হয়, ইবাদত ও উবুদিয়াত উভয়ই বড় মর্যাদার কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্র বানী ঃ "তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।"[১২]

ইমাম ইবন কাসির (র) বলেন ঃ ইবাদত একটি উচ্চ স্থানীয় বস্তু। ইবাদত দ্বারা বান্দার উচ্চ আসন লাভ হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবদ-বান্দা শব্দে পরিচিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্র বানী ঃ

"যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন।"[১৩]

"আর যখন আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন অনেক জ্বীন তাঁর কাছে ভীড় জমালো।"[১৪]

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন।"[১৫]

---

১০. বুখারী : ঈমান পর্ব- পৃ. ৮
১১. আল কুরআন, ১৫ : ৪৪
১২. আল কুরআন, ১৪ : ৯৯
১৩. আল কুরআন, ১৮ : ০১
১৪. আল কুরআন, ৭২ : ১৯
১৫. আল কুরআন, ১৭ : ০১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ্ মানুষের শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকাও একান্তভাবে নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের উপর। তাই মানব জীবনের নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনও সম্পন্ন হবে আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে। তাই মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা, তাঁর-ই দেয়া আইন ও বিধান অনুযায়ী, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা ও সেই অনুযায়ী চলাই তার ইবাদত। যেমন আল্লাহর ঘোষণা ঃ "হুকুম দেওয়ার চূড়ান্ত অধিকার সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য।" তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, "তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব-অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে না। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও দাসত্ব ভিত্তিক দীন তথা জীবন ব্যবস্থা-ই-সরল। কিন্তু লোকদের অনেকেই তা জানে না।"[২৬]

যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা নবী রাসূলগণকে একই দাওয়াত মিশন নিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ্র ইবাদত করা অপরটি হলো তাগুতকে পরিহার করে চলা।

আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামীতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাবাদীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।"[২৭]

তাগুত কি-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে যে, "তাগুত হলো শয়তান অথবা মূর্তিসমূহ অথবা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত সকল পথভ্রষ্টগণ"। আল্লাহ্র ইবাদত বাদ দিয়ে যারা তাগুতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে।

যেমন আল্লাহর বানী ঃ "যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"[২৮]

অপরদিকে জান্নাতীদের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[২৯]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন; যারা তাগুত শয়তানী শক্তির পূজা অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সু-সংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।[৩০]

---

২৬. আল কুরআন ১২ : ৪০
২৭. আল কুরআন ১৬ : ৩৬
২৮. আল কুরআন ৭৯ : ৩৭-৪০
২৯. আল কুরআন ৭৯ : ৪০-৪১
৩০. আল কুরআন ৩৯- ১৭

www.pathagar.com

মানুষ কেন আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ? এর দু'টি কারণ রয়েছে ঃ

১. আল্লাহ্ হচ্ছে মানুষের একমাত্র রব-পালনকর্তা, আইনদাতা, বিধানদাতা। আল্লাহই হচ্ছেন সবকিছুর একক ও অনন্য সৃষ্টিকর্তা। তাই বান্দার কর্তব্য হলো এই পরিচিতি সহকারে তাঁকে স্বীকার ও মেনে নেওয়া।

২. আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন এই বিশ্বলোকের একমাত্র স্রষ্টা, তাই সৃষ্টি যার— ইবাদতও হবে তাঁর। আল্লাহর বাণী ঃ "জেনে রেখ তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা, আল্লাহ্ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[৩১]

মানুষকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল করীমের অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ "হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন, তাতে আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী পরহেযগার হবে। যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ মনে করো না বস্তুত এসব তোমরা জান।"[৩২]

উপরোক্ত আয়াতে 'নাস' আরবি ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত যা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। ইবাদত শব্দের অর্থ ঃ নিজের অন্তরে মহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি, আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে থাকা।[৩৩]

'রব' শব্দের অর্থ পালনকর্তা, তদানুসারে আয়াতে অর্থ দাঁড়ায় 'স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর'।[৩৪]

এখানে আল্লাহ্‌র অসংখ্য গুণবাচক নাম থেকে শুধু 'রব' শব্দকে খাস করার তাৎপর্য হলো ঃ ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[৩৫]

এছাড়াও সূরা ফাতিহায় আমরা দেখতে পাই যে, তাতে প্রথম তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে মানুষ তাঁর জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদত তাঁরই করতে হবে। কেননা- ইবাদত যেহেতু

---

৩১. আল কুরআন ৭ : ৫৪

৩২. আল কুরআন ২ : ২১-২২

৩৩. *রুহুল বয়ান*, পৃ. ৭৪

৩৪. মুফতী মুহম্মদ শফী : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ১ : ২০

৩৫. মুফতী মুহম্মদ শফী : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ১ : ২০

www.pathagar.com

অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই।[৩৬]

ইবাদত ও জ্ঞান অর্জন

ইবাদত করতে হলে সর্বপ্রথম বান্দাকে ইসলামী শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতসমূহের ইলম-অর্জন করতে হবে। কারণ "ইলম হচ্ছে আমল-ইবাদতের ইমামস্বরূপ আর আমল হচ্ছে ইলমের অনুসরণকারী।"

অতএব ইবাদতের মূল ভিত্তি হলো ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের দীনের ইল্‌ম অর্জনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ "তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি করে জামাত কেন দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হলো না যাতে তারা তাদের স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদের নিকট দীনের জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহ্ সম্পর্কে সচেতন করবে যেন তারাও বাঁচতে পারে ?"[৩৭]

কতটুকু পরিমাণ জ্ঞান-অর্জন করা ফরয

১. ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা বা বিশ্বাস এর জ্ঞান

২. তাহারাত বা পবিত্র ও অপবিত্রতার হুকুম আহকামের জ্ঞান

৩. নামায, রোযা এবং যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার জন্য যাকাতের মাসআলা মাসায়িলের জ্ঞান। হজ্জ আদায় করতে সমর্থ ব্যক্তির হজ্জের মাসআলা মাসায়িলের জ্ঞান।

৪. শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয ও ওয়াজিব করে দিয়েছে সেগুলোর জ্ঞান।

৫. শরীয়ত যেসব বিষয় হারাম ও মাকরুহ করে দিয়েছে সেগুলোর জ্ঞান।

৬. ব্যবসা বাণিজ্যের হুকুমের জ্ঞান।

৭. বিয়ে তালাকের জ্ঞান অর্জন, এগুলো প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয।

অনুরূপ ইল্‌মে তাসাউফ জ্ঞানার্জনও ফরয।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীসে কতটুকু পরিমাণ ইল্‌ম অর্জন করা ফরয তার বর্ণনা ইরশাদ করেছেনঃ "ফরয ইলমের তিনটি অংশ (১) সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ, (২) সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, (৩) ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ দায় দায়িত্ব। এর বাইরে যা আছে তা হলো অতিরিক্ত।[৩৯]

অতঃপর বান্দা যখন একথা ভালভাবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ইলাহ আর ইলাহ এর অর্থ মা'বুদ এবং এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতসমূহ নিয়ে এমনকি স্বয়ং নিজেকে নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে তখনই সে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মনোনিবেশ করবে।

---

৩৬. মুফতী মুহম্মদ শফী; তাফসীরে মারেফুল কুরআন, পৃ. ১ : ০৫

৩৭. আল কুরআন, ৯ : ২২

৩৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*, পৃ. ৫৯৬

৩৯. আবু দাউদ : *কিতাবুল ফারাইদ*; হাদীস নং ১

www.pathagar.com

যেমন আল্লাহ্‌র বানী "বিজ্ঞজনদের জন্য এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও, তবুও কি তোমরা দেখ্‌ছ না।[৪০]

আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত ইবাদত অসম্ভব

ইবাদত করা হচ্ছে সম্মানিত ব্যক্তিগণের জন্য সৌভাগ্য, সাহসী ব্যক্তিগণের মাকসুদ, বুযুর্গ ব্যক্তিগণের মূল্যবোধ গড়া ঐতিহ্য, মানুষের আসল পেশা এবং জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের পছন্দনীয় বিষয়।

যে বান্দা ইবাদত করার জন্য তৈরি হয় এবং সে রাস্তায় অভিযানের উদ্দেশ্যে একাগ্রতা হাসিলে সক্ষম হয় বুঝতে— হবে এটা তাঁর জন্য আল্লাহর অসীম রহমতের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিশেষ তাওফীক বা সামর্থ্য দান করেছেন।

যেমন আল্লাহর বানী ঃ "আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেন।"[৪১]

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, "কোন মু'মিনের অন্তঃকরণে যখন নূর প্রবিষ্ট হয়, তখন তার হৃদয় প্রশান্তি ও ব্যপ্তি লাভ করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর কি কোন আলামত নিদর্শন আছে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ (১) দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টি, (২) জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, (৩) মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে যাওয়া।[৪২]

ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র

আমাদের জীবনে ইবাদত হবে কেবলমাত্র আল্লাহর। আল্লাহকে মানুষের একমাত্র 'মাবু'দ রূপে এবং নিজেকের একমাত্র আল্লাহ্‌র 'আবদ বা দাসরূপে মেনে নিয়ে কেবলমাত্র তারই ইবাদত করা কর্তব্য। মানুষের একমাত্র মা'বুদরূপে স্বীকৃত ও গণ্য হওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। এজন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌ই মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য ফরমান জারি করেছেন। আল্লাহ্‌র বানী ঃ "তোমার রব চূড়ান্তভাবে ফয়সালা ঘোষণা করেছেন যে, হে মানুষ ! তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারোই দাসত্ব করবে না"।[৪৩]

অপর আয়াতে বলেছেন ঃ "তোমরা হে মানুষেরা দাসত্ব করবে না কারোরই, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া।"[৪৪]

"হে আদম বংশধর ! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে এ চুক্তি গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কখনোই করবে না। কেননা সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর

---

৪০. আল কুরআন ৫১ : ২০-২১
৪১. আল কুরআন ৬ : ১২৫
৪২. আবু হামেদ আল গাজ্জালী; *মিনহাজুল আবেদীন,* পৃ. ২৭
৪৩. আল কুরআন ১৭ : ২৩
৪৪. আল কুরআন ১১ : ২৬

www.pathagar.com

তোমরা দাসত্ব করবে কেবল মাত্র আমার। বস্তুত আমার দাসত্ব করে জীবন যাপন করাই সুদৃঢ় সরল পথ।"[৪৫]

আল্লাহ ছাড়া আর কারো অধিকার নেই মানুষের ইবাদত পাওয়া বা চাওয়ার। আর মানুষেরও অধিকার নেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করার দু'টি কারণ রয়েছে ঃ

১. মা'বুদকে সর্বোতোভাবে পূর্ণত্বের অধিকারী হতে হবে। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে।

২. সে মা'বুদের হাতেই নিবদ্ধ হতে হবে মানুষের সূচনা ও মানব জীবনের উন্মেষ এবং তাঁকেই হতে হবে মানুষের স্রষ্টা।

তাই বলা যায় কোন প্রকার ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্য করা বৈধ নয়। ইবাদত হবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। এ কথাটি কুরআন মজীদে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

"তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই; সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্ঠতার সাথে বিশুদ্ধভাবে তাঁকেই ডাক। তাঁর কাছেই দোয়া করো।"[৪৬]

"তাদেরকে তো শুধুমাত্র এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে ও সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক কর্ম।"[৪৭]

ইবাদত ও ইখলাছ

মানুষের জীবনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত প্রতিটি ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত হলো তার মধ্যে ইখলাছ বা একনিষ্ঠ থাকতে হবে। ইবাদতটি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হবে এতে কোন রিয়া-লৌকিকতা বা আত্মগর্ব থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল করীমে মানুষদেরকে খালেছ বা একনিষ্ঠ ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবাদতে ইখলাছের দৃষ্টান্ত হলো যেমন, মানুষ যখন কোন কঠিন বিপদাপদে পতিত হয় এবং তা থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে তখনই সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই স্বভাব প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন।

তাছাড়া মানুষের স্বভাব হলো যখনই কোন বিপদাপদ বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে ঠিক সে মুহূর্তেই সে আল্লাহমুখী হয়ে পড়ে। তখন একান্তভাবে তাঁরই নিকট আত্মসমর্পিত হয়। আর তার মাধ্যমেই মানুষের ভেতরে নিহিত ইখলাছ আত্মপ্রকাশ ঘটে। চিৎকার করে ওঠে একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যের জন্য। কেননা সেই মুহূর্তে তিনি ছাড়া আর কেউ তার রক্ষাকারী নেই এবং

---

৪৫. আল কুরআন ৩৬ : ৬০-৬১

৪৬. আল কুরআন ৪০ : ৬৫

৪৭. আল কুরআন ৯৮ : ০৫

www.pathagar.com

খালেছ একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহকেই ডাকে। যেমন, কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তিনি আল্লাহ-ই যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জল ভাগে পরিচালনা করেন এমনকি তোমরা যখন জলযানে আরোহণ করে অনুকূল আবহাওয়ার দিকে আনন্দ স্ফূর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীত দিক থেকে প্রচণ্ড বাতাসে ছুটে আসে, চার দিকে থেকে তরঙ্গমালা এসে আঘাত হানে, সফরকারীরা মনে করে যে, তারা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তখন তারা সকলেই নিজেদের দীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস করে তারই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দাও, তাহলে আমরা শোকরকারী বান্দা হয়ে থাকব। কিন্তু যখন তিনি তাদরেকে উদ্ধার করেন তখন সেই লোকেরাই সত্য দীন থেকে বিমুখ হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে শুরু করে।"[৪৮]

"অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"[৪৯]

এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে। ইমাম হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক, তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৫০]

আল্লাহ্র ইবাদত-ই হলো সরল ও সঠিক পথ

আমরা প্রত্যহ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, (হে আল্লাহ) "আমাদিগকে সরল পথ দেখাও।"[৫১]

এখন প্রশ্ন হলো এই সরল পথ কোনটি ? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ইয়াসিনে এই সরল পথের দিশা দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা ইবাদত-দাসত্ব কর, এটিই সিরাতে মুস্তাকীম-সরল পথ।"[৫২]

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল রয়েছে সেই সিরাতে মুস্তাকীমের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে।

ইবাদতের সুফল

মানুষের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে ইবাদতের প্রভাব রয়েছে সুস্থ, সবল, শক্তিশালী দেহগঠন এবং পাপমুক্ত জীবন যাপন ও জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে ইবাদতের ভূমিকা অপরিসীম। যেমন, নামাযে মানুষ শারীরিক ব্যায়াম করে থাকে। এ ছাড়াও নামায মানুষের

---

৪৮. আল-কুরআন১০ : ২২-২৩

৪৯. আল-কুরআন ১৮ : ১১০

৫০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুর কুরআন*, পৃ. ৮২৯

৫১. আল-কুরআন, ১ : ৫

৫২. আল-কুরআন ৩৬ : ৬১

www.pathagar.com

হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। অপরদিকে পাপমুক্ত জীবন যাপনে নামায মহা হাতিয়ার। আল্লাহ্‌র বানী ঃ "আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৫৩]

রোযার দ্বারা মানুষের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘণ্টা সময় বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মুত্রথলীসহ দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দীর্ঘ একমাস ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়। এতে মানব দেহের যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সারা বছরে দেহের অভ্যন্তরের যে বিষ সৃষ্টি হয় তা একমাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

অপরদিকে রোযার দ্বারা 'তাক্‌ওয়া' অর্জিত হয়। আর যিনি তাকওয়া অর্জন করবেন তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য পুরস্কার রয়েছে যেমন আল্লাহ্‌র বাণী— "আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ দেন।"[৫৪]

"যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।"[৫৫]

হজ্জ ঃ হজ্জ মানুষের অভাব দারিদ্র্য দূরীকরণে এক বিরাট ভূমিকা রাখে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "হজ্জ এবং ওমরা দরিদ্রতা ও পাপসমূহকে মুছে দেয়।"[৫৬]

এছাড়া হজ্জ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র এক মহাসম্মেলন, যা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে।

আল্লাহ নির্ভরতা ঃ যিনি তার জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহর বানী ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট"।[৫৭]

যাকাত ঃ সম্পদের পবিত্রতায় যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনল্যাণে যাকাত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

যিকির ঃ যিকির মানব কালবে প্রশান্তি দান করে। আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে, জেনে রাখ আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"[৫৮]

আল্লাহ্‌র ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়

ইলম অর্জন করার পর বান্দা গভীর চিন্তা করে যখনই ইবাদতে ইলাহীতে অগ্রসর হতে চায় তখন তার অতীত জীবনের পাপের কথা স্মরণ হয়। আমিতো মস্তবড় গুনাহগার কিভাবে আল্লাহ্

---

৫৩. আল-কুরআন ২৯ : ৪৫
৫৪. আল-কুরআন ৬৫ : ০২
৫৫. আল-কুরআন ৬৫ : ০৪
৫৬. ইবনে মাজা, মানাসিক পর্ব, পৃ. ৩
৫৭. আল কুরআন, ৬৫ : ৩
৫৮. আল-কুরআন ১৩ : ২৮

www.pathagar.com

করবেন তখনই সে তাওবা-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাওবায়ে ... হয়।

অতঃপর যখন সে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তখনই তার উপর আসে নানা প্রতিবন্ধকতা, গভীরভাবে চিন্তা করলে এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী চার শ্রেণীর ঃ

১. দুনিয়া (পার্থিব জগত)-এর প্রতি ভালবাসা
২. সৃষ্টি জগত
৩. শয়তান
৪. নাফ্‌স

বান্দাকে এসব ঘাটি পার হওয়ার জন্য চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক;

১. দুনিয়ার ভালবাসা বর্জন করে তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা।
২. সৃষ্টি জগতের সাহচর্য বর্জন করে আল্লাহ্‌ মুখী হওয়া।
৩. শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।
৪. নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

নাফ্‌স সব চাইতে উত্তম নিয়ামত। নাফ্‌স ঠিক সবই ঠিক। আবার নাফসই শয়তানের অফিস। যেমনিভাবে আবার নফসই ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার।

এই নাফস সর্বদা ভাল ও উত্তম কাজে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র বানী ঃ "নিশ্চয় নফ্‌স মানুষকে মন্দ কাজের নির্দেশ দান করে।"[৫৯] তাই নফ্‌সকে তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাতে হবে।

অতঃপর বান্দা যখন এ সংকট অতিক্রম করে পুনরায় অভিষ্ট ইবাদতের দিকে দৃষ্টি দেয় আবার সে চতুর্মুখী নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ চার প্রকার ঃ

১. খাদ্য চাহিদা (রিযিক)
২. হতাশা (দৃঢ়তার অভাব)
৩. কাঠিন্য ও রূঢ়তা, দুঃখ, দুর্দশা, বিপদাপদ
৪. আল্লাহ্‌র নির্ধারিত (তাকদীরের) বিভিন্ন পরীক্ষাসমূহ।

উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির জন্য চারটি জিনিসের প্রয়োজন ঃ

১. রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তে ভরসা
২. বিপদে হতাশ না হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ্‌র উপর ফয়সালার ভার ন্যস্ত করা।
৩. দুঃখ, দুর্দশা, বিপদাপদে সব্‌র অবলম্বন করা।
৪. তাকদীরের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

এমনিভাবে আল্লাহ্‌র রহমতে বান্দা যখন এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পুনরায় অভীষ্ট ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে এ সময়ে তার নাফ্‌স খুবই দুর্বল ও অলস হয়ে

---

৫৯. আল কুরআন, ১২ : ৫৩

www.pathagar.com

পড়ে। সজীবতা বলতে তার কিছুই বাকী থাকে না, সকল মহৎ গুণ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার মধ্যে অলস্য ও নিষ্ক্রয়তার জন্ম নেয় এমনকি এ সময়ে নফসের মধ্যে ঔদ্ধত্য, বেহুদাপনা ও মতিচ্ছন্নভাব এসে যায়। এমতাবস্থায় নফসকে সঠিক ও উত্তম পথে পরিচালনার জন্য দু'টি জিনিস প্রয়োজন ঃ

১. রেজা (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণসন্তুষ্টি)

২. খাওফ (আল্লাহ্ ভীতি)

এ দু'টি প্রতিবন্ধকতার ঘাটি অতিক্রম করে বান্দা যখন পূর্ণোদ্যমে ইবাদত শুরু করে তখন বান্দার আমলের জন্য দু'টি মুসীবত এসে যায় যা তার আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

১. রিয়া বা লৌকিকতা

২. আত্মগর্ব বা অহংকার

রিয়া থেকে মুক্তির জন্য বান্দাকে পূর্ণ ইখলাছ, একনিষ্ঠতা অবলম্বন করতে হবে এবং অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে।

এভাবে বান্দা প্রতিবন্ধকতার সকল ঘাঁটি অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র মহব্বতের ইমারতের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের মহব্বতে ব্যাকুল হয়ে যায়, এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা"[৬০] এ অবস্থায় সে জান্নাত দেখতে দেখতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌রই ঘোষণা ঃ "এরাই হচ্ছে আমার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা"।[৬১]

মানব জীবনে ইবাদতের প্রভাব

মানব জীবনে ইবাদতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নেমে আসতে পারে চিরন্তন সুখ ও সমৃদ্ধি।

ব্যক্তি জীবনে

ইবাদত হচ্ছে ব্যক্তির আত্মার খোরাক বা কলবের তৃষ্ণাকে মিটিয়ে দেয়, তা নফসের যাবতীয় চিন্তা অস্থিরতাকে দূরীকরণের মাধ্যমে নফসকে প্রশান্তি দান করে। মানুষের স্বভাবগত ঝোঁক প্রবণতা হলো ধার্মিকতা বা ধর্মপরায়ণতা। তার স্থায়ী, শাশ্বত অনুভূতি এক অসাধারণ শক্তির অনুভব করে যার প্রতিচ্ছবি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট।

যে ব্যক্তি ইবাদতের মধ্যে ইখলাছ একনিষ্ঠতা অবলম্বন করেন তিনি তাতে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিরতা ও পরিপূর্ণ প্রশান্তি পাবেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কঠিন ভয়ভীতির প্রাক্কালে নামায শুরু করতেন।[৬২]

ইবাদতে আল্লাহর প্রতি যে আনুগত্য, বিনয় ও ভালবাসা রয়েছে তা ব্যক্তির মধ্যে আত্মসম্মান বোধ ও স্বাধীনতার দিকে প্রত্যাবর্তনের বীজ বপন করে এবং তাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করা থেকে মুক্ত করে দেয়।

---

৬০. তিরমিযী; কিতাবুল যুহ্‌দ : পৃ. ১৬

৬১. আল-কুরআন ৫৬ : ১১

৬২. নাসাঈ, কিতাবুল মাওয়াকিত; পৃ. ৪৬

www.pathagar.com

'দাসত্ব' নফসকে উত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ঘসে চকচকে ও উজ্জ্বল করে দেয়। এর দ্বারা সে কল্যাণ ও সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করে এবং নিজের জন্য পবিত্র ও উত্তম আমল সমূহের গুদাম নির্মাণ করে।

বস্তুবাদী মানুষ যখন কোন সমস্যা সংকটে পতিত হয় তখন তার চেহারা দুনিয়ার বিপদাপদের কিংকর্তব্যতা ফুটে উঠে তখন দ্রুত সে মদ্যপান নেশাজাতীয় দ্রব্যাদি ও জুয়া খেলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অথবা সে আত্মহননের মত ঘৃণ্যতম কাজ বেছে নেয়। অথচ সে সময়ে মুসলিম আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে।

সকল দুর্ঘটনা ও অঘটনের বিপরীতে মুসলিম পরাগায়িত সুরক্ষিত, যখন তার উপর কোন বিপদাপদ আসে তখন তা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। আর এক্ষেত্রে বস্তুবাদী বেঈমান হয়ে যায়। এমনিভাবে যখন তার উপর কোন বিপদের ঘনঘটা আসে তখন তা তার অহংকার ও মূল্যবোধকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

মুসলিমকে এ পার্থিব জগত ধোকায় ফেলতে পারে না। এর বিপরীতে বস্তুবাদী আটকে যায়। সে সময়ে (আবেদ) ইবাদতকারী মুসলিম আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বানীর স্বাদ আস্বাদন করে। "পৃথিবীর উপর যা কিছু আমি সেগুলোকে উহার শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।"[৬৩]

পারিবারিক জীবনে

মুসলিম পরিবার হলো এক আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদতকারী পরিবার, অতঃপর সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে, কোন বাধা প্রতিবন্ধকতা তাকে ক্ষতি করতে পারে না। স্বামী তার নফসের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত। সম্মানিত হতে হলে তাকে পূর্বে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। নারী তার গৃহের সকল ব্যাপারে হিফাজতকারী।

"সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীন তাদের অধিকার রক্ষা করে।"[৬৪]

যখনই তারা পারিবারিক কোন কলহে পতিত হয় তখন সকলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হিকমাহ-প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসিহতের দিকে অথবা তাদের পারিবারিক সকল ব্যাপারে ফয়সালা হবে আল্লাহ্‌ এবং তদীয় রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী।

পিতামাতা সদা-সর্বদা তাদের সন্তানদের ইসলামী রীতি-নীতিতে পরিচর্যা এবং প্রতিপালনে উদ্বিগ্ন থাকেন, সন্তান প্রতিপালনের সর্বোচ্চ পরিবারের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলো হযরত রাসূলে আকরাম (সা) এবং আলী (রা)-এর পরিবার, অনুরূপভাবে সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামগণের পরিবার তারা প্রত্যেকই ছিলেন প্রত্যেকের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহীকারী।

সামাজিক জীবনে

ইবাদত হলো পরীক্ষায় ফেলা, পরীক্ষা করা এবং বান্দার উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য হক বা অধিকার দায়িত্ব কর্তব্যবোধ।

---

৬৩. আল কুরআন, ১৮ : ৭

৬৪. প্রাগুক্ত, ৪ : ৩৪

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুয়াজ (রা)-কে বলেছেন তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি? বান্দা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।[৬৫]

আল্লাহ্র ইবাদতে যেরূপভাবে তা প্রত্যেক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে অনুরূপভাবে তাকে প্রত্যেক মানুষও গ্রহণ করে নেবে। যখন ইবাদতের অর্থ হবে— যিনা করবে না, চুরি করবে না, হত্যা করবে না, সীমালংঘন করবে না। তখন তার অর্থ এটাও হবে যে, তোমার মান সম্মানের উপর সীমালংঘন না করা।

ইবাদতের দ্বারা আবেদ তার নফসের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নেয় এবং এতে করে সমাজের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এরূপ এক সমাজ গড়ে উঠবে যা হবে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণে স্বতঃপ্রণোদিত। অতঃপর সে সমাজে কোন অত্যাচার, অন্যায়, জুলুম ও সন্ত্রাস থাকবে না। আল কুরআনের ভাষায় সে সমাজের প্রতীক বা লক্ষণ হলো— "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।"[৬৬]

তা এরূপ এক সমাজ হবে যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ও তার অভিভাবকত্বের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। সে সমাজে স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন কাজে মাখলুক এর অনুসরণ করা হবে না এবং কেউ ন্যায়পরায়ণ ইমামের নেতৃত্ব থেকে বের হবে না। মুসলমানেরা অন্যদের মুকাবিলায় এক হাত। তারা আল্লাহ্র বন্ধু, প্রিয় এবং সকল মানুষকে সৎপথে আহবানকারী এবং দীনের তাবলীগে একনিষ্ঠ।

উপসংহার

ইবাদত নফ্সকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে এবং সমাজকে জুলুমের বেড়ি ও জালিমের আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করে বরং মাজলুমদের তাদের উপর বিজয়ী করে। আল্লাহর বানী ঃ "দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার তাদেরকে নেতা করার এবং দেশের উত্তরাধিকারী করার"।[৬৭]

ইবাদতে সকল মুসলিম সমান, যেমন আমরা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, মাহফিল এবং জিহাদের ময়দানে প্রত্যক্ষ করি। মুসলিম জীবনের প্রত্যেকটি পরতে পরতে ইবাদতে মগ্ন। আল্লাহ্ আমাদের তাঁর ইবাদতকারী বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন !

---

৬৫. বুখারী, জিহাদ পর্ব, ২ : ৪৬

৬৬. আল কুরআন, ১৬ : ৯০

৬৭. প্রাগুক্ত, ২৮ : ০৫

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

হযরত শাহজালাল (র)-এর জীবন ও কর্ম

মোঃ হাবিবুর রহমান*

ভূমিকা

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হযরত শাহজালাল (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর শুভাগমন ও আত্মত্যাগের ফলে বাংলার মানুষ ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। আল্লাহ্ প্রেমিক এই মহাপুরুষ বাংলার আনাচে-কানাচে ইসলামের শ্বাশত ও চিরন্তন তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধসমাজ ও হিন্দুসমাজের অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষ দলে দলে তাঁর নিকট এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলো। সংসারবিরাগী আত্মত্যাগী এই সূফীর নেতৃত্বে ৩৬০ জন আউলিয়া ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কারণেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্য শ্রীহট্ট আজ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। উল্লেখ্য যে, হযরত শাহজালাল (র)-এর নেতৃত্বে সিলেট বিজিত হয়। এ জন্যে সিলেটের অপর নাম 'জালালাবাদ'। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতি (র)-কে যেমন 'সুলতানুল হিন্দ' নামে আখ্যায়িত করা হয়, তেমনি হযরত শাহজালাল (র)-কে 'সুলতানুল বাংলা আসাম' নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা আসামের সর্বত্র তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী দাওয়াহ্ আন্দোলন তথা দীনের কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এই বিশ্ববরেণ্য দরবেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

জন্ম

হযরত শাহজালাল (র) হিযাযের অন্তর্গত সুবিখ্যাত ইয়ামন নগরে এক সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এ তাঁর জন্ম তারিখ ৫৯৬ হিজরী বলে উল্লিখিত হয়েছে।[১] বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভাষ্যে জানা যায় যে, হযরত শাহজালাল (র) ১৫০ বছর বয়সে ৭৪৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশ্যাল সাইন্স হিউমানেটিজ এণ্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (২য় খণ্ড), ২য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৬।

www.pathagar.com

তাঁর জন্ম তারিখ ৫৯৬ সনে নির্ধারণ করা হয়।[২] হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ দশকে হযরত শাহজালাল (র) জন্মগ্রহণ করেন এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তিনি মুজার্‌রদ বা চিরকুমার ছিলেন। এ জন্যে তাঁকে 'মুজার্‌রদ-ই ইয়ামনী' নামে অভিহিত করা হয়।[৩]

পরিব্রাজক ইবনে বতুতা[৪] হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী[৫] (র) ও ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর[৬] (র) সকলেই হযরত শাহজালাল (র)-কে জালাল উদ্দীন তাবরিজী নামে অভিহিত করেছেন। তিনি একজন খ্যাতিমান সূফি সাধকের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ। সুলতান হোসেন শাহের আমলে ৫১২ সালের শিলালিপিতে হযরত শাহজালালের পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৭] ৯১৮ হিজরী সনে হোসেনশাহী একটি শিলালিপিতে তাঁকে শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৮] তাঁর পিতা জিহাদে নিহত হন। জন্মের তিন মাস পরেই তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। ইয়াতীম জালালের লালন পালনের দায়িত্বভার তাঁর মাতুল সৈয়দ আহমদ কবিরের উপর অর্পিত হয়।[৯]

সৈয়দ আহমদ কবির শাহজালালকে মক্কা শরীফে নিয়ে যান। মক্কা শরীফ ছিল তাঁর সাধনাক্ষেত্র। মামার তত্ত্বাবধানে থেকে শাহজালাল (র) কুরআন, হাদীস, ইলমে তাসাউফের বিদ্যা অর্জন করেন। সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দীর সোহ্‌বত ও সান্নিধ্যে থেকে তিনি শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারিফত তত্ত্ব হাসিল করেন। তিনি আরও ইল্‌ম, তালিম তরবিয়ত হাসিল করতে ব্যাকুল হলেন। অতঃপর শাহজালাল (র) আবু সাঈদ তাবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী প্রণীত 'আখবারুল আখিয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, শেখ জালাল (র) আবু সাঈদ তাবরিজীর মুরীদ ছিলেন। ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফি সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র)ও তাঁর নিকট থেকে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করেন।[১০] ড. আব্দুল

---

২. *সিলেট ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার,* ১৯৭০, পৃ. ৯৪।

৩. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফীসাধক,* ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ৫৮।

৪. মুহাম্মদ নাসির আলী অনূদিত, *ইবনে বতুতার সফর নামা,* বাংলা একাডেমী ঢাকা-২৪৬।

৫. কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র), *দলিলুল আরেফীন,* অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ চিশতি, পৃ. ৩৭।

৬. ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (র), *ফাওয়ায়েদুস সালেকীন,* অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ চিশতি, ঢাকা।

৭. Ahmad Hasan Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal. Journal of Asiatic Society of Pakistan,* Vol-1, Dhaka 1957, p. 7.

৮. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র),* তৃতীয় সংস্করণ ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ. ২০।

৯. সৈয়দ মতুর্জা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস,* তৃতীয় সংস্করণ, ইউপিএল, ১৯৮৮, পৃ. ৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

www.pathagar.com

করিম 'ফওয়াদুল ফওয়াদ' গ্রন্থের বরাতে বলেন যে, শাহজালাল (র) হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর শিষ্য থাকাকালে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির সঙ্গে পরিচিত হন।[১১] উল্লেখ্য যে, আবু সাঈদ তাবরিজীর ওফাতের পর শাহজালাল (র) হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর নিকট বাইয়াত হন এবং ৭ বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। প্রতিবছরই ৬৩২ হিজরী সনে তিনি পীরের সঙ্গে মক্কায় গিয়ে হজ্জব্রত পালন করতেন।[১২] ৬৩২ হিজরী সনে শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) শাহজালাল (র)-কে খেরাকায়ে খেলাফত দান করেন।[১৩] শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র)-এর ইন্তেকালের পর শায়খ জালাল উদ্দীন (র) হযরত বাহাউদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ তিনি তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। 'ইসরারুল আউলিয়া' নামক গ্রন্থে শায়খ ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর (র) উল্লেখ করেন যে, শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজী (র) তাঁর পীর শেখ বাহাউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর খেদমতে সর্বদাই নিয়োজিত থাকতেন। তিনি মুর্শিদের এতই সেবাযত্ন করতেন যে অন্য কোন মুরীদ ততটা করতে সক্ষম হতেন না। একদা তিনি জলন্ত চুলা মাথায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। 'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন ?' তিনি উত্তর দিলেন হজ্জে।' তাঁর খেদমতের ধরন দেখে আমি বিস্মিত হলাম। আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন যাবৎ তিনি এভাবে পীরের খেদমত করছেন ? তাঁরা বললেন, ২৫ বছর যাবৎ আমরা এমনই দেখছি।[১৪]

সূফিবাদ নিছক জ্ঞান বা দর্শনের পথ নয় বরং জ্ঞান ও সাধনার সমন্বিত পথ। যে ব্যক্তি ইলমে তাসাউফের আলো পায়নি, নবুয়তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। মূর্খরাই কেবল সূফিদের তত্ত্বকে অস্বীকার করে এবং অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হয়। সূফিদের সোহ্বতে এলে এবং ভালবাসা রাখলে ঈমানরূপ সম্পদ হতে কেহ বঞ্চিত হয় না।[১৫] হযরত শাহজালাল (র) সূফিদের অনুসৃত পথে কঠোর সাধনা করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সূফিসাধকরা শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত শিক্ষাদান করে মানব সমাজকে নূরে মোহাম্মদীর অনুসৃত পথে হিদায়েত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ সূফিদের প্রেম সাধনার অনুকূলে ছিল। বাংলার মানুষের হৃদয়ে সূফিতত্ত্বের বীজ বপন করে শাহজালাল (র) ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শায়খ জালালউদ্দীন বাগদাদের সুহরাওয়ার্দীয়া খানকার সঙ্গে ৩২ বছর সংশ্লিষ্ট থেকে বিশ্বের বিখ্যাত দরবেশদের ফয়েজ হাসিল করেন। একজন বান্দা ইনসান-ই-কামিল বা আল্লাহ্‌র অলী

---

১১. ড. আব্দুল করিম, ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের বিস্তার, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ বাংলা, পৃ. ৯।

১২. ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৯৯, ১৬৪।

১৩. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka 1975, p. 163.

১৪. *ইসরারুল আউলিয়া*, অনুবাদ- আব্দুল জলিল, ফেরদৌস লাইব্রেরী ঢাকা, ১৩৭৯ বাংলা, পৃ. ৪৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

www.pathagar.com

হলে চতুর্দিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ৬৫৭ হিজরী সনে হযরত শাহজালাল (র) তাঁর মুর্শিদ বাহাউদ্দিন সুহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেষবারের মত হজ্জ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ভারতের পূর্বাংশে ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হন।[১৬] সিলেটে আগমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পূর্বে হযরত শাহজালাল (র) একটি তাৎপর্যমণ্ডিত স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যে মক্কা মুয়ায্যমা থেকে তিনি ঐতিহাসিক সফর শুরু করেন।

'শ্রীহট্ট নূর'[১৭] নামক গ্রন্থে স্বপ্নটি নিম্নরূপ উল্লেখিত হয়েছে— "যাও শাহজালাল, আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম কর। শান্তির বাণী প্রচার কর। সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর। রহমানুর রহীম আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তুমি ভারতের পূর্ব সীমানায় ইসলামী ঝান্ডা উত্তোলন করবে এবং স্বীয় কীর্তি চিরস্মরণীয় করবে। সত্বর পূর্বদিকে রওয়ানা হও স্বীয় মাতৃভূমি তুল্য ভূমি যেখানে পাবে সেখানেই বসতি স্থাপন করবে।" হযরত শাহজালাল তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দী ও মুর্শিদ হযরত বাহাউদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর নিকট স্বপ্নের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাঁরা খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, "তুমি অবিলম্বে হিন্দুস্থান যাত্রা কর এবং সেখানকার লোকদিগকে পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত করে ইসলাম ধর্মের একত্ববাদের নিশান উড্ডীন কর।" স্বপ্নের ইঙ্গিত মোতাবেক মুর্শিদ কেবলা মক্কাশরীফ থেকে একমুষ্টি মাটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "এই মাটির বর্ণ গন্ধ ও স্বাদ যেখানে পাবে সেখানেই তোমার স্থায়ী অবস্থান ঠিক করবে।"

হযরত শাহজালাল (র)-এর জীবনী লেখকগণ প্রায় সকলেই এই খাব বা স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। পীরের অনুমতি পেয়ে শাহজালাল (র) হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত শাহজালালের পাক-ভারতের যাত্রা পথে মক্কা শরীফ থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে চাশনী পীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি সিলেটের মাটি পরীক্ষা করে আরবের মাটির সঙ্গে আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। হযরত শাহজালালের জন্মভূমি ইয়ামন থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন— তাদের মধ্যে হযরত তাজউদ্দীন শাহ কুরায়শী, হেকিমউদ্দীন কুরায়শী, মুহাম্মদ আইয়ূব ইয়ামনী, আরিফ ইয়ামনী, শাহ জীবন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রিয় জন্মভূমি ইয়ামন হতে শেষ বিদায় নিয়ে তিনি পবিত্রভূমি বাগদাদে এসে উপস্থিত হন। এখানে আবার হযরত বাহাউদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর খেদমতে হাজির হয়ে দোয়া নেন। বাগদাদ হতেও কয়েকজন দরবেশ তাঁর সঙ্গী হন। এদের মধ্যে জয়েনউদ্দীন আব্বাসী, নিজামউদ্দীন বাগদাদী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৮] সমরখন্দ হতে সৈয়দ উমর সমরখন্দী তাঁর সঙ্গী হলেন। তিনি বিশ্বের প্রধান প্রধান জনপদে কিছুদিন অবস্থান করেন।

বাগদাদ হতে বিভিন্ন জনপথ পরিভ্রমণ করে হযরত শাহজালাল (র) আফগানিস্থানে আগমন করেন। সেখান থেকে সৈয়দ মুহম্মদ ও মখদুশ জাফর গজনভী তাঁর সঙ্গী হন। অতঃপর তিনি

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৭. আব্দুর রহিম, খ্রিস্টপূর্ব ১৯০৫, পৃ. ১৪

১৮. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৫৫

www.pathagar.com

পাকিস্তানের মূলতানে এসে উপস্থিত হন। দরবেশ আরিফ তাঁর সঙ্গী হলেন। মুলতান হতে তিনি সদলবলে দিল্লী আগমন করেন। হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়া (র) দিল্লীতে শাহজালাল (র)-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান।[১৯] সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। সুলতান দরবেশদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন। দিল্লী হতে শাহজালাল (র) বাংলাদেশে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়া তাঁকে বিদায়ী সম্বর্ধনা জানান এবং শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ একজোড়া কবুতর উপহার দেন।[২০] এগুলোর বংশধর জালালী কবুতর নামে পরিচিত। যুগ যুগ ধরে এই কবুতর উভয় দরবেশের সাক্ষাতের প্রমাণ বহন করে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, শায়খ জালালউদ্দীন একাধিকবার ভারতবর্ষে সফরে এসেছিলেন। সুলতান সামসউদ্দীন ইলতুতমিশ-এর সময়ে (১২১০-১২৩৬) তিনি প্রথম দিল্লী, বদায়ুন ও বঙ্গদেশ সফর করেন। হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) উল্লেখ করেন যে, ইলতুত্‌মিশ শাহজালাল (র)-এর একজন একনিষ্ঠ মুরীদ ছিলেন। দিল্লীতে শায়খ জালালের আগমনের কথা জানতে পেরে সুলতান ও তাঁর সভাসদগণ এসে হাজির হলেন- শায়খের ইস্তেকবালের জন্যে। ইলতুত্‌মিশ সসম্মানে তাঁকে রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে আসেন।[২১] ভারতবর্ষে তাঁর প্রথম সফর স্বল্পস্থায়ী ছিল। ৬২৫ হিজরী সনে শাহজালাল বাংলাদেশে প্রথম সফর করেন এবং কয়েকমাস এখানে অবস্থান করে তাঁর পীর হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র)-এর খিদমতে বাগদাদ চলে যান।[২২] ৬৬৪ হিজরী সনে শাহজালাল (র) বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে আগমন করেন।[২৩]

দিল্লীর কুতুব নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার কাছ থেকে শুভ বিদায় নিয়ে শাহজালাল (র) বদায়ুন আগমন করেন। আখতার দেহলবী প্রণীত 'তাজকিরায়ে আউলিয়া এ হিন্দু' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে অবশেষে শাহজালাল (র) কিছুকাল বদায়ুনে অবস্থান করেন এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে বাংলাদেশ অভিমুখে রওয়ানা হন।[২৪]

পথিমধ্যে তিনি বিহার ও মানেরে অবস্থান করেন। বিহার থেকে দৌলত মানেরী মুজাফফর বিহারী, মুহাম্মদ বিহারী, শামসুদ্দীন বিহারী ইমামউদ্দীন বিহারী, হাসান উদ্দীন বিহারী প্রমুখ দরবেশ তাঁর সঙ্গী হন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি মুসলিম বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতীতে এসে পৌছেন।[২৫] এখানে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর অমায়িক ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিধর্মীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যে সমস্ত পূজারীর হাতে মন্দিরের ঘন্টা বাজত তাঁরাই

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২০. ড. এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

২১. ঐ-১০১

২২. ড. আব্দুল করিম, প্রবন্ধ, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১

২৩. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২৪. ক. আখতার দেহলবী, *তাযকিরাতুল আউলিয়া,* আব্দুল খালেক, ঢাকা, পৃ. ২৪ ; খ. *ইসরারুল আউলিয়া,* পৃ. ১৪৫-৪৬।

২৫. এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

www.pathagar.com

ইসলামের মহিমা প্রচার শুরু করল।[২৬] ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে শায়খ জালাল উদ্দীন ইয়ামিনী (র)-এর দ্বারা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী সমাজের সূত্রপাত হয়। উল্লেখ্য যে, সিলেট বিজয়ের আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী দাওয়াহ আন্দোলন ও দীনের কাজে নেতৃত্ব দান করেন।[২৭] বাংলার এককালীন রাজধানী পাণ্ডুয়া ও উত্তর বঙ্গে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার শেষে তিনি পূর্ব বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল এক বিরাট দরবেশ বাহিনী। ড. আব্দুল করিমের মতে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ সিলেট বিজয়ের আগ পর্যন্ত তিনি সোনারগাঁয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।[২৮] হযরত শাহজালাল (র) বাংলাদেশে আগমন করায় সাধারণ মানুষ ভক্তিভরে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামী নূরের আভা বাংলার সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শাহজালালের পবিত্র সোহবত লাভের উদ্দেশ্যে হযরত আবূ তাওয়ামা (র) ও তাঁর শিষ্য শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী সোনারগাঁয়ে[২৯] এসেছিলেন। প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে *শাহজালালের কান্দি* যুগ যুগ ধরে এখানে তাঁর অবস্থানের প্রমাণ দিচ্ছে। তিনি সোনারগাঁয়ে একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন। গরীব লোকজন এখানে আশ্রয় ও খাবার পেত। এই লঙ্গরখানাকে কেন্দ্র করে তিনি 'শাহ শহর' নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৩০]

গৌড় গোবিন্দের রাজত্বকালে সিলেটে কয়েকঘর ধর্মপ্রাণ মুসলিম বসবাস করতেন। সিলেট শহরের সুরমা নদীর তীরে টুলাটিকর পাড়ার ধর্মপ্রাণ মুসলমান বুরহানউদ্দীন স্বীয় পুত্রের আকীকা উপলক্ষে একটি গরু জবাই করেন। দুর্ভাগ্যবশত একটি পাখী একখণ্ড গোশত রাজবাড়ীতে ফেলে দেয়।[৩১] বিষয়টি গোবিন্দের গোচরীভূত হয়। ইসলাম ধর্মে নবজাত শিশুর আকিকা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। মুসলমানদের নিকট ইহা পুণ্যের কাজ। অপর পক্ষে হিন্দু ধর্মে গোহত্যা মহাপাপ। কারণ গরু তাদের নিকট দেবতুল্য। সুতরাং গোবিন্দের রাজ্যে গো-হত্যার দুঃসাহস তাঁর সহ্য হওয়ার কথা নয়। ফলে জালিম রাজা গোবিন্দ বুরহান উদ্দীনের হাত কেটে ফেলে এবং নবজাত শিশুটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৩২] এমন পাশবিক অত্যাচার কোন মানুষই সহ্য করতে পারে না। বুরহান উদ্দীন সুলতান ফিরুজ শাহের নিকট এই অমানবিক জুলুমের বিচার চেয়ে সাহায্য কামনা করেন। সুলতান সেনাপতি সিকান্দর খানকে গোবিন্দকে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করেন।[৩৩] সিকান্দর খান ফিরুজ শাহের নির্দেশ অনুযায়ী সসৈন্যে গৌড় অভিযানে অগ্রসর

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
২৮. ড. করিম, *প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী*, ১৩৭১
২৯. *মকতুবাদে সাদী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩০. ডা. বদরুজ্জামান, *সোনারগাঁ, ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁও*, পৃ. ৩৯।
৩১. *আল ইসলাহ্*, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৩৩. *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal*, p. 7.

www.pathagar.com

হন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কি ইচ্ছা-সিকান্দর খানের সিলেট অভিযান ব্যর্থ হয়। সুলতান এই খবর জানতে পেরে সৈয়দ নাসিরউদ্দীনকে সিপাহ্সালার বা সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁর নেতৃত্বে একদল সৈন্য সিকান্দর খানের সাহায্যে পাঠালেন। এই সময় হযরত শাহজালাল (র) সোনারগাঁয়ে অবস্থান করছিলেন। সিকান্দার খান ও নাসিরউদ্দীন সিপাহ্সালার একসঙ্গে হযরত শাহ্জালাল ইয়ামনী (র)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সিলেট বিজয়ের জন্যে দোয়া ও সাহায্য কামনা করেন। অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহজালাল (র) মহান আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করেন এবং ৩৬০ জন ভক্তসহ জিহাদে শরীক হন।[৩৪] মুসলিমবাহিনী শাহজালাল (র)-এর হরিণচর্ম নির্মিত জায়নামাযে করে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদী পার হন। কবি দিলওয়ারের কবিতায়-এর প্রমাণ পাওয়া যায় : 'জায়নামাজ বিছাইয়া তুমি দিলায় নদী পাড়ি, শুইনা রাজা গৌড় গোবিন্দের দিশা গেল উড়ি।'[৩৫]

৭০৩ হিজরী সনে হযরত শাহজালাল (র)-এর নেতৃত্বে সেনাপতি নাসিরউদ্দীন ও সিকান্দর খান গাজী শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করেন।[৩৬] শায়খের মহাবিপ্লবী নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হল। সিলেট বিজিত হলে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে সিলেটের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। হযরত শাহজালাল (র)-এর আদেশে তিনদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র শুকর গুজারী করা হয়। সিলেটের জমিনে কায়েম হল ইসলাম। ধন্য হল বাংলার মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হল মসজিদ-মাদ্রাসা খানকাহ ও লঙ্গরখানা। শান্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হলেন হযরত শাহজালাল (র)। ডাঃ কুদরত উল্লাহ সাহেবের ভাষায় ঃ

আকাশে বাতাসে আওয়াজ আল্লাহু-আকবার প্রতিধ্বনিতে গুজরে ওঠে, সেই একই সুর মাখামন্ত্রে মুগ্ধ আসাম বাঙাল কণ্ঠে কণ্ঠে রব জয় শাহাজালাল।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় বলেন—

'তুমি এনেছিলে ঈমানের আলো আখেরী নবীর এই নয়া মদীনাতে সত্য সাধক,
জালালী ফকির হযরত শাহজালাল।'[৩৮]

সিলেট বিজয়ের গৌড় গোবিন্দ হযরত শাহজালাল (র)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করলে তিনি বললেন, গোবিন্দ তোমার অতীত ইতিহাস তালাশ করে দেখ, উহা কলঙ্কের কালিমায় পরিপূর্ণ। তুমি ছিলে দেশের রাজা, আপামর জনসাধারণের কর্ণধার। তোমার কর্তব্য ছিল ন্যায়বিচার করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন না করে তুমি জুলুম ও প্রজাদমন নীতিই অবলম্বন করেছ। তোমার অত্যাচারে দেশবাসী আজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। মুসলমানদের উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছ, তার নজির ইতিহাসে কোথাও নেই। তোমার যথার্থ শাস্তি হওয়া

---

৩৪. প্রাগুক্ত পৃ. ১১৯

৩৫. *আল ইসলাহ্*, চৈত্র ১৩৭৪ বাংলা

৩৬. ঐ

৩৭. *আল ইসলাহ্*, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা, পৃ. ১০১।

৩৮. ঐ

www.pathagar.com

উচিত।[৩৯] রাজা গোবিন্দ তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন এবং প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। শায়খ জালাল (র) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। মক্কা বিজয়ের সময় রহমাহতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা) ক্ষমার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন নায়েবে রাসূল হযরত শাহজালাল (র) সেই আদর্শেরই অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে গৌড় গোবিন্দের পতনের বিষয়টি আলোচনা করা যায়। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা) বলেছেন, কাফিরদের রাজ্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু অত্যাচারীর রাজত্ব কোনদিন স্থায়ী হতে পারে না। একাদশ শতাব্দীতে নিজাম-উল-মূলক রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁর 'সিয়াসত নামায়' লিখেছেন, 'ধর্মহীন রাজ্য চলতে পারে, কিন্তু অত্যাচারীর রাজ্য চলতে পারে না। ইমাম গাজ্জালী (র) 'আত্তিবরুল মাসবুক' গ্রন্থেও অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[৪০] পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে— "আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" গৌড়গোবিন্দ একজন অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী শাসক ছিলেন। রাষ্ট্রনীতির সাধারণ নীতি অনুসারে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

সিলেটে ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলনের পর শাহজালাল (র)-এর সঙ্গী দরবেশগণ ও ভক্তবৃন্দ ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণী নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাছাড়', রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হযরত শাহ্জালালের খলিফাগণ ইসলাম প্রচার করেন।[৪১] হযরতের নেতৃত্বে বাংলায় এক বিরাট দরবেশ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। কুরআন শরীফের সূরা আলে ইমরান-এ বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যাঁরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তাঁরাই হবে সফলকাম।" আল্লাহ্র পাক কালাম অনুসারী দরবেশ দল বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা তওহীদ ও রিসালাতের বাণী প্রচার করে তাবলীগে দীনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। চট্টগ্রামের বদরপীর (র) ও খলিল পীর, কুমিল্লার কল্লা শহীদ (র), ঢাকার মালেক ইয়ামনী (র), মদনপুরের শাহ সুলতান (র), চব্বিশ পরগনার পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরাচাঁদ (র)সহ অনেকে ইসলামী দাওয়াহ্ আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন। গোরাচাঁদ (র) সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন। বীর মুজাহিদ শাহ্দৌলা শহীদ (র) পাবনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের নেতৃত্বদান করেন এবং শহীদ হন।[৪২] ৬৭৭ হিজরী সনে তাবলীগে দীনের কাজে নিয়োজিত থাকাকালে হযরত তুরকান শাহ (র) শহীদ হন। তুরকান শাহের হত্যার প্রতিবাদ স্বরূপ ফকির দরবেশরা

---

৩৯. কাজী গোলাম রহমান, *হযরত শাহজালাল (র),* ঢাকা।

৪০. ক. নিজামুল মূলক, *সিয়ামতনামা,* অনুবাদ সাদিক হোসন, ১৯৬৯, পৃ. ৯ ; খ. ইমাম গাজ্জালী (র) *আত্তিবরুল মসবুক,* বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৪৬।

৪১. চৌধুরী,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৪২. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

www.pathagar.com

জালিমের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেন। ফলে ৬৮৫-৮৭ হিজরী সনের মধ্যেই উত্তর বঙ্গে ইসলামী আন্দোলন সাফল্য লাভ করে এবং ইসলামী কাজের গোড়াপত্তন হয়।[৪৩] সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার ইমাম হযরত শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র)-এর ৭০ জন মুরীদ বা খলিফা দেবকোটে আত্মদান করেন। কয়েকজন সূফি দরবেশ দিনাজপুর ও দেবতলায় আত্মদান করেন।[৪৪] বাংলাদেশের সর্বত্রই সূফি সাধকরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম প্রচারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালেও এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। মূলত হযরত শাহজালাল (র)-এর নেতৃত্বেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এভাবেই বাংলায় মুসলিম মিল্লাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে প্রধানত সূফি ফকির দরবেশ দ্বারাই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এমনকি পরেও সূফি সাধকরাই ইসলামের সত্যিকার পতাকা বহন করে চলেছেন। বাংলায় সূফি আউলিয়ার প্রভাব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত আশরাফ সিমনাণী (র) জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর নিকট লিখিত চিঠির বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি চিঠিতে বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, কি চমৎকার এই বাংলাদেশ। এখানে নানা দিক হতে বহু অলী দরবেশ আগমন করেন এবং অবস্থান করতে থাকেন। বাংলাদেশের এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে সূফিরা আগমন করেন নি বা বসবাস করেন নি।[৪৫] শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজীর সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সূফি দরবেশরা সিলেট ও আশপাশের জেলাগুলোতে ইসলামের আলোক বর্তিকা হিসেবে আস্তানা গাড়েন। তাঁদের খানকা বা আস্তানাগুলো ইসলামিক জ্ঞান বিকাশের সহায়ক ছিল। এগুলোতে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের মরমীতত্ত্ব আলোচিত হত। সূফি সাধকরা যখন মানবতাবাদী ইসলামিক জীবনদর্শনের প্রতি এদেশবাসীকে আহবান জানান তখন বিনা দ্বিধায় হিন্দু বৌদ্ধ জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন।

হযরত শাহজালাল (র)-এর তরীকা

সূফি সাধনার পদ্ধতিকে তরীকা বলা হয়। প্রতি তরীকাই এক বা একাধিক বিশিষ্ট সূফি নির্দেশিত সাধন পদ্ধতি ধারণ করেছে। সব তরীকাই শেষ পর্যন্ত কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফি সাধক হযরত শাহজালাল (র) সুহরাওয়ার্দী তরীকার খলিফা ছিলেন। প্রায় সকল জীবনী লেখকই তাঁকে সুহরাওয়ার্দী তরীকার দরবেশ বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এ তরীকা প্রবর্তিত হয়। আর এ কাজটি করেন শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজী (র)। উল্লেখ্য যে, হযরত আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী ও হযরত শিহাবুদ্দীন ওমর বিন আব্দুল্লাহ্ আল সুহরাওয়ার্দী এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ। তাঁরা ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর বংশধর ছিলেন। স্মর্তব্য যে, শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর চাচা ও পীর আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী (র) একজন সুপ্রসিদ্ধ

---

৪৩. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৯৩

৪৪. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৯৩-৯৪

৪৫. ড. এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, ১৩১

www.pathagar.com

হাদীস তত্ত্ববিদ ছিলেন।[৪৬] তিনি বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ নিজামিয়া একাডেমীর রেক্টর ছিলেন। তিনি ইমাম গাজ্জালী (র)-এর মুরীদ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (রা) হাদীস বিদ্যা লাভ করেন। কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা গাওসুল আজম হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র)-এর নিকট থেকে শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী ফয়েজ, বরকত ও বেলায়েত লাভ করেন।[৪৭] আগেই বলা হয়েছে হযরত শাহজালাল (র) শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর মুরীদ ছিলেন।

সেজরানামা[৪৮]

হযরত মুহাম্মদ (সা)
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)
হযরত সালমান ফারসী (রা)
কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা)
ইমাম আবু জাফর সাদেক (র)
খাজা বায়েজীদ বোস্তামী (র)
শেখ মুহাম্মদ মানবেরী (র)
খাজা আরবী ইয়াজিদ আকশারী (র)
শেখ আবুল মুজাফ্ফর মাওলানা (র)
শেখ আবুল হাসান খারকানী (র)
শেখ আবুল কাসেম গোরযনী (র)
আবু বক্‌র নামস্যাস (র)
শেখ ইমাম আহমদ গাজ্জালী (র)
আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী (র)
হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র)
শায়খ শাহজালাল (র)

আবদুল কাদের জিলানী (র), ইমাম গাজ্জালী (র), ইবনুল আরাবী, হাদীস বিশারদ আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী (র) প্রমুখ সূফি পণ্ডিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায় বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তাদের সোহবতে ধন্য হযরত আবু সাঈদ তাবরিজী, সৈয়দ আহমদ কবির, হযরত শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র) প্রমুখ আউলিয়াদের সান্নিধ্যে শাহজালাল (র) ধন্য হয়েছিলেন।[৪৯] হযরত শাহজালাল (র) কিভাবে জিন্দেগীভর ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়েছেন এবং মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন ইবনে বতুতার সফরনামা ও সমকালীন মলফুজাত

---

৪৬. A. T. Arberry, *Sufism,* p.56.
৪৭. নজরুল হক, *দরবেশ কাহিনী,* ইফাবা, ঢাকা ১৯৮০ পৃ. ১৬-২০।
৪৮. প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৮২-৮৩
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

www.pathagar.com

সমূহে তাঁর প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। মরক্কো দেশীয় মুসলমান পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে শায়খ জালাল উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।[৫০] ইবনে বতুতা যিনি স্বচক্ষে শাহজালাল (র)-কে দেখেছিলেন এবং তাঁর আস্তানায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। ইবনে বতুতা বলেন, 'শাহ্জালাল (র) সিলেটের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন এবং অনেক হিন্দু তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে।[৫১] তিনি প্রায় ৪০ বছর একাদিক্রমে রোযা রেখে সারা রাত ইবাদত করতেন। হযরত শেখ ফরিদ (র) বলেন যে, শায়খ জালাল উদ্দিন ইয়ামেনী (র) অধিকাংশ সময় রোযা ও অনাহারে থাকা সত্ত্বেও কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না।[৫২]

শ্রীহট্ট বিজয়ের পরে শাহজালাল (র) তাঁর মুর্শিদের নির্দেশ মোতাবেক সিলেটেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন এবং মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় তাঁর সংযম, নিষ্ঠা ও সেবাধর্মী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সিকান্দর গাজীর হাতে সিলেটের শাসনভার ন্যস্ত করেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সিলেটকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। সিলেট সদর অঞ্চল ছাড়া তরফ ও দিনারপুর আরও দুইটি প্রশাসনিক অঞ্চল সৃষ্টি করে সৈয়দ নাসির উদ্দীন ও শাহ তাজউদ্দীন কুরায়সী (রা)-কে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।[৫৩] অতঃপর তিনি শাসনকর্তাদের পরামর্শ, দীনের দাওয়াতের জন্যে লোক নির্বাচন, ভক্ত মুরীদদের ফয়েজ দান ও তালিম প্রদান ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারক, মানবদরদী এই মহাপুরুষ ৭৪৬ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সূফি দরবেশদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যে সকল পীর আউলিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এখানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করেছে হযরত শাহজালাল (র) তাদের প্রধানতম। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত সূফি সাধক ছিলেন। দেশ জয় কিংবা পররাজ্য দখলের জন্যে তিনি এদেশে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন ইসলামের শাশ্বত বাণী সত্য ন্যায় ও সাম্যের সুমহান আদর্শ প্রচার করতে। তিনি এসেছিলেন পথভোলা গুমরাহ মানুষকে আল্লাহ্র রসূলের পথে দাওয়াত দিতে। এই মহামানব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সৎ কর্মের মাধ্যমে জনসাধারণের অন্তরে ও সমাজ জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাংলা আসামে তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারের বিস্ময়কর কাহিনী ও প্রভাবের কথা বিভিন্ন কবিতা ও গানে অদ্যাবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কোন প্রকার ভয়ভীতি বা জোর জবরদস্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। এখানে ইসলাম গৃহীত হয়েছে এর শাশ্বত মানবিক আবেদনের কারণে। ইসলাম ধর্মের সাম্য ও

---

৫০. ড. এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২১।

৫১. *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭২, পৃ. ৮১।

৫২. *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল বিশেষ সংখ্যা

৫৩. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

www.pathagar.com

ন্যায় বিচারের ধারণা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। সূফি দরবেশরা যখন একটি উদারধর্মী পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের প্রতি এদেশবাসীকে আহবান জানান, তখন স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মানুষ এই বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। বাংলার জমিনে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে হযরত শাহজালাল (র) গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত অবদান রেখেছিলেন। তাঁর খান্‌কা তৎকালে বাঙালি সমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর মসজিদ ছিল মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষাগার। তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্ব, অমায়িক ব্যবহার ও শুভ্র সমুজ্জ্বল আদর্শে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বিশ্ববরেণ্য দরবেশ হযরত শাহজালাল (র)-এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ঐতিহাসিক অবদান ও আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাদেশ আজ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ভারত উপমহাদেশের মানুষ এই সূফি সাধকের নিকট চিরঋণী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালে সর্বযুগে আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে তিনি চির অমর ও ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান*
ড. মোঃ ছানাউল্লাহ**

সারসংক্ষেপ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ, 'মুফতীয়ে আযম' নামে খ্যাত, পবিত্র কুরআনের মুফাস্‌সির, বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত, আধুনিক চিন্তাধারার দার্শনিক, মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে মুসলিম জ্ঞানপিপাসুদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সত্য ও শাশ্বত দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধানসমূহ পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি সম্ভব নয়। এ সত্য ও চিরন্তন জীবনাদর্শের মৌলিক ভিত্তি হল কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহর বিধানসমূহ সহজবোধ্য ও সুবিন্যস্ত আকারে মানব সমাজে উপস্থাপিত হয়েছে ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাধ্যমে। মুসলিম সমাজে ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামী শরী'আতের বিধানসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি ফিক্‌হ শাস্ত্র থেকেই জানা যায়। আর এ ফিক্‌হ শাস্ত্রের সাথে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর সম্পৃক্ততা ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রণয়নের মাধ্যমে যেভাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি রয়েছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান-গভীরতার জন্যে তিনি 'মুফতীয়ে আযম' উপাধিতে বিভূষিত হন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর এ ব্যুৎপত্তির কারণে তিনি শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাহেদ আল কাউছারী মিশরী কর্তৃক 'ফকীহুন্ নাফস' উপাধি লাভ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর জীবনালেখ্য, ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান এবং এ বিষয়ে প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

মুফতীয়ে আযম নামে খ্যাত উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ মুহাম্মদ শফী (র) ২০/২১ শাবান, ১৩১৪ হি. (জানুয়ারি ১৮৯৭ খৃ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ অঞ্চলে বিখ্যাত উসমানী বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুফতী রফী, 'হায়াতে মুফতীয়ে আযম', *আল-বালাগ পত্রিকা*, করাচী, (জামাদিউস সানী, শাবান,

www.pathagar.com

ইয়াসিন (র)। জন্মের পর তাঁর দাদা খলীফা তাহসীন আলী তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ মুবীন; কিন্তু তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াসিন (র) সন্তান জন্মের সংবাদ জানিয়ে তাঁর শায়খ রশীদ আহম্‌দ গাঙ্গুহী[২] (র)-এর নিকট চিঠি লিখলে তিনি খুবই খুশি হন এবং তার নাম রাখেন 'মুহাম্মদ শফী'। পরবর্তীতে এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শৈশবে তিনি বুজুর্গানে দীনের প্রতি সুধারণা ও অত্যধিক ভালবাসা রাখতেন। এ গুণটি তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। ছোট বেলায় তিনি সুযোগ পেলেই বড়দের মজলিসে গিয়ে বসতেন।[৩] দারুল উলূম দেওবন্দে[৪] তাঁর পড়াশুনার হাতেখড়ি হয়। পাঁচ বছর বয়সে তিনি হাফিজ মুহাম্মদ আযীম সাহেবের তত্ত্বাবধানে কু'রআন শরীফের পাঠ সমাপ্ত করেন।[৫] এছাড়া ফার্সী ভাষায় প্রচলিত গ্রন্থাবলী, আরবী ব্যাকরণ, ফিকহের প্রাথমিক পুস্তকাবলীসহ হস্তলিপি বিদ্যা তিনি তাঁর পিতার নিকট দেওবন্দ মাদরাসায় সমাপ্ত করেন। হিসাব বিদ্যা ও শিল্পকলার প্রাথমিক ধারণা তিনি তাঁর চাচা মাওলানা মানযুর আহমদের নিকট হতে লাভ করেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি যথারীতি উসূলে ফিকহ ও আরবী সাহিত্যের মাধ্যমিক স্তরের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন প্রচলিত ইসলামের প্রায় সর্ববিষয়েই তিনি জ্ঞান লাভ করেন।[৬] তিনি ইলম (জ্ঞান-বিজ্ঞান), মারিফাত[৭] যুহদ[৮] ও তাকওয়ার[৯] এমন এক পরিবেশে

---

২. শায়খ রশীদ আহমদ ১৮২৯ সালে সাহারানপুর জেলার গাঙ্গুহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা গাঙ্গুহী উঁচুমানের ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া' গ্রন্থকে হানাফী ফিকহের বিশ্বকোষ বলা যায়। মাওলানা নানুতুবীর ইন্তিকালের পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। ১২ আগস্ট ১৯০৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. হাবীবুর রহমান, *'আমরা যাদের উত্তরসূরী'*, (ঢাকা, আল-কাউছার প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ১২২।

৪. দারুল উলূম দেওবন্দ হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এটিকে 'এশিয়ার আযহার' নামেও অভিহিত করা হয়। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলার 'দেওবন্দ' নামক শহরে ১৫ মুহাররাম ১২৮০ হি./ ৩০ মে. ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৬), খণ্ড ১৩, পৃ. ২৮৬।

৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *ইমদাদুল মুফতীনে কামেল*, দারুল ইশাআত, (করাচী, তা.বি.), পৃ. ৩৯।

৬ *ইমদাদুল মুফতীনে কামেল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৭. মা'রিফাত শব্দটি ক্রিয়া বিশেষ্য। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- চেনা, জানা, অবগত হওয়া। তাসাউফের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর সাথে জানাকে মা'রিফাত বলে। তবে, 'উলামা-ই-দীন, ফকীহ্‌গণ ও অন্যান্যদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানকে মা'রিফাত বলে। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড, ১৮, পৃ. ১৮৪)।

৮. মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদ বা সূফীবাদ 'যুহদ' একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। যাহিদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'যুহদ'। 'যুহদ' বলতে বোঝায় পাপ কাজ এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন কোন জিনিস হতে সংযম অবলম্বন বা আত্মসম্বরণ করা। অতঃপর মনের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা সহকারে সকল নশ্বর দ্রব্যাদি হতে সংযম ও মিতাচার অবলম্বন, কঠোর সংযম বা তপস্যা এবং সকল সৃষ্ট জিনিসকে বর্জন করা। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২১, পৃ. ৬৬৯)।

www.pathagar.com

বেড়ে উঠেছিলেন, যে পরিবেশ থেকে জ্ঞান ও মা'রিফাতের আলো পুরো উপমহাদেশ তথা মুসলিম জগতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[১০] তিনি যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও দার্শনিক জুনায়েদ বাগদাদী (র)[১১], আল্লামা কারখী (র)[১২] (৮৭৩-৯৫১ খ্রি.), ইবনে হাজার আসকালানী (র)[১৩] (৭৭২-৮৫২ হি.) এবং ইমাম গাজ্জালী (র) (১০৫৮-১১১১ খ্রি.)-এর শিক্ষা ও আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৪]

তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরেই ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি আগ্রহের দিকটি প্রবলভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। জ্ঞান সাধনায় তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ও একনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। প্রতি দিনের ক্লাস হতে ফিরে এসে তিনি সহপাঠীদের নিয়ে রীতিমত তাকরার (শ্রেণী কক্ষে আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি) করতেন। তাঁর তাকরার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল।

---

৯. তাকওয়া শব্দের অর্থ হল আত্মরক্ষা, আল্লাহ ভীতি এবং কোন প্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। শরী'আতের পরিভাষায় তাকওয়া হল আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থেকে ইসলাম নির্দেশিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। (*ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ১০৭)।

১০. *আল-বালাগ পত্রিকা,* পৃ. ৯৮।

১১. হযরত জুনায়েদ (র) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর নামের সাথে বাগদাদী শব্দটি স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি অনেক বড় শায়খ ছিলেন। তিনি ইলমে যাহিরী এবং ইলমে বাতিনীর বহুবিধ বিষয়ের সুপণ্ডিত ছিলেন। সমকালীন বিভিন্ন সাধকরা তাঁকে একবাক্যে নিজেদের ইমামরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি 'শায়খদের কেন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। হযরত জুনায়েদ মূলত শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত সমুদ্রের গভীর সন্ধানী ছিলেন। তাঁকে জাতির মুখপাত্র এবং জাতির গৌরব বলে মনে করা হত। এ ছাড়া তাঁকে 'গাউছুল উলামা' ও 'সুলতানুল মুহাক্কিকীন' নামেও আখ্যাত করা হয়েছিল। 'এশক' ও 'যুহদে' কেউ তাঁর সমক্ষ ছিল না। পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহু দীনি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। (শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার, *তাযকিরাতুল আউলিয়া,* অনু. মাওলানা নূর মোহাম্মদ ফরিদী, ঢাকা, ১৩৯৫ বাংলা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬)।

১২. আল্লামা আল-কারখী-এর পুরো নাম উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান। তিনি ২৬০ হি./ ৮৭৩ সালে বাগদাদের কারখ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ৪র্থ / ১০ম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ফকীহ (ইসলামী আইনবিদ) উসূলী (আইন তত্ত্ববিদ) ও অনেক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ১৫ শাবান, ৩৪০/ ৯৫১ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। (*ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৬)।

১৩. ইবন হাজার আল্ 'আসকালানীর নাম হচ্ছে আবুল ফাদ্‌ল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল 'আসকালানী। শাফিঈ মাযহাবের একজন মিসরীয় বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ, বিচারক ও ঐতিহাসিক। তিনি ২৬ শাবান ৭৭২ হি./ ১৫ মার্চ, ১৩৭১ খ্রি. মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন-কর্ম হাদীস বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখর নির্দেশ করে এবং তাঁকে যেমন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসরূপে চিহ্নিত করে, তেমনি মুসলিম ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এ মহান জ্ঞানসাধক হাদীস শাস্ত্রসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১৫০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৮ জিলহজ্জ ৮৫২/ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৪৪৯ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। (*ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২০৯-২১৩)।

১৪. সায়্যিদ মাহবূব রিজভী, *তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ,* (ভারত : ইদারায়ে ইহতিমাম দারুল উলূম

www.pathagar.com

ছাত্ররা এতবেশী গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর তাকরারে অংশগ্রহণ করত যে, সেটা রীতিমত শ্রেণীকক্ষের রূপ ধারণ করত। একবার তিনি 'দারুল উলূম করাচীর' ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে তাকরারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি মাকামাতে হারিরী[১৫] গ্রন্থের তাকরার করার সময় শায়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী (র.)-এর পূর্ণ বক্তৃতা হুবহু নকল করতাম। অনেক সময় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমার অগোচরে আমার তাকরার শুনতেন এবং পরবর্তীতে আমি জানতে পারতাম যে, তিনি আমার তাকরার শুনে খুবই সন্তুষ্ট হতেন।"[১৬]

তিনি পড়াশুনায় এত বেশী মগ্ন থাকতেন যে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতেও তাঁর যাওয়া হয়ে উঠতনা। এমনকি দেওবন্দের ন্যায় ছোট অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলোও তিনি ভাল করে চিনতেন না। ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনা করে সামান্য সময় পেলে তাও তিনি শিক্ষকদের নিকট গিয়ে তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে ব্যয় করতেন। পড়াশোনায় অতিরিক্ত আত্মমগ্নতার কারণে তিনি অন্য কাজ করার সুযোগ পেতেন না। যে সকল শিক্ষকের নিকট হতে তিনি জ্ঞান লাভে ধন্য হন, তাঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–আল্লামা কাশ্মিরী (র.) (১২৯২-১৩৫২ হি.), মুফতী মাওলানা আযীযুর রহমান উসমানী দেওবন্দী (র.) (১২৭৫-১৩৪৭ হি.,), শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী দেওবন্দী (র.) (জন্ম ১৩০৫ হি./মৃত্যু ১৯৪৭ খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (র.) (১৮৩৩-১৮৮০ খৃ.) আরিফ বিলাহ হযরত মাওলানা সায়্যিদ মিয়া আসগর হোসাইন (র.) (মৃত্যু ১৩৬৪ হি.), মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বিলয়াবী (র.) (১৩০৪-১৩৮৭ হি.) প্রমুখ। হিজরী ১৩৩৫ সনে ২২ বছর বয়সে তিনি কওমী মাদরাসার সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেন।[১৭]

দীর্ঘদিন থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের অধ্যক্ষের সুদৃষ্টি তাঁর উপর ছিল বিধায় সে বছরই তিনি তাঁকে দেওবন্দে শিক্ষকতার দায়িত্ব দেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় এবং অতি অল্পসময়ে তিনি উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ দানের জন্য মনোনীত হন। প্রায় সব বিষয়ে পাঠদান করলেও দাওরায়ে হাদীসের পাঠ্য 'আবূ দাউদ শরীফ' ও 'মাকামাতে হারিরী'র পাঠ দান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের পাঠদানে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীরা বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করত।[১৮] নিজের অধ্যাপনা

---

১৫. 'মাকামাত' হল আরবী সাহিত্যের একটি শাখা। উন্নতমানের ভাষণ বা বক্তৃতা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মাকামাতে হারিরী বলতে সুসাহিত্যিক আল্লামা আল হারিরীর সেই গ্রন্থকে বোঝায় যাতে ৫০টি মাকামাত স্থান পেয়েছে। তার রচিত এ মাকামাগুলো এ জাতীয় সাহিত্যের সর্বোচ্চ নিদর্শন। ভাষার সৌন্দর্য, শব্দের ব্যবহার, বাক্য বিন্যাসে, উপমা উৎপ্রেক্ষা ও অলঙ্কারিক সাজ-সজ্জায় 'মাকামাতে হারীরির' তুলনা হয় না। উপমহাদেশের বহু মাদরাসাসহ বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাকামাতে হারিরী গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা লাভ করেছে। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় ভাগ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৪৫৭)।

১৬. *আল বালাগ পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০। ১৬ক. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১৭. হাবীবুর রহমান, *হায়াতুল মুসান্নিফীন*, (ঢাকা, আল-কাউছার প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৮৬।

১৮. *ইমদাদুল মুফতীন*, পৃ. ৪৫।

www.pathagar.com

সম্পর্কে তিনি বলেন-"দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে আমাকে প্রতিদিন ৬টি করে ক্লাস গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে আমি সেখানে দৈনিক ১৮ ঘণ্টা কাজ করতাম।"[১৯] তাঁর কর্মজীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় ব্যয় হত অধ্যাপনায়। দারুল উলুম দেওবন্দ ছাড়াও তিনি জামেয়া ইসলামিয়া দেবলে[২০] কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান এবং করাচীতে 'দারুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২১] এ প্রতিষ্ঠানে তিনি আজীবন শায়খুল হাদীসের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুখারী শরীফ ছাড়াও তিনি সেখানে 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' ও 'শামায়েলে তিরমিযী'র পাঠ দান করতেন।

তাঁর ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার।[২২] মুসলিম বিশ্ব তথা পাকিস্তান, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান ও বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে বিখ্যাত মুফাস্‌সির, ফকীহ, ও মুবাল্লিগ হিসাবে সারা বিশ্ব সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকজন হলেন[২৩] জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যা, নিউ টাউন করাচীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিনূরী (র.) (মৃত্যু-১৯৯৭ খৃ.)[২৪]; আশরাফ আলী থানবী (র) (১২৮০-১৩৬২ হি.)-এর বিশিষ্ট খলীফা ও মাদরাসা-ই-মিফতাহুল উলুম জালালাবাদ ভারতের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মসীহউলাহ খান (র.) (জন্ম-১৯৩০ খৃ.)[২৫]; ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী-অব-পাকিস্তানের সাবেক সদস্য

---

১৯. *আল বালাগ পত্রিকা,* পৃ. ১৫৭।

২০. *দেবল* : খাট্টা ও করাচীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি বন্দর। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্দু বিজয় (৭১১-৭১৪) থেকে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার কারণে এখানে বহু বিদেশী পণ্ডিতের আগমন ঘটে এবং এটা ইসলামী শিক্ষার এক লীলাভূমিতে পরিণত হয়। (ড. মুহাম্মদ এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান,* ইফাবা, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ৩৪-৩৫)।

২১. শামসুল হক, দৌলতপুরী, *তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি* (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৯), পৃ. ৭৬।

২২. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৪৬।

২৩. রশীদ আশরাফ, 'হযরত কে মা'রুফ তালামিযা আউর উনকে খিদমাত', *আল-বালাগ পত্রিকা,* পৃ. ৯১৫।

২৪. মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী পেশোয়ার জেলার এক বিদ্যুৎসাহী সাইয়্যেদ খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ আলিম ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। মাওলানা বিন্নোরী ছিলেন একজন ধীমান, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কোমল ও সুপ্রশস্ত দৃষ্টির অধিকারী আলিম। হাদীস শাস্ত্রে *'মারিদুস্ সুনান'* তাঁরই অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি ১৭ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে ১৩৯৭ হি. উষার সময় ইসলামাবাদ শহরে ইন্তিকাল করেন। (সাইয়েদ মাহবূব রিজভী, অনু. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস,* ইফাবা, ২০০৩, পৃ. ৬৪৩-৬৪৪)।

২৫. মাওলানা মাসীহ উলাহ খান ১৯৩০ সালে আলীগড় জিনার সারায়ে বারালায়ু-এর আপন পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমত ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করে মানতিক ও ফালাসিফা শাস্ত্রে উচ্চতর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর মুরীদ ছিলেন।

www.pathagar.com

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল হক (র) (১২৫৮-১৩৪২ হি.)[২৬]; ভারতের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বুরহান'-এর সম্পাদক মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী (র.) (জন্ম-১৯০৭ খৃ.)।[২৭]

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) রাজনীতিকে কখনও জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তবে রাজনীতিকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে সম্মিলিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণকে অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮] আর এ কারণেই মুসলমানদের তীব্র প্রয়োজনের সময় তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তিনি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন যখন আসন্ন তখন এ আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জনসমর্থন প্রতিষ্ঠা করা ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর দারুল উলূম দেওবন্দে কর্মরত থেকে এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল দারুল উলূমের প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তাই আশরাফ আলী থানবীর (র.) পরামর্শে ১৬ই রবিউল আউওয়াল ১৩৬২ হিজরীতে মুফতী শফী (র.) স্বীয় পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কোলকাতায় জমঈয়্যাতে উলামায়ে ইসলাম গঠন করা হয়। মুফতী শফী (র.)-এ সংগঠনের সদস্য হন এবং পরবর্তীতে কার্যকরী কমিটির প্রধান নির্বাচিত হন।[২৯] একটি আদর্শ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণ দু'বছর রাতদিন অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত গঠনে ব্যাপৃত থাকেন এবং এজন্য তিনি মাদ্রাজ হতে পেশোয়ার পর্যন্ত এবং পশ্চিমে করাচী পর্যন্ত সমগ্র দেশ ভ্রমণ করেন।[৩০]

১৩৫১ হি. সালে তিনি তাঁর খিলাফত লাভে ধন্য হন। মাওলানা থানভীর ৯১জন খলীফার অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনি *'শরীআত ও তাসাউফ'* নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২-৬৪৩)।

২৬. মাওলানা আব্দুল হক পুরকাযবী মুযাফ্‌ফর নগর জেলার অন্তর্গত পুরকাটী গ্রামে ১২৫৮ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৩ হিজরী সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১২৮৬ সালে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। আমল ও আখলাকে তিনি ছিলেন সালফে সালেহীন আলিমগণের যোগ্য নমুনা। তিনি ১৩৪২/১৯২৩ সালে ইন্তিকাল করেন। (দারুল উলূম দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮-৫১৯)।

২৭. মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী ১৩২৫ হি./ ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৪৪ হি. তে দারুল উলূম দেওবন্দ শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করেন। তারপর লাহোর অরিয়েন্টাল কলেজ থেকে ফাযিল এবং সেন্ট স্টেপেন কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতা আলীয় মাদরাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনিয়াত বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৩৮২ হি. থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪-৬৩৬)।

২৮. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *'মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ'* (ভারত : দারুল ইশাআত দেওবন্দ, ২০০১), পৃ. ১১৬।

২৯. *ইমদাদুল মুফতীন*, পৃ. ৫৫-৫৬।

৩০. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

www.pathagar.com

২৭ রমযান ১৩৬৭ হি. মোতাবেক ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আহবানে মুফতী শফী (র) দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।[৩১] ২৯শে জমাদিউস সানী, ১৩৬৭ হি. (১লা মে, ১৯৪৮ সালে) স্বপরিবারে তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ৬ই মে, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান পৌঁছেন।[৩২] তখন থেকেই পাকিস্তানের করাচীতে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর ৮০ বছরের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান। ১৩৪৯ হিজরী থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দারুল উলূমের প্রধান মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত করেন।[৩৩] ১৩৬২ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর তিনি উক্ত পদে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ১৩৫৪ হিজরীর মুহররম মাস থেকে 'আল মুফতী' নামে একটি শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। এ পত্রিকার সম্পাদনা, তত্ত্বাবধান ও প্রকাশনা সবই তাঁর দায়িত্বে ছিল। তৎকালীন, সময়ে উলামায়ে দেওবন্দের ফতোয়াসহ ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রকাশ ও প্রচারের একমাত্র মুখপত্রের কাজ করে 'আল মুফতী' পত্রিকাটি।[৩৪]

পাকিস্তানের প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালে একটি ল'কমিশন গঠন করেন। এ ল'কমিশনে তাঁকে সদস্য নিযুক্ত করা হয়।[৩৫] ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী ইন্তিকাল করলে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী জমঈয়্যাতে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি নিযুক্ত হন। ২২শে নভেম্বর ১৯৫৩ সালে তিনিও ইন্তিকাল করলে জমঈয়্যাতের সভাপতির গুরু দায়িত্ব মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর উপর ন্যস্ত হয়।[৩৬] ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার যাকাত সংগ্রহ ও এর খাত সম্পর্কে ইসলামী আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে যে যাকাত কমিটি গঠন করেন তিনি তাতেও সদস্য হিসাবে কাজ করেন।[৩৭]

গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ রচনার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা। ফলে সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে যখনই তিনি কোন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন তখনই সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত পুস্তিকা ও গ্রন্থ

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৩২ *ইমদাদুল মুফতীন*, পৃ. ৬৪।

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৩৪ *আল-বালাগ পত্রিকা*, পৃ. ১৮০-১৮২।

৩৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

৩৬ *ইমদাদুল মুফতীন*, পৃ. ৬৯।

৩৭ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

রচনা করেছেন। যেহেতু গ্রন্থ রচনার উদ্দশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করা, সেহেতু তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সর্বস্বত্ব নিজের জন্য সংরক্ষণ করেন নি এবং কখনও কোন রচনা হতে আর্থিক সুবিধাও গ্রহণ করেন নি। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি বিপুল সংখ্যক তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ছোট-বড় রচনার সংখ্যা ১৬২টি।[৩৮] তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে মা'আরেফুল কোরআন; জাওয়াহিরুল ফিকহ ; আলাতে জাদীদাকে শারঈ আহকাম (আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ইসলামের বিধান) ; খতমে নবুওয়াত (কামিল) ; ইসলাম কা নিজামে আবাদী (ইসলামের ভূমি আইন); ইসলাম কা নিজামে তাকসীমে দাওলাত (ইসলামে সম্পদ বণ্টন নীতি) ; আদাবুল মাসাজিদ (মসজিদ সম্পর্কিত আহকাম ও মাসায়েল) ; বীমা যিন্দেগী (জীবন বীমা) ; তাসবীর কী শারঈ হাইছিয়্যাত (ফটো বা ছবি সম্পর্কে ইসলামের বিধান) ; প্রভিডেন্ড ফান্ড পর যাকাত আউর সুদ (প্রভিডেন্ড ফান্ডের উপর যাকাত এবং সুদের মাসআলা) ; ঈমান ও কুফর কুর'আন কী রৌশনী মেঁ (কুরআনের আলোকে ঈমান ও কুফর সম্পর্কিত বিধান) ; সুন্নত ও বিদাআত ; সীরাত-ই- খাতামুল আম্বিয়া ; ভোট-ওয়া-ভোটার কী শারই হাইছিয়্যাত (শরীআতের দৃষ্টিতে ভোটদান ও ভোটার সম্পর্কিত বিধান) ; আউযানে শারঈয়্যা (শরীআতের পরিমাপসমূহ) ; কুরআন মেঁ নিযামে যাকাত (কুরআনে বর্ণিত যাকাত পদ্ধতি) ; মাকামে সাহাবা (সাহাবাগণের মর্যাদা) ; আহকামুল কুর'আন (আরবী) ; ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ (২ ভলিউম) উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি তিনি বড় বড় আলিমগণের রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও উপকারার্থে এবং স্বীয় গ্রন্থাবলী সুনিপুণভাবে প্রকাশ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিখ্যাত দুটি প্রকাশনা সংস্থা দারুল ইশাআত ও ইদারাতুল মা'আরিফ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনী সংস্থাদ্বয় অদ্যবধি ইসলাম ও মুসলমানদের নিরন্তর সেবা করে যাচ্ছে।

১১ শাওয়াল ১৩৯৬ হি. (৬ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে) উপমহাদেশের এ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুফতী-ই-আযম মুহাম্মদ শফী (র) ইন্তিকাল করেন। করাচী দারুল উলূম মাদ্রাসার পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩৯] তিনি পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁরা হলেন– মাওলানা যাকী কায়ফী, মাওলানা মুহাম্মদ রাফী, ওয়ালী রাযী, মাওলানা মুফতী রাফী উসমানী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী। কন্যাগণের নাম– নাঈমা খাতুন, আতীকা খাতুন, হাসীবা খাতুন এবং রাকীবা খাতুন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর অবদান

আরবী ফিক্‌হ-এর অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। তবে শব্দটি দিয়ে ইসলামী শরী'আহ 'আইনের জ্ঞান ও উলূমে দীনের জ্ঞান সাধনাকেই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।[৪০] ইমাম আবূ হানীফা (র) ফিক্‌হ এর অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে —

---

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

৩৯ হাবীবুর রহমান, *হায়াতুল মুসান্নিফীন* (ঢাকা, আল কাউছার প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৮৮।

৪০ ড. ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মুজাম আল-ওয়াসীত,* কুতুবখানা হুসাইনিয়া, দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত।

www.pathagar.com

ফিক্‌হ একটি উদ্ভাবনী শক্তি ও গভীর দীনি জ্ঞানের নাম। এর দ্বারা শরী'আতের বিধান, আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের রহস্য ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়াবলী অবগত হওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে যুগের সমস্যাবলীর সমাধান নির্ণয় ও তার সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানও লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গভীর দীনি জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী তাকে বলা হয় ফকীহ।[৪১] ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিক্‌হ শব্দটি এ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এটি কতিপয় প্রকাশার্থে শরী'আত নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ যেমন— পবিত্রতা অর্জন, সালাত, সাওম, যাকাত হাজ্জ ইত্যাদি), মুআমালাত (পারস্পারিক লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গিকারসমূহ বাস্তবায়ন ইত্যাদি), মুনাকাহাত (বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ) উকূবাত (অপরাধের শাস্তি তথা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সাথে সম্পর্কিত) মুখাসালা মুখাসামাত (যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-বিবাদ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত), হুকূমাত (রাষ্ট্রীয় বিষয়), খিলাফত (পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে মানুষের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত) ও সমসাময়িক উদ্ভূত বিষয়াবলীই হচ্ছে ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

মহানবী (স.)-এর যুগে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে ফিক্‌হ চর্চার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যে কোন বিষয়ের বিধান জানার জন্যে লোকেরা তাঁর কাছে চলে আসত, জানতে চাইত এবং তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে এর সামাধান করে দিতেন।[৪২] তাছাড়া তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেয়ার দায়িত্ব ও তাঁকে দেয়া হয়েছিল।[৪৩]

মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবা কিরাম (রা)-এর সময়ে যখনই নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হত তখন তারা এতে ইজতিহাদ করতেন। তাঁরা প্রথমে কুরআনে, তারপর হাদীসে এর সমাধান খুঁজতেন। যখন প্রত্যক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসের কোথাও সেই বিশেষ সমস্যার সমাধান পেতেন না, তখন তাঁরা এতে আরও গবেষণা করতেন এবং এটাকে কুরআন ও হাদীস হতে উদ্ভাবিত কোন নীতি বা ধারার অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করতেন।[৪৪] একইভাবে তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণও ইজতিহাদের মাধ্যমে নব নব সমস্যার সমাধান দিতেন। এভাবে ফিক্‌হ একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে পরিণত হয়।

মূলত 'তাফাক্কুহু ফী দ্বীন' তথা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা ছাড়া ইসলামের গভীরে পৌঁছা খুবই দুষ্কর। এ কারণেই কুরআন-হাদীসে 'তাফাক্কুহু ফী দ্বীন' তথা ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভের প্রতি বিশেষভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ[৪৫]

'উহাদিগের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাহাতে তাহারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে।'

---

৪১ গাজী শামসুর রহমান, *ইসলামী আইনতত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি,* (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮১), পৃ. ১-২।

৪২ আল-কুরআন, ২ : ১৮৯, ২১৫, ২১৭, ২১৯-২২০, ২২২-২২৩।

৪৩ আল কুরআন, ১৬ : ৪৪।

৪৪ আবু ছাইদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,* ঢাকা, পৃ. ১৭।

৪৫. আল কুরআন, ৯ : ১২২।

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কাম্য। ফিক্‌হ অধ্যয়নের গুরুত্ব বর্ণনার পাশাপাশি যারা এ বিষয়ে আগ্রহ বোধ করে না, পবিত্র কুরআনে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَمَا لِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا [৪৬]

'এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বুঝে না।'

এ আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীসের বাণীসমূহ সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষম হওয়া দোষনীয় বিষয়। ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী (সা) বলেন,

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

'আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।'[৪৭]

বস্তুত ফিক্‌হ-এর চর্চা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ বিষয়ে ইসলামের বিধি-নিষেধের যথার্থ উপস্থাপনকে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামী শরী'আতের প্রায়োগিক দিকটি কী হবে, তা নিশ্চিত করে। উদ্ভূত নানাবিধ সূক্ষ্ম সমস্যার সমাধান একমাত্র ফকীহগণের নিকট হতেই পাওয়া সম্ভব ; যাদেরকে আল্লাহ্ দ্বীনের উপলব্ধির ন্যায় অমূল্য সম্পদ দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন।[৪৮] হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد

'একজন ফক্বীহ শয়তানের মোকাবিলায় এক হাজার 'আবিদের চেয়েও শক্তিশালী।'[৪৯]

এভাবে কুরআন-হাদীসের বহু বাণীতে ইলমে ফিক্‌হ-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে ইলমে ফিক্‌হের চর্চা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) কালজয়ী অবদান রেখেছেন। সমসাময়িক ফকীহগণের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী খেদমত করেন। শিক্ষকতার জীবনে দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি ফিক্‌হ-এর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর পাঠদান করতেন। ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তিনি উদ্ভূত বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ফতোয়া দানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তীতে তাঁর উপর দারুল উলূম দেওবন্দের 'ফতোয়া বিভাগে' ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তখন থেকে তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা ফিক্‌হকে কেন্দ্র করে আবর্তিত

---

৪৬. আল কুরআন, ৪ : ৭৮।

৪৭. আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *'আস-সহীহ আল-বুখারী'*। (ভারত : মাকতাবা মোস্তফা-ই, দেওবন্দ, তা. বি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬।

৪৮ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যদি তারা প্রত্যাবর্তন করত, রাসূল (সা)-এর কাছে অথবা তাদের *উলিল-আমরদের* (শাসকশ্রেণী-নেতৃবৃন্দের) কাছে, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা বিধান বর্ণনায় পারদর্শী তারা এর সঠিক সমাধান বলে দিতে পারতেন।' (আল কুরআন, ৪ : ৮৩)।

৪৯ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ *'মিশকাতুল মাসাবীহ'*, (কলকাতা : এম. বশির হাসান এণ্ড সন্স, ১৩৫০ হি.) পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

হতে থাকে।" ১৩৪৯ হি. সালে প্রধান মুফতী হিসাবে তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।"[৫০]

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) যে সময়ে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন, সে সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক ও সংকটপূর্ণ। কারণ তখন পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে গোটা পৃথিবীর মানুষের জীবন যাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। চতুর্দিকে নিত্যনতুন উদ্ভাবনীর জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন লেনদেন পদ্ধতি চালু হচ্ছিল। আচার আচরণ ও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। আর প্রতিটি ভোর এমন নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে হাজির হত, যেগুলোর সুস্পষ্ট সমাধান ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যেত না। এ সব জটিল ও কঠিন বিষয়ে তিনি এমন দক্ষতার সাথে ফতোয়া প্রদান করতেন যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত। ফলে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) কর্তৃক পরিচালিত দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগ এমন আসনে আসীন হয়েছিল, যাকে কেবল ভারত নয়; বরং গোটা মুসলিম বিশ্ব ফতোয়া প্রদানের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল মনে করতো। যদ্দুরুন ফিক্‌হ সংশ্লিষ্ট কোন জটিল সমস্যা দেখা দেয়া মাত্রই আলিমগণ সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত লাভের জন্য তা দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগে পাঠাতেন।[৫১]

উক্ত সংকটাপূর্ণ সময়ে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ফতোয়া দানের এই গুরুদায়িত্ব এতটাই সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন যে, কালক্রমে ফতোয়া প্রদান তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায় এবং এটি তাঁকে মুসলিম বিশ্বে একজন 'শ্রেষ্ঠ ফকীহ' হিসাবে অমর করে রাখে।

ফিকহ্ সংশ্লিষ্ট তাঁর রচনাবলী

মুফতী শফী (র) তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের অগণিত লোকের অসংখ্য সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রদত্ত ফতোয়ার সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।[৫২] দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী থাকাকালীন তিনি ৩৭০৮২টি ফতোয়া প্রদান করেন।[৫৩] তাঁর ফতোয়ার এক বিশাল ভাণ্ডার দারুল উলূম দেওবন্দের অফিসের সংরক্ষণাগারে রয়েছে। এমনিভাবে ফতোয়ার এক বৃহদায়তনের পাণ্ডুলিপি দারুল উলূম করাচীতেও সংরক্ষিত আছে। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর এসব ফতোয়ার উপর আশরাফ আলী থানভী (র)সহ দেওবন্দের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নির্ভর করতেন।[৫৪]

---

৫০. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

৫১. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ*, (ভারত : দারুল ইশাআত দেওবন্দ, ২০০১), পৃ. ৪২।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৫৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫৪. *ইমদাদুল মুফতীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

উল্লেখিত ফতোয়াসমূহে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান রয়েছে। আধুনিক যুগে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যার সমাধানে তিনি যে স্বতন্ত্র ফতোয়া ও পুস্তিকা রচনা করেছেন, সেগুলোর তালিকা দৃষ্টে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এ বিষয়ে তাঁর পদচারণা কত বলিষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী ছিল। ঈমান ও তাহারাত পর্ব থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার আইন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উপরই তার স্বতন্ত্র পুস্তিকা রয়েছে। ফিক্‌হের উপর তিনি ৯৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৫] এছাড়া অনেক পুস্তিকা দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া রেজিস্টারে রয়ে গেছে, যেগুলো এখনও প্রকাশিত হয় নি। 'আর এ ধরনের রেজিস্টারের সংখ্যা ১৫টি।'[৫৬] উল্লেখিত এই পুস্তিকাগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এগুলো সাধারণ লোকের তুলনায় আলিমদের জন্য বেশি ফলপ্রসূ। এ ছাড়া পুস্তিকাগুলো অধ্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান লাভের সাথে সাথে নিত্য নতুন সমস্যার উত্তর বা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) কর্তৃক রচিত ফিক্‌হ সম্পর্কীয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

ক. ইসলাম কা নিজামে আবাদী - (ইসলামের ভূমি আইন)

এই গ্রন্থটি ইসলামের ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামের ভূমি আইন কুরআন হাদীসের প্রমাণসহ তুলে ধরা হয়েছে। কোন ভূখণ্ড মুসলমানদের করতলগত হলে সেখানে তাদের কি কি অধিকার প্রযোজ্য হবে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভারতীয় ভূ-খণ্ডের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয় ভূমিতে ইংরেজদের আধিপত্য ও এর শর'য়ী বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পাকিস্তানী ভূমির বিশেষ আইন, হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি এবং মুসলমানদের দাবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন-কানূনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভারত ও পাকিস্তানের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষ পরিচ্ছেদে ভারত পাকিস্তানের সম্পত্তি 'উশরী' না 'খারাজী' এ সম্পর্কে বিশ্লেষণসহ উশর ও খারাজের বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতে মুসলিম বিজয়ের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।[৫৭] এ গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, গ্রন্থকার এটি রচনা করতে গিয়ে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন, কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন; আর কত শত গ্রন্থের পাতা উল্টিয়েছেন।[৫৮]

খ. আওযানে শরইয়্যাহ (ইসলামী শরী'আতে নির্ধারিত পরিমাপসমূহ)

ইসলামী শরী'আতের অনেক বিধান কতিপয় ওজন ও পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। যেমন, দিরহাম, দীনার, সা', মাইল, গজ ইত্যাদি। যাকাত, সাদকাতুল ফিতর, সফরের বিধান

---

৫৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ,* 'মাকতাবায়ে তাফসীরুল কুরআন', (আরিফ কোম্পানী, সায়্যিদ মনজিল জামে মসজিদ, দেওবন্দ, ইউ.পি. ১১৯৬ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

৫৬. *ইমদাদুল মুফতীন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭, দেওবন্দ, ২০০১, পৃ. ৬০।

৫৮. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ,* দারুল ইশাআত দেওবন্দ, ২০০১, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

ইত্যাদিতে ঐ সকল শব্দ ইসলামী শরী'আর গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে প্রচলিত পরিমাপসমূহ এগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্য প্রয়োজন ছিল উক্ত প্রচলিত পরিমাপগুলোকে শর'য়ী পরিমাপে রূপান্তর করা। আর এ উদ্দেশ্যেই মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান করে বর্ণিত পুস্তিকাটি লিখেছেন।[৫৯] এ পুস্তিকা রচনায় তিনি এক অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেন। প্রতিটি পরিমাপকে তিনি নিজে ওজন করে পরীক্ষা করেছেন। দিরহাম-দীনার ইত্যাদির ওজন ফকীহগণ সুনির্দিষ্ট মাপের যবের বীজ দ্বারা করেছেন। তাই এই বিশেষ গুণসমৃদ্ধ যব-বীজকে প্রচলিত ওজনে পরিমাপ করেছেন। মোটকথা ৩২ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট পুস্তিকা রচনায় তিনি ফিক্‌হ, চিকিৎসা, ও ভাষার দুর্লভ গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন এবং নিজে প্রত্যেকটি ওজন ও তুলনাদণ্ডের বাস্তবিক পরীক্ষা নিয়েছেন। উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলিমগণ এ পুস্তিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী (র) (মৃ. ১৯৪৭ খ্রি.)-এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন, "এই পরিমাণ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করা মুফতী সাহেবের সাধ্যেই সম্ভবপর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ একমত।"[৬০] মাওলানা জা'ফর আহমাদ উসমানী (র) (১৮৮৭-১৯৭৪ খ্রি.)-এর ন্যায় বিচক্ষণ আলিম এ গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন, "এ গ্রন্থ পড়ে আমি এতটা প্রীত হয়েছি, যতটা মানুষ ঈদের চাঁদ দেখে হয় এবং এত বেশি খুশি হয়েছি যা কোন সম্পদ হারানো ব্যক্তি তার সম্পদ পেয়ে হয়ে থাকে। শত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি এই মনীষীকে দুর্লভ গবেষণার এবং গভীর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে মুক্তা সংগ্রহের তাওফিক দিয়েছেন।"[৬১]

গ. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ

ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম[৬২] দেওবন্দ (২ খণ্ডে সমাপ্ত) মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর লেখনী হতে নির্গত নতুন-পুরাতন প্রায় এক লাখ ফতোয়ার মধ্য থেকে নির্বাচিত এক হাজার ফতোয়ার একটি সংকলন।[৬৩]

ঘ. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ

'জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ' শীর্ষক গ্রন্থটি মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এতে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর বিভিন্ন দুর্লভ ফিক্‌হী পুস্তিকা ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহকে একত্রিত করা হয়েছে।[৬৪] এ গ্রন্থের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন,

---

৫৯. *ইমদাদুল মুফতীন,* প্রাগুক্ত, ৭৮-৭৯।

৬০. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৬২. দারুল উলূম দেওবন্দ ছাড়াও মুফতী শফী (র) করাচীতে 'দারুল উলূম' নামে একটি 'মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৬৩. *জাওয়াহিরুল ফিকহ,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

১. এতে মুফতী (র)-এর ঐসব ফিক্‌হী পুস্তিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

২. কোন মাসিক পত্রিকাতে নির্দিষ্ট কোন শিরোনামের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে ; তবে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

৩. গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল বটে; তবে দীর্ঘদিন যাবত তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল।

৪. এ সংকলনে পুস্তিকাগুলোর সন্নিবেশ যথাসম্ভব ফিক্‌হী ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে।

৫. প্রতিটি পুস্তিকার শুরুতে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ রচনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

৬. প্রতিটি পুস্তিকার বিস্তারিত সূচিপত্র সংশ্লিষ্ট সংকলনের প্রথমে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. তিনটি পুস্তিকা ছাড়া সবগুলো পুস্তিকার শিরোনাম স্বয়ং মুফতী শফী (র) কর্তৃক নির্ধারিত।

৮. এ গ্রন্থ সংকলনের যাবতীয় কাজ মুফতী শফী (র)-এর ইঙ্গিতেই করা হয়েছে।

৯. প্রায় সবগুলো পুস্তিকাই গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার পর মুফতী শফী (র) এগুলোর শুদ্ধতা যাচায়ের নিমিত্তে দ্বিতীয়বার তা পড়েছেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর রচিত এ গ্রন্থটিকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'বিশ্বকোষ' বলা যেতে পারে।

ঙ. আলাতে জাদীদা কে শর'য়ী আহকাম (আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আতের বিধান)

পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম সকল নতুন সমস্যার একমাত্র সমাধান। তবে ইসলামের মূল উৎস আল-কুরআন ও হাদীস থেকে সমস্যার সমাধান বের করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিগণই তা করতে পারেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এ গ্রন্থে বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সন্নিবেশিত করেছেন। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, উড়োজাহাজ, লাউড স্পীকার, ফটোগ্রাফি, সিনেমা, ফিল্ম, ইনজেকশান, এক্সরেসহ চিকিৎসা সম্পর্কীয় অভিনব যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৬৫] উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন ঃ

১. রফীকে সফর মা' আহকামে সফর (ভ্রমণের বিধান সম্বলিত ভ্রমণ সঙ্গি)

২. যবতে বিলাদাত আ'কলী ও শর'য়ী হাইসিয়্যত ছে (যুক্তি ও শরীআতের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ)

৩. ইসলাম কা নিযামে তাকসীমে দাওলাত (ইসলামে সম্পদ বণ্টন নীতি)

৪. বীমায়ে জিন্দেগী, বীমা আউর ইনসিউরেন্স কি শর'য়ী হাইসিয়্যত (জীবন বীমা, শরী'আতের দৃষ্টিতে বীমা ও ইনসিউরেন্স)

www.pathagar.com

৫. প্রভিডেন্ড ফান্ড পর যাকাত আউর সুদ কা মাসআলা (প্রভিডেন্ড ফান্ডের উপর যাকাত এবং সুদের মাসআলা)

৬. আদাবুল মাসাজিদ (মসজিদের আদবসমূহ)

৭. ইনসানি 'আযা কি ফায়বান্দকারী (মানব অঙ্গের সংযোগ বা প্রতিস্থাপন)

৮. আহকামুল ক্বিমার (জুয়ার বিধান)

৯. তাসভীর কে শর'য়ী আহকাম (ফটো বা ছবি সম্পর্কে ইসলামের বিধান)

১০. রু'ইয়তে হেলাল কে শরঈ আহকাম (চাঁদ দেখার ইসলামী বিধান)

১১. ইসলামী যাবীহা (ইসলামসিদ্ধ জবাই)

১২. শবে বরাত কে আহকাম (শবে বরাতের বিধান)[৬৬]

১৩. ঈমান ওয়া কুফর কুর'আন কী রৌশনী মেঁ (কুরআনের আলোকে ঈমান ও কুফ্‌র)

১৪. সুন্নত ও বিদআত

১৫. ভোট ওয়া ভোটার কী শার'য়ী হাইসিয়্যাত (ভোট ও ভোটার সম্পর্কে শরী'আতের বিধান)

১৬. কুরআন মেঁ নিযামে যাকাত (কুরআনে বর্ণিত যাকাত পদ্ধতি)

১৭. মাকামে সাহাবা (সাহাবাদের মর্যাদা)

১৮. আহকামুল কুরআন (আরবী) ইত্যাদি।

বস্তুত সময়ের দাবী ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অভিনব সমস্যার ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক সমাধান দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রের গবেষণায় তিনি এত গভীরে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর নামের সাথে 'ফকীহুন নাফস' উপাধিটি যথার্থ ছিল।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

বিবাহ এবং শিশুর উপর এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

ড. মোঃ ময়নুল হক*

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ তাদেরকে বিবাহ কর।[১] রাসূল (সা) বলেছেন : হে যুবক সকল, তোমাদরে মধ্যে বিবাহ করার সামর্থ্য যাদের আছে (দৈহিক, অর্থনৈতিক) তারা যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ দৃষ্টিশক্তি নিম্নগামী করে, আর গুপ্তাঙ্গকে হেফাযত করে।[২] তিনি আরও বলেছেন : যখন তোমাদের নিকট কারো দীনদারী এবং আমানতদারী সন্তুষ্ট বিধান করে তখন তোমরা তাকে বিবাহ দাও। যদি তাকে বিবাহ না দাও তবে যমীনে ফিৎনার সৃষ্টি করবে এবং বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৩]

'বিবাহ' মানব সমাজের অন্যতম মৌলিক সংগঠন। পরিবারের মূল উপাদান হল বিবাহ। আর পরিবার হল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম সিঁড়ি। এটা জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশে মানবিক পর্যায়ে ঘর বাঁধা, ভালবাসা ও ব্যক্তিত্বের চাহিদা পূরণ করে। পরিবারের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং অপরাপর দলবদ্ধতার অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিবাহের ভূমিকা অনন্য। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে 'বিবাহ'ই হচ্ছে যৌন আবেগ প্রবাহিত হওয়ার স্বভাবসম্মত সুষ্ঠু ও পরিমার্জিত উন্মুক্ত পথ।

পবিত্র কুরআনের কতিপয় উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً.

'হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং সেই দুইজন থেকেই (বিশ্বময়) ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল পুরুষ ও নারী।'[৪]

---

* সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি আল হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। কুষ্টিয়া।

১. আল কুরআন, সূরা নিসা ৪ : ০৩।

২. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামেয়ুস-সহীহ,* (দারুল কালাম, বৈরুত, ১৯৮৬) কিতাবুন-নিকাহ, হাদীস নং ৪৬৭৭। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ,* কিতাবুন-নিকাহ, হাদীস নং ২৪৮৫।

৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত্-তিরমিযী, *কিতাবুন-নিকাহ,* হাদীস নং ১০০৪।

৪. আল কুরআন, সূরা নিসা ৪ : ০১।

www.pathagar.com

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ

'তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও তাদেরই স্ব-জাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।'[৫]

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

'তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের কাছে পরম শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া অনুকম্পাও জাগিয়ে দিয়েছেন।'[৬]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا.

'হে মানুষ ! আমি নিঃসন্দেহে তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার।'[৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, মানবতার জয়যাত্রা এ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল একজন মাত্র মানুষ দিয়ে। পরে তারই অংশ থেকে জুড়ি (স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছিল। এদের এ দু'জনের পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফল হিসাবে দুনিয়ায় এত অসংখ্য পুরুষ ও নারীর অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে।

প্রাণী বিজ্ঞানের কথা অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি হয়েছে জুটি বাঁধা জীব হিসেবে এবং এই জুটি বাঁধা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।[৮] মানুষের বিকাশের ধারায় তার যৌনতা পারস্পরিক আকর্ষণ, জুঁটি বাধা এবং পরিবার গঠনের নিয়ামক ছিল।[৯] সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের সাথে আরো একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম জুড়ে দিয়েছেন, যার নাম জৈবরস। অন্যান্য রসের মতই নারী পুরুষের মস্তিষ্ক থেকেই এই রস নিঃসৃত হয়। এই রস স্নায়ুকে উত্তপ্ত করে ও মাংস পেশীকে উত্তেজিত করে তোলে। এই রাসায়নিক পদার্থের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।[১০] মানুষের মধ্যে ব্যক্তির প্রতি প্রেমের মিলন আবদ্ধ হওয়ার

৫. আল কুরআন, সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ১১।

৬. আল কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০ : ২১।

৭. আল কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১৩।

৮. নিউ রিপাবলিকের সিনিয়র এডিটর রবার্ট রাইট ১৯৯৪ সালে, The moral animal evolutionary psychology and everyday life. নামক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এই গ্রন্থ অবলম্বনে Our cheating hearts শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ, *Time International,* August 15, 1994, p. 33.

৯. (ডেসমন্ড মরিস, The naked ape ১৯৬৭ ইং) আহমদ মনসুর, *বহু বিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা),* (তাসলিম পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১২১৬, প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৫), পৃ. ২৩।

১০. *যায় যায় দিন,* ভালবাসা সংখ্যা, (সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩), পৃ. ১২।

www.pathagar.com

আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা আর একটিও নেই। এটাই আদিমতার ক্ষুধা, এটাই মনুষ্যজাতিকে, সম্প্রদায়কে, পরিবারকে ও সমাজকে একত্রে বেঁধে রেখেছে। এই মিলন ব্যর্থ হলে ধ্বংস অনিবার্য। নারী পুরুষের পারস্পরিক প্রেমের অভাবে মনুষ্যজাতি একদিনের জন্যও টিকতে পারে না।[১১] মৌলানা ফজলুল করিম বলেন :

If free love is allowed in discriminated and lusts for only a century the world will be a field of chaos, Bloodshed and social disorders of the magnitude.

যদি উন্মুক্ত ভালবাসাকে যৌনসঙ্গ কামনা এবং (পাত্রী) বাছিয়া নেয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয় এক শতাব্দীর জন্য তাহলে পৃথিবীটা ঝগড়া-বিবাদে, রক্তপাতে এবং সামাজিক অনাচারে ভরে উঠবে।[১২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নারী-পুরুষের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ স্বভাবগত। বিধাতা তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মানব স্বভাবে কতগুলো মৌলিক দাবী কামনা-বাসনা, স্পৃহা জন্মগতভাবে সুসংহত করে দিয়েছেন। যেমন খাবার স্পৃহা, যা মানুষ বাঁচার তাগিদেই অনুভব করে। যৌন স্পৃহা যা অত্যন্ত তীব্র ও শক্তিশালীভাবে নিহিত যে তা প্রায় দমনের অযোগ্য। আল্লামা ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেছেন : মানুষ এক্ষেত্রে তিনটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নিতে বাধ্য।

১. মানুষ হয় এ স্পৃহার লাগাম খুলে দিবে। ধর্মীয়, নৈতিক বা সামাজিক বাধা-বন্ধন মানবে না। এ ভূমিকা মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ডেকে আনে মারাত্মক বিপর্যয়।

২. মানুষ এ স্পৃহাকে প্রবল শক্তিতে দমন করবে অথবা সমূলে ধ্বংস করবে। এটা মানব প্রকৃতি-বিরোধী এবং এ পন্থায় মানব বংশ রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. অথবা যৌন স্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য একটা নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। তা এ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের সীমার মধ্যে স্বাধীন ও উন্মুক্ত হবে। তাকে নির্মূলও করা হবে না এবং পাগলের ন্যায় সীমালংঘনের অনুমতিও দেয়া হবে না। আসমানী ধর্মসমূহ এ নীতিই গ্রহণ করেছে। এ কারণে সবগুলো ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে এবং বিবাহের প্রচলন করা হয়েছে।[১৩]

---

১১. Erich Fromm, *The Art of Loveing* জিতেন্দ্রচন্দ্র, প্রেম : *দার্শনিক বিচার*, (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ. ০৫।

১২. Al Haj Maulana Fazlul Karim, AL HADIS (Trans. of M. Masabih), Part-1, (Bakshi Bazar, Dhaka), 3rd edition, 1969, p. 630.

১৩. ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, (অনুবাদক, মুহাম্মাদ আবদুর

www.pathagar.com

বিবাহের সংজ্ঞা

"বিবাহ হচ্ছে শরী'আত স্বীকৃত চুক্তি যার মাধ্যমে কতিপয় উদ্দেশ্য ও বিধান কার্যকর করা সম্ভব হয়। যেমন, যৌন অঙ্গ ভোগের অধিকার সম্পর্কিত বিধান।"[১৪] বিবাহ নারী-পুরুষের মাঝে সামাজিক পরিবেশ ও সমর্থনে শরী'আত মোতাবেক অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক, যার ফলে দু'জনের একত্রে বসবাস ও পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যায়। যার জন্য পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

বিবাহের গুরুত্ব

'মানব জীবনের শান্তি ও সুশৃঙ্খলার জন্য বিবাহ অপরিহার্য। বিবাহ ছাড়া নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করেছে। বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে নারীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন :

وَ مِنْ اٰيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً.

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[১৫]

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বিবাহ করেছেন। বিবাহ ছিল নবীগণের স্থায়ী সুন্নাত। কুরআনের ভাষায় :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.

'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।'[১৬]

বস্তুত মানব জীবনে বিবাহ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ছাড়া মানুষ তার মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

বিবাহের উদ্দেশ্য

নারী পুরুষের মধ্যে 'বিবাহ' নামক যে বন্ধনের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, তা মানুষের জন্য এক বিরাট নি'য়ামত। বিবাহ দ্বারা মানুষের অসংখ্য কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। তবে বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য চারটি : ১. নারী ও পুরুষের যৌন কামনা চরিতার্থ করার পন্থাকে বিধিবদ্ধ করা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলা থেকে তাদের পবিত্র রাখা। যেমন আল্লাহ্র বাণী : "এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্যে নয়।"[১৭]

---

১৪. ওবায়দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, *শরহুল বেকায়া*, ২য় খণ্ড, (দেওবন্দ, ভারত, তা.বি.) কিতাবুন নিকাহ, পৃ. ০৫।

১৫. আল কুরআন, সূরা আর-রুম ৩০ : ২১।

১৬. আল কুরআন, সূরা আর-রাদ ১৩ : ৩৮।

www.pathagar.com

২. নারী ও পুরুষের প্রাকৃতিক প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও হৃদ্যতার দাবীকে পুত-পবিত্র পন্থায় পূর্ণকরা এবং তার ফিতরাতের এসব দাবীকে বিকশিত করা ও পূর্ণতা দান করা। ৩. বংশ বিস্তার করা। ৪. পরিবার গঠন করা।[১৮]

বিবাহের সামাজিক উপকারিতা : মানব বংশ সংরক্ষণ

বিবাহের মাধ্যমেই মানব বংশ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। আর এই মানব বংশ রক্ষার মাধ্যমেই সমাজ গঠিত হয়। আসলে বিবাহ এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে মানুষই জন্মগ্রহণ করবে তার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে অসংখ্য প্রকারের আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে জড়িত পাবে, যার মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক জীবন, সামাজিক জীবন সুসংবদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য :

وَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

'আর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। অতঃপর তিনি তার বংশগত এবং সম্বন্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।'[১৯]

গোত্রীয় ধারা সংরক্ষণ

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানগণ তাদের পিতাদের বংশ ধারায় লীন হয়ে গর্ব অনুভব করে। এই বংশধারাই তাদের মানসিক গঠন ও আত্মিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। যদি আল্লাহ প্রদত্ত এই বিবাহ ব্যবস্থাই না থাকতো তবে সমাজ ভরে উঠতো এমন সন্তানদের দ্বারা যাদের না আছে সম্মান, আর না আছে বংশ পরিচয়। ফলে দুর্বৃত্তরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীকে খারাপ বলে ভর্ৎসনা করতো এবং লাগামহীন যৌনতা আর বিপর্যয়ের ক্ষেত্রকে করতো বিস্তৃত"।[২০] সুতরাং বিবাহ ব্যবস্থাই মানব বংশ ধারাকে কলুষমুক্ত রেখে গোত্রীয় ধারাকে সংরক্ষণ করেছে।

চারিত্রিক বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা

বিবাহের কারণে সমাজ চারিত্রিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ থেকে সমাজ হয় মুক্ত। কোন যুব সমাজ যখন বিপথগামী হয়, সমাজে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে— বিবাহই তখন তাদের ঔষুধ হিসেবে কাজ করে। বিবাহের মাধ্যমে যখন পারিবারিক, সাংসারিক দায়িত্ব মাথার উপর চলে আসে, তখন সামাজিক সন্ত্রাসের চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়।

---

১৮. আব্দুস শহীদ নাসিম, *পারিবারিক জীবন*, (বর্ণালী বুক সেন্টার, ঢাকা ১২১৭, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৯ ইং) পৃ. ১৯।

১৯. আল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৫৪।

২০. আব্দুল্লাহ নাসেহ অলওয়ান, *তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, (দারুস সালাম, বৈরুত :

www.pathagar.com

বিবাহের অন্যান্য উপকারিতা

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলভী (র) বিবাহ না করার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে লিখেছেন: "বীর্য যখন শরীরে বেশি হয়ে পড়ে তখন এটির গরম বাষ্প মস্তিষ্কে উঠে যায়।"[২১]

মাওলানা ফজলুল করিম বলেন : Marriage is therefore the best medicine for certain kinds of disease in grown-up men and girls. It also contributes to the physical beauty of the married couple. যুবক ও যুবতীদের মাঝে সৃষ্ট অনেক রোগের উপসমকারী ঔষধ হচ্ছে বিবাহ। এটি বিবাহিত দম্পতিদের শারীরিক সৌন্দর্য বর্ধনেও ভূমিকা রাখে।[২২]

বিশেষজ্ঞদের মতে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৪৭% কমে যায়।[২৩] যারা বিবাহ করে না তাদের চেয়ে বিবাহিত দম্পতিগণ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, চাই তারা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা বন্ধা হউক না কেন।[২৪] পৃথিবীতে বিবাহিত জুটির মৃত্যুর হার অবিবাহিত জুটির থেকে অনেক কম।[২৫]

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। আর সমাজেরই বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হলো রাষ্ট্র। পরিবার প্রথার অবর্তমানে সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং সমাজ ও সাংস্কৃতিক সুস্থতার জন্য পরিবার অপরিহার্য। বিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় তাদের পারিবারিক জীবনের। তাদের থেকে জন্ম নেয় তাদের সন্তান-সন্ততি। সন্তান লালন-পালনের জন্য, সন্তানের সুশিক্ষার জন্য পারিবারিক জীবন আবশ্যক। পরিবারে সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়।

আল-কুরআনের কতিপয় আয়াত পারিবারিক জীবনের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً.

'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন।[২৬]

---

২১. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস আদ-দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগা*, ১ম খণ্ড, (মাকতাবাতু থানভী, দেওবন্দ, ১৯৮৬), পৃ. ৫৪।

২২. Al-Haj Fazlul Karim, Ibid, p. 623.

২৩. *মাসিক মদীনা*, ঢাকা, জুন ১৯৯৮, পৃ. ৪১।

২৪. সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২য় খণ্ড, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৯৯৫, পৃ. ১০।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. আল কুরআন, সূরা আন-নাহল ১৬ : ৭২।

www.pathagar.com

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

'মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে নারীর প্রতি আসক্তি, আকর্ষণ, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রোপ্য।'[২৭]

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

'হে ঈমানদার বান্দাগণ দোযখের আগুন থেকে নিজেরা বাঁচ এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে বাঁচাও।'[২৮]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

'আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।'[২৯]

وَهُوَ الَّذِىْ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَه نَسَبًا وَّصِهْرًا وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

'আর তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম।'[৩০]

উপরোক্ত আয়াত সমূহের নির্দেশ ও দৃষ্টিভঙ্গির সফল বাস্তবায়ন একমাত্র বিবাহ ব্যবস্থার দ্বারা পারিবারিক জীবন গঠনের মাধ্যমেই সম্ভব।

পরিবার প্রথা বিলুপ্তির কুফল

বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগত থেকে পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর এতে করে তাদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি। আসলে মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য পরিবার নামক দুর্গের চাইতে বড় আশ্রয় আর কিছুই নেই। পরিবার ধ্বংসের দ্বারা মানুষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবনে যে চরম অশান্তি নেমে আসে তার কতিপয় নমুনা হলো :

১. যৌন জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি নেমে আসে ; ২. প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা ও বদান্যতা বিদূরিত হওয়া ; ৩. দয়া ও সহানুভূতি দূর হয়ে যাওয়া ; ৪. সুসন্তান ভাগ্যে না জোটা; ৫. সন্তানের সঠিক লালন-পালন ও সুশিক্ষা না হওয়া ; ৬. সমাজে কোন আদর্শিক ঐতিহ্য গড়ে না উঠা ; ৭. বংশধারা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ; ৮. নারী কঠোর শ্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া ; ৯. পিতা, মাতা ও সন্তান-সন্ততির অধিকার নষ্ট হওয়া এবং ১০. দাম্পত্য জীবনের সুখ-মাধুর্যতা বিলুপ্ত হওয়া।[৩১]

---

২৭. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান ০৩ : ১৪।
২৮. আল কুরআন, সূরা আত্ তাহরীম ৬৬ : ৬।
২৯. আল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৭৪।
৩০. আল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৫৪।
৩১. আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

www.pathagar.com

শিশুর শারীরিক বিকাশে বিবাহ ব্যবস্থা

শিশুরা হচ্ছে পুত-পবিত্র। যাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বেহেশতের পাখীদের মধ্যে একটি পাখি[৩২] হিসেবে গণ্য করেছেন। ইসলাম শিশু জন্মের পূর্বেই পিতা-মাতাকে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণে তাকিদ প্রদান করেছে। কেননা একটি শিশুর জন্ম পিতা-মাতার বীর্যের সংমিশ্রণেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

'আমি মানুষকে অভিন্ন বীর্যের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছি।'[৩৩]

কাজেই একজন সুস্থ্য সবল শিশু পেতে হলে প্রয়োজন পিতা-মাতাকে সুস্থ্য সবল হওয়া। এজন্য রাসূল (সা) বিবাহের পূর্বেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে : চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নারীদেরকে বিবাহ কর — তার ধনসম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য এবং দীনদারী (ধর্মভীরুতা)। আর দীনদারীকে প্রাধান্য দাও।[৩৪]

তিনি আরও বলেছেন : তোমরা আবর্জনার স্তুপে উদগত শ্যামলিকা (অর্থাৎ নিকৃষ্ট বংশের সুন্দরী রমণী) থেকে বেঁচে থাক।[৩৫] এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, নারীর সৌন্দর্যই একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় নয়, তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মাধুর্যতা অপরিহার্য। একজন সৎ ও ভাল সন্তানের জন্য একজন চরিত্রবান মা যেমন প্রয়োজন তেমনি একজন সৎ পিতাও প্রয়োজন। রাসূল (সা) মেয়ের অভিভাবকের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : যখন তোমাদের নিকট কারো দীনদারী এবং আমানতদারী সন্তুষ্ট বিধান করে তখন তোমরা তাকে বিবাহ দাও। যদি তাকে বিবাহ না দাও তবে যমীনে ফিৎনার সৃষ্টি করবে এবং বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৩৬]

হযরত উমার (রা)-এর সময়কার একটি ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য—

হযরত উমার (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে তার ছেলের অবাধ্যতার অভিযোগ করলো। তিনি তার সন্তানকে হাজির করলেন এবং তার পিতার প্রতি অবাধ্যতার ও তার অধিকার ভুলে যাবার কথা বললেন। ছেলেটি বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন ! পিতার উপর সন্তানের কোন অধিকার নেই ? তিনি বললেন হাঁ আছে। ছেলেটি বললো সেগুলো কি কি ? উমার (রা) বললেন : পিতা নিজে সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিবাহ করবে যেন তার সন্তানের মা এমন

---

৩২. মুসলিম ইবনুর হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম,* (দারুল এহ্ইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৫), কিতাবুল কদর, হাদীস নং ৪৮১২।

৩৩. আল কুরআন, সূরা আল ইনসান ৭৬ : ২।

৩৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, *কিতাবুন নিকাহ,* হাদীস নং ৪৭০০।

৩৫. মুহাম্মদ ইবন সালামাতা আশ-শিহাব, *মুসনাদুশ-শিহাব,* ২য় খণ্ড, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, দারুন নশর, বৈরুত, ১৯৮৬ ইং, পৃ. ৯৬।

৩৬. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত্ তিরমিযী,* (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ), কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১০০৪।

www.pathagar.com

কোন নারী না হয় যার ফলে সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হতে পারে বা লজ্জা ও অপমানের কারণ হতে পারে। সন্তানের ভাল নাম রাখা এবং সন্তানকে আল্লাহ্‌র কিতাব শিক্ষা দেয়া। ছেলেটি বললো : হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার পিতা এর কোন কিছুই করে নি। আমার মাতা একজন অগ্নি উপাসকের কৃতদাসী ছিলেন আর আমার নাম রেখেছেন জা'লান (হুতুম পেঁচা) এবং আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে একটি অক্ষরও শিক্ষা দেন নি। লোকটির দিকে হযরত উমার (রা) তাকালেন এবং বললেন : তুমি এসেছো তোমার ছেলের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার অভিযোগ করতে অথচ তুমিই আগে তার সাথে অবাধ্যতা করেছো এবং তোমার সাথে খারাপ আচরণের পূর্বে তার সাথে তুমি খারাপ আচরণ করেছো।[৩৭]

সন্তানের উপর মা-বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী অত্যাধিক প্রভাব ফেলে যে কারণে ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে। শিশুর মানস গঠনে বৈবাহিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা দূরবর্তী আত্মীয় দেখে বিবাহ কর, যাতে করে তোমাদের বংশধর দুর্বল হয়ে না পড়ে।[৩৮] তিনি আরও বলেছেন : অনাত্মীয় পরিবারে বিবাহ কর এবং ক্ষীণ ও কৃশ নারী বিবাহ করো না।[৩৯] ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীগণের দৃষ্টিতে নিকাটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ করলে বংশ বিস্তার সীমিত হয়ে যায় এবং বংশগত রোগের বিস্তার ঘটে।[৪০]

শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেজন্য ইসলাম ইবাদাতের ক্ষেত্রে রুখসাতের বিধান প্রবর্তন করেছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মায়েদের রোযা ও শিথিল করে দিয়েছে ইসলাম— যাতে সন্তানের বেড়ে উঠা নিষ্কন্টক হয় এবং শারীরিক গঠন পূর্ণতা পায়।

'বুকের দুধ খাওয়ান শিশুকে বাঁচান'।[৪১] এবং 'মায়ের দুধের বিকল্প নেই।'[৪২] হাল যামানার বহুল উচ্চারিত শ্লোগান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে ১ আগস্ট পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস' হিসাবে। এত কিছুর পিছনে যে রহস্য লুকায়িত তা হলো পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতার ধুয়া তুলে মাতৃত্বের আসন থেকে নারীকে সরিয়ে দেওয়া। আপন সন্তানকে নিজের বুকে আল্লাহ্

---

৩৭. আব্দুল্লাহ আল অলওয়ান, *তারবিয়্যাতুল আওলাদ ফিল ইসলাম,* ১ম খণ্ড, (বৈরুত, দারুস সালাম, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১ ইং, পৃ. ১২৮।

৩৮. মাহমুদ জামাল, ইসলামে শিশু অধিকার, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০০ ইং, পৃ. ১৯।

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. *ইসলামে শিশু পরিচর্যা,* ইউনিসেফ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮৭ ইং, পৃ. ৬৭।

৪১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা, মায়ের দুধের বিকল্প বিপনের আন্তর্জাতিক নীতিমালা মুদ্রণ, ব্র্যাক প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৮৯ ইং, কভার পেজ।

৪২. মুহাম্মদ 'আলী আস্-সাবুনী : *রাওয়ায়িল বয়ান তাফসিরু আয়াতিল আহকাম,* ১ম খণ্ড, (মাকতাবা

www.pathagar.com

প্রদত্ত দুধ থেকে বঞ্চিত করার ফলে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে। Child care home গঠন করেও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিপর্যয়কে রোধকরা সম্ভব হচ্ছে না। নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যকে অটুট রাখা আর দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আপন শিশু সন্তানদেরকে বঞ্চিত করছে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে। এসব অযৌক্তিক চিন্তা চেতনা, প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির পরিপন্থীতো বটেই এমনকি শিশুদের সঠিক প্রতিপালন নীতিরও বিপরীত। পৃথিবী নামক এই গ্রহে অসভ্য, ইতর নির্বোধ প্রাণীরা সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি তাদের বাচ্চাদেরকে 'মাতৃদুগ্ধ পান করানোর সুমহান দায়িত্ব সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে পালন করে চলেছে তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত নিয়মের আলোকে; যার ব্যতায় ঘটছে না যুগের পরিবর্তনে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা জীব, সুসভ্য, বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ তার অনাগত ভবিষ্যত বংশধরকে বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে— যা সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের অন্তরায়। শারীরিক সুস্থ্যতা, মানসিক উৎকর্ষতা, আর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ শিশুর মাঝে কিভাবে আনয়ন করা যায় তা নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা। মাথার ঘাম পায়ে ফেরে বিজ্ঞানীরা বাস্তব সত্য স্বীকারে বাধ্য হচ্ছেন যে, 'মায়ের দুধের বিকল্প নেই'। কারণ 'মায়ের দুধ শুধু পুষ্টিকরই নয়, বরং এতে রয়েছে জীবাণু প্রতিরোধক উপাদান (এন্ট্রি বডিজ) সমূহ যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মায়ের দুধে আরও রয়েছে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া নির্মূলকারী প্রোটোজোয়ান, এনজাইম ও ফ্যাটি এসিড। প্রোটিন যা ফুসফুস ও পাকস্থলীর কোসে হামলা চালাতে জীবাণুকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে।[৪৩] মায়ের দুধ সম্পর্কে অতি সম্প্রতি জানা গেছে যে, 'মায়ের দুধ ক্যান্সার প্রতিরোধ করে'।[৪৪] শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর প্রদাহ, অপুষ্টি এবং ছোঁয়াছে রোগ সমূহ। যার সবগুলোই প্রতিরোধ সম্ভব। বুকের দুধ এই রোগসমূহের অনেকখানি প্রতিরোধে সক্ষম।[৪৫] স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তারগণ মায়ের দুধের গুরুত্ব, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার অসংখ্য নতুন যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও 'ইউনিসেফ' মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে এবং মাতৃদুগ্ধ পানে বাধা সৃষ্টিকারী পণ্য সামগ্রী ও শিশু-খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দেয়া প্রাকৃতিক বিধান পুনরায় মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাচ্ছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলোতেও দুধের পক্ষে প্রচারণা চালাতে হচ্ছে এটাই দুঃখের ব্যাপার। কারণ পাশ্চাত্য বিশ্বের হাতে আল-কুরআনের মত জ্ঞানগর্ভ কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। মুসলমানদের হাতে আল্লাহ্ এমন এক গ্রন্থ প্রদান করেছেন যাতে

৪৩. *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা, ১৯৯৫ ইং, ১৭ সেপ্টেম্বর, পৃ. ৬।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. ডা. এম. এম. খালেকুজ্জামান, সিনিয়র কনসালটেন্ট, শিশু বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া, *বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস, ২০০০* উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ, পৃ. ১।

www.pathagar.com

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ সেই পবিত্র গ্রন্থের বিষয়ে রয়েছে উদাসীন। মায়ের বুকের দুধ পান করানোর মত কল্যাণকর বিষয় আল কুরআন এড়িয়ে যায় নি। চৌদ্দশ' বছর আগে মানবজাতিকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের আহবান জানিয়েছে পবিত্র কুরআন এবং শালদুধ সম্পর্কেও এতে রয়েছে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোরপোষের দায়িত্ব। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাউকে তার সীমাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবেনা এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিশদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন।'[৪৬]

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার :

১. শিশুকে স্তন্য দান মায়ের উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্য দান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্য দানের জন্য স্ত্রী, স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকবে কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।

২. স্তন্য দানের সময়সীমা দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয় তবে তা বাচ্চার অধিকার। দু'বছর পর স্তনের দুধপান করানো চলবে না। তবে কোন কোন আয়াত ও হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানিফা (র) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে আড়াই বছর

৪৬. আল কুরআন, সূরা আল বাকারা ২ : ২৩৩।

www.pathagar.com

তথা ত্রিশ মাস পর্যন্ত সময় সীমা বর্ধিত করেছেন। এরপর শিশুকে মাতৃস্তনের দুধপান করানো সকলের ঐক্যমতে হারাম'।[৪৭]

৩. 'পিতার অবর্তমানে পিতার উত্তরাধিকারীগণের উপরও নবজাতকের দেখাশুনা করা, শিশুর জননীর খোরপোষের ব্যবস্থাকরা এবং তার বিভিন্ন দাবী-দাওয়া চাহিদা পূরণে সদাসচেষ্ট থাকা ইত্যাদি দায়িত্ব বর্তায়'।[৪৮]

৪. 'স্বাভাবিক অবস্থায় সন্তানকে দুধ পান করাতে মাতা যদি অস্বীকৃত জানায় এবং পিতার পক্ষে কোন উপযুক্ত স্তন্যদানকারী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে মাতাকে শিশুর দুধ পানে বাধ্য করা যাবে না। কারণ তখন স্পটতই বোঝা যাবে যে, মাতার এ অস্বীকৃতির পিছনে নিশ্চয়ই তার অক্ষমতাজনিত কোন কারণ নিহিত রয়েছে। কেননা মাতৃ-স্নেহ এমন এক ব্যাপার যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বিনা কারণে ঐ মাতা তার শিশুকে স্তন্যদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি।[৪৯]

ইমাম যুহুরী বলেন ঃ কোন সন্তানের জননী যদি বলে যে, আমি এ বাচ্চাকে দুধ পান করাতে পারবো না, অথচ এর দুধই শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাদ্য স্নেহ-প্রবন ও অধিক উপযোগী অন্য যে কোন মহিলার চেয়ে। তাহলেও বাধ্য করা যাবে না, কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন সন্তানবতীকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করেছেন।[৫০] তবে যদি শিশুকে অপর মহিলার দুধ কোন বিশেষ কারণে পান করাতে হয় তাহলে ঐ দুগ্ধ-দাত্রীর সুন্দর গঠন, সৎচরিত্রা হওয়াটাই কাম্য। কারণ দুধ অনেক সময় স্বভাব-চরিত্র পাল্টে দিতে পারে। এ কারণেই কোন কাফির, ফাসিক দুশ্চরিত্রা, অথবা যেসব মহিলার সংক্রামক রোগ ব্যাধি আছে এদের দুধ পান করা লোকে অপছন্দ করে থাকে। কারণ এসব বৈশিষ্ট্য ও রোগ শিশু সংক্রমিত হতে পারে।[৫১] যেমন এইড্‌স, ডায়বেটিস, জণ্ডিস, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ শিশুর মাঝেও সংক্রমিত করতে পারে।

মাতৃদুগ্ধ পান করানো সম্পর্কে মুহাম্মদ (সা) অনেক উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলেছেন ঃ

জনৈক মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবর্তী হয়। সে নবীর নিকট এসে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তার উপর ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি (পাথর মেরে হত্যা) প্রয়োগের অনুরোধ

---

৪৭. মুফতি মুহাম্মদ শাফী (র), *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন,* (পবিত্র কুরানুল কারিম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), খাদেমূল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পোঃ বক্স নং- ৩৫৬১, মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিঃ পৃ. ৪৫৮)।

৪৮. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, মুখতাসার, *তাফসীরে ইবনে কাসির,* ১ম খণ্ড, (দারুল কুরআনুল কারীম, ৭ম সংস্ক, ১৯৭১ ইং), পৃ. ২১২।

৪৯. আহমদ মুল্লাযিউন, *তাফসীরাতে আহমাদিয়া,* (মাকাতারা, রহীমীয়া, দেওবন্দ, ইণ্ডিয়া), পৃ. ১০০-১০৩।

৫০. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, *কিতাবুন নাফাকাত,* নম্বর বিহীন হাদীস।

৫১. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান, *তাইসীরুল আল্লাম শরহে উমদাতুল-আহকাম,* ৩য় খণ্ড (মাতবাআতুল হাদীসা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সৌদিআরব, ১৯৮৪ ইং), পৃ. ১০৬।

www.pathagar.com

জানায়। সবকথা শুনে নবী করিম (সা) বললেন; ঠিক আছে তুমি তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব করার পর এ শাস্তির ব্যবস্থা হবে। মহিলা চলে এলো। অতঃপর সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর পুনরায় নবী করিম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে শাস্তি দেয়ার অনুরোধ জানায়। নবী বললেন ঃ তোমার সন্তান হয়েছে ঠিক তবে এ মুহূর্তে তাকে আমরা শাস্তি দিতে পারি না। কারণ তার মৃত্যুর পর তার ছোট শিশুকে দুগ্ধপান করানোরতো কেউ থাকবেনা।[৫২] অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে "নবী করিম (সা) মহিলাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুটিকে একটি কাপড়ের টুকরায় জড়িয়ে মহিলা পুনরায় নবী (সা) নিকট এসে তার উপর শাস্তি প্রয়োগের অনুরোধ জানায়। এবার নবী (সা) তাকে বলেছেন যে, বাচ্চাসহ বাড়ীতে গিয়ে দুধ ছাড়ানোর নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত তাকে দুধপান করাতে থাকো। এরপর দুধ ছাড়ানো হয়ে গেলে শিশুটির হাতে একটুকরা রুটি দিয়ে, পুনরায় নবী (সা) নিকট এসে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহর রাসূল (সা) এই যে দেখুন আমার শিশুটি দুধপান ছেড়ে এবার স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করেছে সুতরাং এবার আমাকে শাস্তি দিন। এবার নবী (সা) শিশুটির দায়িত্ব জনৈক মুসলমানকে দিয়ে ঐ মহিলার উপর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।[৫৩]

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা মাতৃদুগ্ধ পানে সন্তানের যে অধিকার রয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। অবৈধ জারজ সন্তানের ক্ষেত্রে নবী (সা) মাতৃদুগ্ধ পানের বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, তার জন্য একটি কঠিন শাস্তি পর্যন্ত স্থগিত করে দিয়েছেন। শিশুকে উট বা ছাগলের দুধপান করানোর সকল সুযোগ সুবিধা কিংবা অন্য কোন মহিলার দুধপান করানোর বিকল্প সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সা) ঐ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এতে পরোক্ষভাবে হলেও একথা প্রমাণিত হয় যে, মায়ের দুধের বিকল্প নেই। এছাড়া 'শালদুধ' পান করানো সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ইঙ্গিতময় আয়াতটি হলো :

وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسِي اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِيْ الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ.

'আমি মূসা জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাকো, অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করোনা, দুঃখও করোনা, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলগণের একজন করবো।'[৫৪]

---

৫২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, প্রাগুক্ত, *কিতবুল হুদুদ*, হাদীস নং- ৩২০৭। আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস্, প্রাগুক্ত, *কিতাবুল হুদুদ*, হাদীস নং ৩৮৫৩।

৫৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতে শিশুটিকে 'স্তন্যদান করবা', 'করতে থাকো' নির্দেশের মধ্যেই শাল-দুধের ইঙ্গিত বর্তমান। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্য 'তুমি তাকে দুধপান করাও' এ নির্দেশটিতে নিহিত রয়েছে বাচ্চাকে আল-লিবা (শালদুধ বা Colostrum) পান করানোর আদেশ বা অত্যাবশ্যকীয় (ওয়াজিব) নির্দেশ। আর লিবা হলো ঐ দুধ যা সন্তান জন্মদানের পর সর্বপ্রথম আসে। কারণ ঐ দুধ পানকরণ ব্যতীত শিশু সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেঁচে থাকে না।[৫৫]

ইমাম সুদ্দীর মতে 'মূসাকে জন্মদানের পর মূসা জননী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হন যে, তিনি যেন জন্মের পরপরই শিশু মূসাকে বুকের দুধ পান করান।[৫৬] যা সুস্পষ্টভাবেই শালদুধ পান করানোর প্রতি ইঙ্গিত দেয়। ভাবতে অবাক লাগে যে ইমাম সুয়ূতী (র) মৃত্যুবরণ করেন ৯১১ হিজরীতে বর্তমানে চলছে ১৪২৭ হিজরী সাল। পাঁচশ বছরের অধিক সময় পূর্বে তিনি শালদুধ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর যুগে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আজকের ন্যায় এতটা উন্নত ছিল না, বিস্তারিত তথ্য তিনি দিতে পারেন নি কিন্তু 'শালদুধ ছাড়া সন্তান বাঁচে না' সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি দিয়ে গেছেন যা আজকের একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখা আধুনিক ডাক্তারগণ বিভিন্নভাবে সেকথারই প্রতিধ্বনি করছেন। আজ জাতিসংঘের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং 'ইউনিসেফ' এর কণ্ঠে পাঁচশত বছর পূর্বের সেই শ্লোগানই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যা দিয়েছিলেন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'বুকের দুধ খাওয়ান শিশুকে বাঁচান'। 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ও ডাক্তারগণ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা শালদুধের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এতে নিহিত রয়েছে শিশুর স্বাস্থ্য উপযোগী প্রোটিন, এন্টিবডিজ বা রোগ প্রতিরোধক উপাদান। এ অবস্থায় একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের নির্দেশানুযায়ীও শালদুধ পান করানো মানব সমাজের জন্য এমনকি মুসলমানদের জন্যও অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।[৫৭] শালদুধের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে।

A Guide to breast feeding নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে :

The Colostrums is rich in vitamins, proteins and minerals which the body needs to be healthy and strong. Colostrums also helps

৫৫. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল একলিল ফি এস্তেম্বাতিত্ তানযীল,* দারুল কুতুব ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন তা. বি., পৃ. ১৭২।

৫৬. মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু ফারাহ কুরতবী, *আল জামে লি আহকামিল কুরআন,* ১৩শ খণ্ড, দারুল কাতিব আল আরাবী, কায়রো, মিশর ১৯৬৭ ইং, পৃ. ২৫০।

৫৭. এইচ. এ. এন. এম. এরশাদ উল্লাহ : *"ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃদুগ্ধ পান ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচী"*, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, পার্ট-এ, ভলিউম-৫, নং ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং, পৃ.

www.pathagar.com

protect the body from infection and will prevent the baby from developing allergies. The colostrums will help clear the new banns bowels.[৫৮]

'জন্মের পর মায়ের স্তনে যে গাঢ় হলুদ দুধ আসে তাতে রয়েছে রোগ প্রতিরোধক ইমুনোগ্লোবিন এর ফলে শিশু যে কোন প্রদাহ যেমন সেপটিসিয়া, ভাইরাসের আক্রমণ, শ্বাসনালীর প্রদাহ ও মনিলিয়াল প্রদাহের আক্রমণ হতে মুক্ত থাকে।[৫৯] উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে মায়ের বুকের শালদুধ এক কার্যকরী প্রতিষেধক যা ভবিষ্যত নাগরিকের শারীরিক সুস্থ্যতা বিধানে অত্যাবশ্যক। মা ও শিশুর পুষ্টি বিধানে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় স্বামীর অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য যা একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র কামনা করে। শিশু পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ একে বাদ দিয়ে পরিবার সুখী হয় না, হতে পারে না। যদি একটি নিয়মতান্ত্রিক বিবাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি গড়ে না উঠে একটি স্থায়ী পরিবার ব্যবস্থা তাহলে আগামী দিনের এই ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা তাদের মানসিক খোরাক এত যত্ন সহকারে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কে প্রদান করবে ? আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিবে। কাজেই তার শারীরিক, মানসিক, বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, শান্তিময় ঘর যে কারণে ইসলাম বিবাহ নামক এক পবিত্র বন্ধন প্রদান করে সমাজ ও দেশকে উপহার দিতে চায় সুসভ্য জনসমষ্টি।

শিশুর মানসিক বিকাশ

শিশুর প্রতি পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আদর, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি যতটা জৈবিক, তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি হলো শিশুর প্রতি মমত্ববোধ। শিশুর গোসল, খাওয়ানো, পরিচর্যা, চিত্তবিনোদন, ব্যায়াম, আদর ও সর্বোপরি তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটিও পরিবার করে থাকে। এসব কাজে শিশুর প্রতি স্নেহ, আদর তথা আবেগ, ভালবাসার কারণেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। আধুনিক সব সমাজ-মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে, ব্যক্তিত্ব গঠনে শিশুর পারিবারিক অভিজ্ঞতা সূদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতির প্রভাব যেমন রয়েছে, অনুরূপ পরিবেশের প্রভাবও উপেক্ষা করা যায় না। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, ব্যক্তির আচার-আচরণ ও চিন্তা ধারার বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হলেও বংশগতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি।[৬০] ম্যাকাইভার ও পেজের মতে বংশগতির প্রভাব পরিবেশের চেয়ে

---

৫৮. *গাইড টু ব্রেস্ট ফিডিং*, রিভাইজড এডিশন, সুইজার ল্যান্ড, ১৯৮৬ ইং, পৃ. ১৩।

৫৯. ড. এম. এম. খালেকুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৬০. হাফেজ আহমদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

www.pathagar.com

সাতগুণ বেশি।[৬১] Francis Galton এর মতে, পিতা-মাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তা ছেলে-মেয়ের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক গুণাবলীকে প্রভাবিত করে।[৬২] শিশু পরিবারের যে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় মানুষ হয়, তা তার জীবনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে পরিবারের শিশুরা অধিক আদরে মানুষ হয়, তাদের মধ্যে ভীরুতা, দুর্বলতা, ও পরনির্ভরশীলতা দেখা যায়, অনাদরে মানুষ হলে ভবিষ্যতে বেপরোয়া জীবন যাপন করে এবং অপরাধ প্রবণ হয়। আদরহীন কঠোর শাসনের মধ্যে বেড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়।[৬৩]

শিশু ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা একান্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত শিশুর আচরণ এবং ব্যক্তিত্বে অনেক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।[৬৪] রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার দৃষ্টি দেয় না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[৬৫] বস্তুত পিতা-মাতার মধ্যে যেসব সদগুণাবলী ও খারাপ গুণাবলী বিদ্যমান থাকে সাধারণত সন্তানের মধ্যেও সেই গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। কারণ পিতা-মাতার দোষ-গুণ সন্তানের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

শিশু-কিশোররা অতিশয় আবেগ-প্রবণ হয়। জগতের নানা রহস্য ঘিরে তাদের অনেক প্রশ্ন। তারা ক্ষেত্র বিশেষে কাতর হয়। স্নেহের কাঙাল শিশু-কিশোর-যুবকদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবার যে মনস্তাত্ত্বিক কাজটি পালন করে, তার কোন বিকল্প নেই। পিতা-মাতা ও অন্যান্য জাতির কাছ থেকে শিশু-কিশোররা মনের খোরাক পায়। পিতা-মাতার প্রতি তাদের আকর্ষণের কারণ এখানে খুঁজতে হবে।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিশ্বে (যেখানে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। বিবাহ ব্যবস্থা যেখানে শুধু ক্ষণিকের যৌন সম্ভোগ, জারজ সন্তানের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ, শুধু বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদিত সন্তান আজ পথের সন্তান, সেখানে সন্তানদের লালন-পালনের জন্য Baby home, Nursury care ইত্যাদির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নার্সারীগুলো কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কাজ করার দায়িত্ব নিচ্ছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে ইতিমধ্যেই গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে

---

৬১. R. H. Maclver and Page, *Society : An Introduction Analysis* (Madras, Macmillan India Limited, 1990), p. 81.

৬২. হাফেজ আহমদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত,. ৭০।

৬৩. মাকছুদুর রহমান, *রাজনৈতিক সমাজ বিজ্ঞান*, (বুকস প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, ১ম সংস্করণ, প্রকাশ ১৯৯১), পৃ. ৯৯।

৬৪. ড. এম. হুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, *কিতাবুল বিররে ওয়াস-সেলাহ*, হাদীস নং ১৮৪২।

www.pathagar.com

যে, নার্সারীতে রাখা শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে না। তারা কেউবা পরবর্তীতে হীনমন্যতায় ভোগে, কেউবা কিশোর অপরাধী হয়ে গড়ে ওঠে। আব্দুল্লাহ্ নাসেহ আল ওল'ওয়ান বলেন : সন্তানের মানসিক পরিবর্তন, চারিত্রিক বিপর্যয় এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে ধস নামার পিছনে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় ব্যাপার হলো পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানের অনুপস্থিতি এবং পিতা-মাতা জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকার ফলে সন্তানের প্রতি খেয়াল এবং লালন পালন করতে না পারা।[৬৬]

শিশুর শিক্ষায় বিবাহের প্রভাব

বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠা একটি পরিবার তার সন্তানের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান আলয়। শিশুর মানসিক বিকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। জন্মের পরই ইসলাম শিশুর কর্ণে আযান ও ইকামাতের বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছে পিতাকে। রাসূল (সা) বলেছেন : যার ঘরে সন্তান জন্ম নেবে সে যেন ঐ শিশুর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত পাঠ করে শুনায় যাতে খারাপ আবহাওয়া ঐ শিশুর কোন ক্ষতি করতে না পারে।[৬৭] শিশু যখন কথা বলা শেখে বলতে শুরু করাবে এ বাক্য দিয়ে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই'।[৬৮] মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও মানসিক বলে বলীয়ান শিশু গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যসহকারে কাজ কর এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাক, আর সন্তানদেরকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত হওয়ার এবং নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দাও। আর এটাই তাদেরকে ও তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখবে।[৬৯] শিশু বয়স থেকেই নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাসূল (সা) পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়স হলে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে হালকা মারধর কর এবং বিছানা পৃথক করে দাও।[৭০] নামায এমন একটি ইবাদত যাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিদ উপকারিতা বর্তমান। নামায শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা শেখায় এবং পাপাচার ও অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখে। যার ফলে একটি শিশু তার নিজেকে সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য করে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

৬৬. আব্দুল্লাহ নাসেহ অলওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৬৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, *আস-সুনান,* দারুল ফিকর, তা.বি. পৃ. ২৭৮।

৬৮. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ), ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি. পৃ. ৩৯৮।

৬৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

৭০. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, *কিতাবুত সালাত,* হাদীস নং ৪১৮।

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।"[৭১]

শিশুর সামাজিকীকরণে বিবাহের ভূমিকা

বিবাহের মাধ্যমে গড়ে উঠে একটি পরিবার। সেই পরিবারের কাঙ্ক্ষিত ফল হলো সন্তান। পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই সন্তানদের উপযুক্ত সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা। সমাজের কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিবার শিশুকে গড়ে দেয়। পরিবারই শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ আচার-প্রথা, রীতি-নীতি, তথা সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। বসবাস করতে গেলে মানুষকে প্রতিনিয়তই তার চারপাশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন কাজ-কর্মে তাদের মত বিনিময় করতে একাধারে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার আশ্রয় নিতে হয়। বস্তুত, গোটা সমাজিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় যোগ দিতে হয়। এসব মিথস্ক্রিয়ামূলক কাজের একটি নিয়ম থাকে যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং সমাজ কর্তৃক ঈপ্সিত। শিশুকে সেই নিয়ম মেনে চলতে হয়। এভাবেই সে সমাজিক গুণাবলী অর্জন করে এবং সমাজে বসবাস করার উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ব করে। পরিবার তার শিশু কিশোরদের এসব সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে তথা সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী সমাজে শিশুকে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানকে শিশু বয়স থেকেই সামাজিক উত্তম শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করে তোলা এবং উত্তম আদর্শে গড়ে তোলা যা শ্বাশত ইসলামী বিশ্বাস থেকে উৎসারিত এবং গভীর ঈমানী চেতনা-লব্ধ যাতে করে সন্তান সমাজের একজন উত্তম নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে এবং তার থেকে উত্তম বোঝাপড়া শিষ্টাচার পরিপক্ক-জ্ঞান ও বিজ্ঞোচিত কার্যাবলীর প্রকাশ ঘটে। সন্তানকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতা এবং অভিভাকবৃন্দের।[৭২] শিশুকে সমাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে নিম্নলিখিত গুণাবলী শিশুর অন্তরে গেঁথে দেওয়া কর্তব্য : ১. খোদাভীতি, ২. ভ্রাতৃত্ববোধ, ৩. দয়াশীলতা, ৪. আত্মত্যাগী মনোভাব ও ৫. ক্ষমাশীলতা। এছাড়া অন্যদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা যেমন পিতা-মাতার অধিকার, আত্মীয়তার অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, শিক্ষকের অধিকার, বন্ধুর অধিকার এবং বড়দের অধিকার।[৭৩]

শিশু যেন সমাজের আদর্শ সদস্য হতে পারে এজন্য পিতা-মাতা শিশুকে নিম্নলিখিত সামাজিক শিষ্টাচারসমূহ ও শিক্ষা দেয়া কর্তব্য : ১. খাওয়া ও পান করার শিষ্টাচার, ২.

---

৭১. আল কুরআন, সূরা আনকাবুত ২৯ : ৪৫।

৭২. আব্দুল্লাহ নাসেহ অলওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭।

৭৩. মাকছুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

www.pathagar.com

সালামের শিষ্টাচার, ৩. অনুমতি গ্রহণের শিষ্টাচার, ৪. সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের শিষ্টাচার, ৫. সবার সঙ্গে কথা বলার শিষ্টাচার, ৬. হাসি-রহস্য করার শিষ্টাচার, ৭. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও মোবারকবাদ জানানোর শিষ্টাচার, ৮. হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার শিষ্টাচার, ৯. সমাজের মানুষের খেদমত করার শিষ্টাচার এবং ১০. সমাজের শোকার্ত মানুষকে সান্ত্বনা দেয়ার শিষ্টাচার।[৭৪]

একটি সমাজে যদি সুষ্ঠু বিবাহ ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা না থাকে একটি শিশু কিভাবে সমাজের আদর্শ সদস্য হিসাবে গড়ে উঠবে ? কে শিখাবে তাকে এসব সামাজিক শিষ্টাচার ? সামাজিক গুণাবলী অর্জন ও সমাজে বসবাস করার কৌশল কে শিখাবে ? পাশ্চাত্যে যদিও গড়ে উঠেছে মাতৃসদন (Baby care Home) শিশু-সদন, কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী; কিন্তু এসব স্থানে রাখা শিশুরা সামাজিক হতে পারছে না। তাদের কেউবা হীনমন্যতায় ভোগে, কেউবা উচ্ছৃঙ্খল, বদমেজাজের ও কিশোর অপরাধী হয়। বস্তুত শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিবাহ তথা পরিবারের কোন বিকল্প নাই।

বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন শিশুর পরিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটে থাকে যার অন্য কোন বিকল্প নেই। মানব সমাজকে সুস্থ ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য শিশুদেরকে সঠিক প্রতিপালন আবশ্যক যা বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠা একটি পরিবার সুষ্ঠুভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম। স্রষ্টার তৈরি এই বিবাহ ব্যবস্থা যার বিকল্প হিসেবে মানুষ তার চিন্তালব্ধ যা কিছুই করুক না কেন তা মনুষ্য সমাজকে শান্তি ও সুখ দিতে পারে না। শিশুরাই হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আর সে ভবিষ্যতকে নিষ্কন্টক করতে পারে আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক বিবাহ ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পারিবারিক দুর্গ গড়ে তুলবে এ প্রত্যাশা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

বাংলা কাব্যে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের ব্যবহার : অতীত ও বর্তমান

ড. মোঃ আবদুল করিম*
মোঃ শাহজাহান কবীর**

প্রতিটি শিল্পের একটি মূল উপাদান থাকে। যেমন সঙ্গীতে সুর, চিত্রে রং, ভাস্কর্যে পাথর, তেমনি কবিতায় শব্দ। শব্দ কবিতার মূল উপাদান। একজন কবির কাছে শব্দ হচ্ছে বিশ্বাসের অনুকূলে জাগ্রত একটি চৈতন্য। শব্দ একজন কবির বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, অনুভূতিকে শানিত করে এবং সর্বময় আনন্দকে চৈতন্যের দ্বারপ্রান্তে আনে। তাই শব্দ একজন কবির চেতনার ধারক-বাহক।

কবিতা হচ্ছে মানবীয় আবেদনের রূপায়ণ। কিন্তু যে আবেগ একান্তভাবে কবির স্বকীয়, সে আবেগকে তিনি কোন যাদুমন্ত্রে বিশ্বস্ত করে তুলবেন। শব্দই হচ্ছে তাঁর একমাত্র বাহন বা মাধ্যম। আর এই শব্দের যথাযথ বিন্যাস ও সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে আবেগের সার্থক রূপায়ণ। কবির জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে তাঁকে শব্দকুশলী হওয়া। যিনি কবি, তাকে শব্দ নিয়ে নিরন্তর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) শব্দ নির্মাণে ও প্রয়োগে বহুল পরিমাণে পরিশ্রমী শিল্পী। তিনি তাঁর কবিতার ভাবকে যথোপযুক্তভাবে ব্যক্ত করার জন্য উপযুক্ত শব্দ নির্মাণ করতে যেয়ে রাতের পর রাত নিদ্রাহীনতায় কাটিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বলেছেন, 'শব্দে শব্দে বিয়া দেয় যেইজন সেইজন কবি।'

আমরা প্রতিদিন প্রতিমূহূর্তে যে সব শব্দ ব্যবহার করি তা আমাদের মানসদিগন্তকে উন্মোচিত বা প্রসারিত করে না। কেননা এ সব শব্দের আবেদন প্রাত্যহিকতার গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কবিতায় আমরা প্রাত্যহিক জীবনের কোন সংবাদ জানতে চাই না। কবিতায় আমরা এক নতুন বিশ্বের সাথে পরিচিত হতে চাই। আর শব্দের যাদুমন্ত্রে সেই নতুন বিশ্ব আমাদের কাছে উদঘাটিত হতে পারে। কবিতায় শব্দ হচ্ছে রূপকথার সেই সোনার কাঠি, যা আমাদের কাছে নতুন এক জগতের দ্বার উন্মোচিত করে। এজন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ শব্দকে বাচ্যার্থে নয়,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** এম. ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

www.pathagar.com

ব্যাঙ্গার্থেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ শব্দ যখন তার সীমিত অর্থ অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা বহন করে নিয়ে আসে, তখনই কবিতা হয়ে উঠে সার্থক। উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগের যাদুমন্ত্রে কবিতায় উন্মোচিত হয় এক নতুন জগতের দ্বার। আমরা 'বাংলা কাব্যে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ প্রবেশের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করব।

কোন ভাষাই শুধু নিজ শব্দ সম্ভারে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার দরকার পড়ে অন্য ভাষার শব্দ। তেমনি শুধু নিজের শব্দে চলে নি বাংলা ভাষারও। তাকে ঋণ করতে হয়েছে অন্য ভাষার শব্দ। কখনো রাজনৈতিক কখনো অর্থনৈতিক কারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে অন্য ভাষার শব্দ।[১]

অষ্টম শতাব্দীর (৭১২ খ্রি.) গোঁড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে।[২] এরপর আফগানিস্তানের অধিবাসী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বাংলা জয় করেন।[৩] ঐ সময় থেকে ধীরে ধীরে একশত বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ মুসলমান শাসনাধীনে আসে।[৪]

এই বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। যেমন- মামলুক, খলজী, ঘোরী, সুর, মগল বংশ।[৫] এ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তখন মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি আর রাজভাষা ছিল ফার্সি। সে সময় ফার্সি শব্দ এবং ফার্সি শব্দকে আশ্রয় করে আরবি ও তুর্কি শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। এছাড়া প্রবেশ করেছে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী শব্দ। অন্য ভাষার শব্দও পাওয়া যায় গুটিকয়। তবে এ কথা সত্য যে সবচেয়ে বেশি প্রবেশ করেছে ফার্সি ও ইংরেজি। ইংরেজি এখনো বাংলা ভাষায় প্রবেশ করছে প্রচুর পরিমাণে।[৬] অন্য ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে এবং বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ।

বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজারের মতো আরবি-ফার্সি-উর্দু-তুর্কি শব্দ আছে। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কৃত (১৯০৭) পুরনো বাংলায় তথা 'চর্যাপদে' (১৯১৬) আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ নেই।[৭] আবার বাংলাদেশে মুসলমান

---

১. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনি-২০০০, পৃ. ৬৬।

২. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২১

৩. হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৪. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ঢাকা : খাঁন ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৯৯।

৫. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২১

৬. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী-২০০০, পৃ. ৬৭

৭. হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিজয়ের পর হিন্দু লিখিত সর্বপ্রথম কাব্য বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৯১৬) কাব্যে আরবি-ফার্সি শব্দ দেখা যায়।

যেমন- আরবি শব্দ 'বাকী'।

'দান খুঁজিতে মোকে দেখায়সী সহী।
আঅর বোলসী আক্ষত বাকী নাহী।'[৮]

খরমুজা (ফার্সি খুরবূযা) যথা-

'খরমুজা কাঙ্কড়ী বাঈ আমৃত কাঙ্কড়ী
পেঁহুটি সাডর সোআশে।'[৯]

ইহার অতিরিক্ত— কামান (ধনুকার্যে), মঞ্জুর। মজুরিয়া, আফার, গুলাল, লেম্বু; এই শব্দগুলিও পাওয়া যায়।[১০]

বাংলাদেশে মোগল-পাঠানের সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের অধিকাংশই সূফী মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতায় আরাকান রাজসভায় আরবি-ফার্সি বিদগ্ধ ও সূফীমতবাদে অনুরক্ত কবিগণের আবির্ভাব ঘটে।[১১] চতুর্দশ শতকের শেষ বা পনের শতকের গোড়াতে রোমান্টিক ধারার দ্বার প্রথম উন্মোচিত হয়। এরপর আঠার শতক পর্যন্ত এ ধারার রচনা অব্যাহত থাকে।[১২]

এ ধারার কবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন (১৯০৪-১৯৯২) বলেছেন, 'এই কবিরা ছিলেন ফার্সি সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রস সন্ধানী।'[১৩] তারা ফার্সি সাহিত্যের সৌন্দর্য-মাধুর্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের জীবনরস উৎসকে অনুধাবন করেছিলেন। ফলে এঁদের রচনায় এই দুই ধারার যথার্থ সম্মিলন ঘটেছে।[১৪] এ ধারার বিখ্যাত কবি আলাওল। তিনি আরবি-ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে- পদ্মাবতীর অঙ্গসজ্জায় 'মলমল' (ফার্সি) ও 'মসলিন' (আরবি) মাত্র এ দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। উক্ত কাব্যের সমাপ্ত অধ্যায়ে 'মুল্লুক', 'খলিফা', 'ওলামা', 'শহীদ', 'আনোয়ার' এবং 'তালিব এলম' - এ ছ'টি মুসলমানী শব্দ পাওয়া যায়। শব্দগুলো স্থান ও পদবীবাচক; ভাববাচক একটি শব্দও নেই। শব্দগুলো সুপ্রযুক্ত হয়েছে।[১৫]

---

৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ২১০।
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত
১১. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ঢাকা : খাঁন ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২৫৩।
১২. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,* খাঁন ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ৩৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা : অক্টোবর ১৯৯৫, পৃ. ১২।
১৩. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ঢাকা : খাঁন ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২৫২।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
১৫. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,* খাঁন ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ৩৭ প্যারীদাস

www.pathagar.com

ষোল শতক থেকে বাংলা ভাষায় ফার্সি শব্দের প্রবেশের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৬] তখন পাঠান যুগের (১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রি.) হিন্দু বা মুসলমান লিখিত কাব্যে কিছু পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দ পাওয়া গেলেও উর্দু শব্দ পাওয়া যায় না।[১৭] খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষে আমরা মুকুন্দরামে আরবি-ফার্সি শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখি। উর্দু বা হিন্দির আমদানি বাংলাদেশে মুগল অধিকারের পরে। সেই সময় সত্যপীরের কাহিনীতে সত্যপীরকে মুসলমান ফকির রূপে এঁকে তাঁর মুখে উর্দু বা হিন্দি বুলি দেওয়া হয়েছে।

খ্রিস্টীয় সতেরো শতকের শেষ পাদে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকা-মঙ্গল', 'রায়-মঙ্গল', 'শীতলা-মঙ্গল'-এ উর্দু বা হিন্দি বাক্য দেখা যায়। যথা 'কালিকা-মঙ্গলে' কোটালের উক্তি —

'কহি হায় মেরি আওত দড়বড়
ভাটকি মোক উখাড়ো।
খঞ্জর ছেদে ছির উতারই
এস সাথে দোনো গাড়ো।'[১৮]

রায়-মঙ্গলে গাযীর উক্তি—

'আমল না পাঙ হাম জাহির উনকি নাম
তামাম মুল্লুক কিয়া হাথ।
চকমক ইতি তৈরী বাসো পাড়ে এর্তি বেরি
আওরত মরদ এক সাথ।'[১৯]

এরূপে ডডশীতলা-মঙ্গলে' মানিকদাসের সাথে বসন্ত রায়ের হিন্দি বা উর্দুতে কথোপকথন দেখা যায়।[২০]

আঠারো শতকে সত্য নারায়ণ পাচালী রচকগণ ফার্সি-হিন্দি-মিশ্রিত বাংলা তৈরি করতে থাকেন অবাঙালি মুসলিম পীর নারায়ণ সত্যের ও তাঁর চেলাদের কথোপকথনে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত মিশ্রভাষা দেখানোর জন্য। এমনকি হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বাংলা ব্যবহার করেছেন হাওড়া-হুগলী কলকাতা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অবাঙালি বংশধর বটতলা সাহিত্য লেখকেরা। এ ভাষা ও সাহিত্য দোভাষী ভাষা ও সাহিত্য নামে অবহিত।[২১]

আঠারো শতকের শাহ গরীবুল্লাহ* আজ তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানী বা হেয় ভাষা বাংলার স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্র চোপড়া** লন্ডন থেকে প্রকাশিত Islamic Review

---

রোড, ঢাকা : অক্টোবর ১৯৯৫, পৃ. ৩২৬।

১৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ২১০।

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. প্রাগুক্ত

২০. প্রাগুক্ত

২১. আহমদ শরীফ, *একালে নজরুল,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২০৬।

www.pathagar.com

(১৯৬০) পত্রিকায় স্পষ্টভাবে ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গীয় কতিপয় হিন্দু কবিকে গরীবুল্লাহ প্রভাবিত বলে উল্লেখ করেছেন।[২২]

অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-৬০) একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি শব্দ প্রয়োগে অনেকটা সাম্যবাদী। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশী, আরবি, ফার্সি, প্রভৃতি শব্দ নির্বিবাদে ব্যবহার করেছেন। ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল' ভাষা প্রয়োগে দ্বিধাবোধ করেন। পাঠক এ ভাষা কিভাবে গ্রহণ করবে এ নিয়ে তার মনে সংশয় ছিল, এজন্য ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে বিবিধ প্রকার শব্দ ব্যবহারের হেতু বর্ণনা করেছেন এভাবে—

'না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥'[২৩]

আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের ফলে তাঁর কাব্যে সৃজিত হয়েছে নান্দনিক কারুকাজ। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

'দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর ॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে ॥
দাড়ি রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এইমাত্র দায় ॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই ॥'[২৪]

[* গরীবুল্লাহ্ পিতার নাম শাহ দুন্দি। কবি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শাহ গরীবুল্লাহ হাফিযপুর নিবাসী ছিলেন। হাফিযপুর হাওড়া জেলার বালিয়া পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই হাফিযপুর বর্তমানে ডাকঘর পাতিহালের অন্তর্গত। পীর বড়ে খান গাযী গরীবুল্লাহর মদদগার বা সহায় ছিলেন।

** Rabindra Chopra. SUFI POETS OF BENGAL. The Islamic Review London Fed. 1960. Gharibullahs School influenced The writings of some of the Hidu poets beloging to West Bengal. It is quite natural the best known Bengali poet of the eighteenth century bhapat chadra was endebled to these Muslim Writers.]

---

২২. অধ্যাপক আবু তালিব, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৭, পৃ. ২৬।

২৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান,* নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৪২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

www.pathagar.com

আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগে সবিশেষ পারঙ্গমতার কারণে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁকে 'প্রাচীন বঙ্গ ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে মুসলমানদের চরম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। এই সময় বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম অভিধান রচয়িতা উইলিয়াম কেরী তাঁর- 'Dictionary of The Bengali Language' (১৭৭৮)-এর ভূমিকায় বলেছেন যে, বাংলা ভাষার শতকরা নব্বই ভাগ শব্দই সংস্কৃতিজাত। তাঁর অভিধানে আরবি-ফার্সি শব্দের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।[২৫]

ইংরেজরা ভারতে ক্ষমতা দখলের পর কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হয়। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান না থাকায় ইংরেজ কর্মচারীদের প্রথমে খুবই অসুবিধা পোহাতে হতো।[২৬] তাই ইংরেজ কর্মচারীদেরকে বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দুস্থানী, মারাঠি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ২১ মে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী (Lord Wellesley) কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[২৭] এই কলেজকে কেন্দ্র করে যে পদ্য রচনা শুরু হয় তাতে হিন্দু পণ্ডিত, মার্শম্যান ও উইলিয়াম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) প্রচেষ্টায় আরবি-ফার্সি শব্দকে সাহিত্য গন্ডীর বহির্ভূত করা হয়।[২৮] এ কারণে উনিশ শতকের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় যে বাংলা ভাষা গড়ে উঠল তাতে মুসলমানী শব্দ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হল এবং যে সাহিত্য রচিত হলো তা একান্তভাবে হিন্দুয়ানী। আফসোসের বিষয় এই যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের মধ্যে হীনমন্য দেখা দেয়। হিন্দুয়ানী ভাষার অনুকরণকে তাঁরা মস্তবড় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করেছেন।[২৯] ফলে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) মতো কবিও বলেছেন যে, তিনি শুদ্ধ বাংলা লিখতেন বলে হিন্দুদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[৩০]

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) দেদার ফার্সি (ও তৎভুক্ত আরবি) জীবন ও সমাজ প্রতিবেশ সৃষ্টির কাব্যিক প্রয়োজনে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩১] যেমন- 'দিলদার', 'নাদিরশাহ', 'নূরজাহান', 'আওরঙ্গজেব', 'রুবাই', 'বেদুঈন', 'ইরানী গল্প' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু সে প্রচেষ্টা খুব অনেকটা সফল হয়ে ওঠেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নাদির শাহ' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায়।[৩২] যেমন—

---

২৫. সৈয়দ আলী আহসান, কান্ডারী হুঁশিয়ার, *নজরুল জন্মশত বার্ষিকী স্মারক,* ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ১১৭।

২৬. শ্রী সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার জাগরণ,* কলিকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ ১৯৫৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ. ১৫৪।

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৩২. মোবাশ্বের আলী, *নজরুল প্রতিভা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৪৭।

www.pathagar.com

"আহাহা আল্লা ! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে !
বিচারের কালে একথা ধরিয়া গুণা কিছু মাফ হবে ?
শেষ হয়ে গেল- বাপ !
ইরানের ধ্বজা-ইরানের গ্লানি-বিধাতার অভিশাপ !"[৩৩]

প্রমথ চৌধুরী মশায় (১৮৬৮-১৯৪৬) ফিরনির মধ্যে কিসমিসের মতো গদ্যের মধ্যে আচমকা দু'একটি আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে যে ধরনের চমক সৃষ্টির ওস্তাদি দেখাতেন, অনেকটা সে রকম।[৩৪]

সে প্রচেষ্টার প্রথম সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) মধ্যে। কিন্তু নজরুল প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ আমদানি করেন নি। বরং বলা যায়, মুসলিম জীবন, সমাজ ও আবহকে প্রকাশকল্পে তিনি আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। যে সব শব্দ বাঙ্গালী মুসলমান প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করেন, অথচ এতকাল সাহিত্যে যা অপাংতেয় ছিল নজরুল তাকে কাব্যে সাদরে বরণ করেছেন। নজরুলের হাতেই শব্দ প্রয়োগের প্রথম হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনে গড়ে উঠা বাংলা ভাষার প্রতিফলন ঘটে।[৩৫]

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে, নজরুল ইসলাম তাঁর অনুভূতির প্রকাশকল্পে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমাদের বিচারে একথা মোটেও সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম', 'কামাল পাশা', 'মোহররম', 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়', 'নওরোজ', 'চিরঞ্জীব জগলুল' ইত্যাদি কবিতা ছাড়া আরবী, ফার্সী শব্দের প্রচুর প্রয়োগ তাঁর অন্য কোন কবিতায় নেই। কৌতুকের বিষয় এই যে, তাঁর বহুলখ্যাত বিদ্রোহী কবিতায় সাতশো চুয়ান্নটি শব্দের মধ্যে আরবি-ফার্সি শব্দ মাত্র ছাব্বিশটি। আর মুসলিম জীবন ও ঐতিহ্যবোধক মাত্র আটটি শব্দ রয়েছে। আরশ, বেদুইন, চেঙ্গিশ, ইস্রাফিল, জিব্রাইল, হাবিয়া দোযখ এবং জাহান্নাম। অথচ হিন্দু উপকথা থেকে রয়েছে তিরিশটি উপমা। প্রায় প্রত্যেক কবিতা থেকেই এ তথ্য সংগ্রহ করা চলে। এমন অনেক কবিতা রয়েছে যাতে মুসলিম ঐতিহ্যের চিহ্ন নেই অথচ হিন্দু ঐতিহ্যবাহী উপমা ও চিত্র রয়েছে প্রচুর। যেমন 'অভিশাপ', 'অ-বেলার ডাক', 'বিজয়নী', 'সিন্ধু' 'দারিদ্র্য' মুসলিম ঐতিহ্যবোধক শব্দ বাংলা ভাষায় এত প্রচলিত যে, এর উৎসস্থল অন্য ভাষায় আছে বলেই আমাদের মনে হয় না। শব্দটি হচ্ছে 'আরাম'। অপরটি হচ্ছে বিদেশী।

আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দে কবিতা লিখে নজরুলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কম শুনতে হয় নি। কবিগুরু বলেন, 'যাদের রক্তে স্বাভাবিক রং নেই তারাই জোর করে খুন ব্যবহার করে বাহাদুরি করতে চান।' সুনীতি বাবু বলেন, 'একশ্রেণীর মুসলমান লেখক হিন্দু বিদ্বেষের বশে বাংলা ভাষায় দেদার

---

৩৩. ড. দূর্গা শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *মোহিতলালের কাব্য ও কবি মানস,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২, পৃ. ৫০।

৩৪. আহমদ ছফা, *কাণ্ডারী হুশিয়ার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৩৫. মজিদ মাহমুদ, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৬ আগস্ট ২০০৪

www.pathagar.com

আরবি-ফার্সি শব্দ আমদানি করেছেন।' এই অভিযোগের জবাব দিতে যেয়ে নজরুল লিখেছেন 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যবহার করে গেছেন।' নজরুল বুঝিয়েছেন যে, 'রক্ত' শব্দ দিয়ে 'খুন' শব্দের মহিমা বোঝানো যাবে না। তিনি প্রবন্ধে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, যা পরবর্তী সমস্ত বাঙালি হিন্দু-মুসলিম লেখককে সাহসী করেছে- নজরুল বলেছিলেন, 'বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীর একটি মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তার শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।' স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তী এ ঢং এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। বর্তমান বাংলা কাব্যে অনেক কবিই আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করছেন। নিম্নে আমরা আধুনিক যুগের কয়েকজন বিখ্যাত কবির কাব্যে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

তাঁর কবিতায় বিদেশী শব্দ আরবি-ফার্সি-ইংরেজি প্রভৃতির ব্যবহার দেখিয়েছেন।[৩৬] জীবনানন্দ দাশ জানতেন, শব্দকে বাক্যের মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা দিতে না পারলে, তা কখনো শিল্পোত্তীর্ণ হয় না। তিনি আরো জানতেন, বহু ব্যবহার শব্দ জীর্ণ হয়, সে জন্য তিনি 'ঝরাপালকে'র পর আরবি-ফার্সি শব্দের প্রতি তার আগ্রহ কমিয়ে এনেছিলেন এবং পরবর্তীতে নতুন শব্দ সৃজনে এবং প্রয়োগে অভিনিবেশ করেছিলেন।[৩৭] কবির 'ঝরাপালক' কাব্য থেকে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

১. আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে।
২. সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার।
৩. কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত।
৪. মানুষের হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল।
৫. তবুও বেদম হেসে খিল ধরে যেতে বলে বেড়াজালের পেটে।
৬. হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন[৩৮]।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় অনেক বিদেশী অর্থাৎ আরবি-ফার্সি-তুর্কি-হিন্দি-ইংরেজি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩৯] তাঁর কাব্যে ফরাসি শব্দ ব্যবহার করায় সমসাময়িকদের নিকট থেকে বিদ্রুপ লাভ করেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজি

---

৩৬. ড. সৈকত আসগর, *আধুনিক বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৫৪।

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. ড. সৈকত আসগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

www.pathagar.com

ভাষা সেসব বিদেশী শব্দকে যথারীতি গ্রহণ করেছে এবং উপকৃত হয়েছে।[৪০] অমিয় চক্রবর্তীও তাঁর কবিতায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।[৪১]

ফার্সি শব্দ

ভিস্তি, আসমান, এক্কা, দরিয়া, জাদু, দারোয়ান, খদ্দের, দারোগা, জখম, বাজি, খুন, ফরমাশ, দেদার, চাদর, জাজিম, জবর, বেহেস্ত, জমিদার, পেয়াদা, মালিক, ভাও, সাফাই, নিশান, জারি, শাকরেৎ, রোজা, সোয়ারি, বরকন্দাজ, বেপরোয়া, তুফান, মজুর, মজদুর, ফারসি, শামিয়ানা, আন্দাজ, ময়দান, দামামা, মোলায়েম, ময়দা, রসদ, বদমেজাজ, আস্তানা, কোর্তা ইত্যাদি।[৪২]

আরবি শব্দ

সেলাম, সাফ, সরবৎ, কোরবানী, তাবিজ, কাফি, জিয়ারত, আলখাল্লা, মুনাফা, হদিশ, নেহব, আজান, আউল, তালুক, মুল্লুক, কোরান, মোল্লা, মসজিদ, দুনিয়া, সেকরা, আরবি, জবর, ইজ্জত, জহরৎ, ঈমান, জাহান্নাম, জামিন, হয়রান, কেরামতি, কামিজ ইত্যাদি।[৪৩]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

তৎসম, অপ্রচলিত তৎসম, নতুন শব্দ ব্যবহারে যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের খ্যাতি-অখ্যাতি, কিন্তু আরবি-ফার্সি বা অন্যান্য বিদেশী শব্দ ব্যবহারে তাঁর তেমন উল্লেখযোগ্য খ্যাতি-অখ্যাতির প্রসঙ্গ নিয়ে সমালোচকগণ তেমন মাথা ঘামান না। এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে তিনি প্রাসঙ্গিকতা এনেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।[৪৪]

আরবি শব্দ

বালাই, কেতাব, কাজী, ফেরারী, খতম, ক্রোক, মৌরস, মিনতি, মিয়াদ, লোকসান, নিকামত, মাল্লা, সাকী, ইশারা, বয়েৎ, জবর, বহর, কাতার, সওয়ার, শয়তানি, তামাদি, ফোয়ারা প্রভৃতি।[৪৫]

ফার্সি শব্দ

গোব, জাদু, দর, পেয়ালা, মজুর, আওয়াজ, কিস্তি, হাওয়া, খাম-খেয়ালী, জের, নাকাড়া, আফসোস, পাইক, দোকান, মশাল, নিরিখ, খরিদ, নিশান, শরম, বাজার, বীমা, খরচ, গেসা, দরদ প্রভৃতি।[৪৬]

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবি-ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি, ইংরেজি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।[৪৭]

---

৪০. ড. সৈকত আসগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৪১. *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শীত, ১৩৭০, পৃ. ১০৭।
৪২. ড. সৈকত আসগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. ড. সৈকত আসগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৪৬. প্রাগুক্ত
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

www.pathagar.com

আরবি শব্দ

বয়ান, তুফান, হারেম, মরর্জিম মোলায়েম, আতর, মালুম, আলখাল্লা, মুশক, আখের, কিমিয়া, মৌতাত, মহড়া, কবর, কাতার, কফিন, রেওয়াজ, মুশকিল, ফিকির, কবুল, মেয়াদ, হাজির, জেল্লা, আদব-কায়দা, জালিয়াত, জাহান্নাম, দজ্জাল প্রভৃতি।[৪৮]

উর্দু শব্দ

শন্তা, পাহারা, তকমা, তল্লাস প্রভৃতি।[৪৯]

ফার্সি শব্দ

রোজ, মেজাজ, আওয়াজ, কুচকাওয়াজ, খাক, নিশান, শরম, চাবুক, বখশিশ, দরজি, মগজ, মিঞা, জমিদার, দরাজ, কায়েদি, বেগার, গ্রেপ্তার, জাদু, সুপারিশ, খোশামোদ, ইয়ার, পেশ, জখম, আন্দাজ, রসদ, মাস্তান, বদনাম, দস্তানা, মখমল, শামিয়ানা, জিঞ্জির, শির, মজুরি প্রভৃতি।[৫০]

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ কিছুটা উচ্চারণ বিকৃতির ফলে যেমন সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে, তেমনি কবিতায় অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োজনানুসারে স্থান করে নিয়েছে। বিষ্ণু দেও তাঁর ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটি মনে আসে, কোন সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না।[৫১] প্রমথ চৌধুরী যিনি ছন্দ চিন্তার দিক থেকে বিষ্ণু দে-কে প্রভাবান্বিত করেছিলেন, তিনি বলেছেন, ফার্সি শব্দ তালাক দিলে বাংলা ভাষার সংসার অচল হয়ে পড়বে।[৫২] আর তুর্কি ও আরবি শব্দগুলো তো ফার্সির মধ্য দিয়েই বাংলায় এসেছে। কাজেই বাংলায়, তথা বাংলা কবিতায় আরবি-ফার্সি-তুর্কি প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৫৩]

উর্দু শব্দ

শিবির, ঠাকুর, বরদা, কুলি, সওগাত, দারোগা, খান প্রভৃতি।[৫৪]

আরবি শব্দ

জমায়েত, মুশকিল, শরিক, হাকিম, উজির, মুনাফা, আমলা, দোয়া, খয়রাত, আমীর, ওমরা, কেয়ামত, বেকুব, কবর, তামাম, কেরামতি প্রভৃতি।[৫৫]

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. ড. গুরু দাস ভট্টাচার্য, *বাক প্রতিমা : বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, ১৯৬৩, পৃ. ৫৬।

৫২. শ্রী পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য, *বাংলা ভাষা*, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৬৪।

৫৩. ড. সৈকত আসগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৫৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

ফার্সি শব্দ

বেগানা, উমেদার, গোমস্তা, সদাগর, শির, নিশান, ফরাশ, কেল্লা, হামলা, মজুর, চশম, রশদ, জমিদার, দিলদার, পাইক, পরগনা, হরদম, গোরস্তান, মাহিনা, পাজি, খানশাহী প্রভৃতি।[৫৬]

জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

জসীম উদ্‌দীন আধুনিক পল্লীকবি। তিনি পল্লীর সহজ জীবন ছন্দটিকে তুলে ধরার প্রয়োজনে একদিকে যেমন দেশী, গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি বিশেষ সামাজিক পরিবেশ ও ধর্মীয় জীবনের প্রক্ষেপ ঘটাতে অবলীলাক্রমে সংস্কৃত, আরবি-ফার্সি শব্দও ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের দৈনন্দিন মৌখিক ভাষায় ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে আরবি-ফার্সি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। ঐ সব শব্দ বাদ দিয়ে কিছুতেই তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করা যায় না। হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করা যায় না। হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলকে ফুটিয়ে তুলতে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ যেমন অনেক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে, মুসলমান সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ও বক্তব্য প্রকাশেও তেমনি আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ অপরিহার্য। আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে ঐগুলো এমনি সুপ্রযুক্ত হয়েছে যে, তা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কাব্যের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শব্দগুলো বাংলা ভাষার দেহে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা পূর্বসুরী সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম প্রমুখের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বাংলার লোকজীবন ও লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত বলে জসীম উদ্‌দীন কাব্যে মুসলিম সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় আচরণ অনুষঙ্গে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে।[৫৭] কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাক —

ক. নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান।
ছেলেকে আমার ভাল করে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল করে দাও আল্লা রসুল, ভাল করে দাও পীর।
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।

খ. সামনে লইয়া কোরান শরীফ সুরে ফাতেহার চরণ পড়ি
সারে জাহানের ক্রন্দনে সে চোখ দু'টো আসিছে ভরি।[৫৮]

আরবি-ফার্সি শব্দের এই প্রয়োগ মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনা প্রকাশেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলা ভাষায় সার্বিক চিন্তা ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে গৃহীত স্বাভাবিক শব্দ রূপেও বহু আরবি-ফার্সি শব্দ জসীম উদ্‌দীন সহজভাবেই কাব্যে গ্রহণ করেছেন। সেগুলোর প্রয়োগ নতুন কোন কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়নি।

---

৫৬. প্রাগুক্ত

৫৭. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *জসীম উদ্‌দীন কবি মানস ও কাব্য সাধনা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ২৮৮।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)

গোলাম মোস্তফা শব্দ প্রয়োগ ও ভাষা ব্যবহারে আদর্শবাদিতার শিকার হয়েছিলেন কালক্রমে। কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষাকে মুসলমানী করণের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। বাংলা হরফ বদল করে আরবি হরফ গ্রহণ করার জন্যও তিনি প্রস্তাব তুলেছিলেন। শুধু প্রবন্ধ পত্রিকার সম্পাদকীয়তেই নয়, কবিতায়ও তিনি এই জাতীয় আবেদন রেখেছেন।[৫৯]

থামাও তোমার ভাষার দ্বন্দ্ব তুলনা ও-কথা দিওনা লাজ
মহব্বতের রাষ্ট্রভাষায় দিলে দিলে কথা কহিব আজ।

(মুসলিমলীগ নওবাহার অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯)

তাঁর কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বেশি পরিলক্ষিত হয় 'তারানা ই-পাকিস্তান' কাব্যে ঃ

'দুনিয়াতে আজ যুলমাৎ ভারী নাইকো ইনসাফ, নাই ঈমান
কে শোনাবে প্রেমের বাণী, করবে কে মুশকিল আসান।'[৬০]

তালিম হোসেন (১৯১৮)

তিনি তাঁর কবিতায় অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি ফররুখ আহমদের সমপর্যায়ের। তিনি আরবি-ফার্সি শব্দসমূহ ফররুখ আহমদের ঢঙে ব্যবহার করে এক্ষেত্রে কিছুটা মেজাজী সজীবতা আনতে চেয়েছেন।[৬১]

ক. খোশ আমদেদ ঃ দুনিয়ার বুকে ইসলামবাদ পাকিস্তান। (পাকিস্তান, দিশারী)

খ. নয়া জমানার মিনারে আবার হাকিব আল্লাহ আকবর। (দারুকেআযম, দিশারী)[৬২]

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

আধুনিক বাংলা কবিতার দুই প্রধান পুরুষের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অন্যজন ফররুখ আহমদ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরীক্ষা করেছেন সংস্কৃত শব্দ নিয়ে, ফররুখ পরীক্ষা করেছেন আরবি-ফার্সি শব্দ নিয়ে।[৬৩] ফররুখ যে সব কাব্যের বিষয় ইসলামী অথবা পুঁথিনির্ভর সেগুলিই আরবি-ফার্সি শব্দকীর্ণ; বিষয় যখন বাংলাদেশের কোনো স্থান বা ঘটনা— সেখানে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 'সাত সাগরের মাঝি'র অধিকাংশ কবিতা সুপ্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে কিন্তু 'লাশ' কবিতায় নয়; সিরাজুম মুনীরা'র তুলনায় মুহূর্তের কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দ কম। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি'-তে ফররুখের আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারও

---

৫৯. নিতাই দাস, *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩, পৃ. ৭৯-৮০।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৬১. হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ২১১।

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য,* জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৪৯-১৫০।

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠভাবে ব্যবহৃত। আরব্যোপন্যাসের জগত কিংবা যেখানে ইসলামের ইতিহাসের ঐশ্বর্য বিকিরিত — সেখানে তো আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার প্রাসঙ্গিক কারণেই আসবে। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক ঃ

'যুলমাত-ম্লান ডেরায় চেরাগ জ্বালাও শাহেরজাদী।
আমার মাটিতে ছড়াও আনার দানা,
উজীরজাদী, আজি তুমি আর শুনো না
কারুর মানা,
হাজুক নাজুক কমনীয় মুখ যেখানে ভাসছে, আর
আতশী দহনে খুনের তুফানে জ্বলছে
শাহরিয়ার।'[৬৪]

ফররুখের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তোলা হয় অপরিচিত শব্দ ব্যবহার নিয়ে। আমরা ভুলে যাই অপরিচিত আরবি-ফার্সি শব্দ ফররুখ মূলত ব্যবহার করেছেন কেবল হাতেম তায়ী-কাব্যগ্রন্থে। এই ধরনের অপরিচিত শব্দ ব্যবহারও সচেতনা ও পরিকল্পিত। এই সচেতন ও পরিকল্পনা দুই কারণে করেছেন ফররুখ : ১. পুঁথিনির্ভর বলেই ঐ কাব্যে বিপুল পরিমাণ আরবী-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করেছেন; ২. অপরিচিত আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেই হাতেম তায়ীর প্রাচীন জগতের পুন নির্মাণ সম্ভব, প্রাত্যহিক পরিচিত শব্দে ঐ জগৎ ফোটানো যেতোনা। হাতেম তায়ীর প্রাক-ইসলামিক সুদূর জগত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে কাব্যভাষায় প্রাচীনত্বের স্বাদ আনা দরকার ছিলো। স্মরণীয় সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ 'ভারত-প্রেমকথা' বইয়ে অতিগম্ভীর সংস্কৃত শব্দই প্রয়োগ করেছেন কিংবা সাহিত্যিক শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস মিশ্রিত কাহিনী নির্মাণের জন্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন এটি বাংলা সাহিত্যেরই একটি স্বীকৃত সাহিত্যিক প্রযুক্তি। সুতরাং ফররুখ অপ্রচলিত শব্দ চালানোর চেষ্টা করেছেন— এ এক প্রথাগত ও যুক্তিহীন সমালোচনা। ফররুখ সর্বত্র এ ধরনের শব্দপ্রয়োগ করেন নি। এমনকি এই কাব্যের সর্বত্রই ঐ ধরনের শব্দ ব্যবহার হয়নি ;[৬৫] ফররুখ যিনি ছন্দ-মিলে বিশ্বাসী ছিলেন, আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে তাঁর পক্ষে সুবিধা হলো এই যে, আরবি-ফার্সি শব্দের সঙ্গে বাংলায় তিনি একটি অভিনবত্বের স্বাদ সৃষ্টি করলেন। আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার ও যথার্থ ব্যঞ্জনা দুই ক্ষেত্রেই ফররুখ সফল। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসুরী নজরুল- যার উত্তরাধিকারকে তো এভাবেই ভেঙে, অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ :

১. 'বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালোই অফুরান জিন্দিগী
আবলুস-ঘন আঁধারে পেখম খুঁলেছে রাতের শিখী'
২. 'নতুন দ্বীপের পত্তনি নিয়ে পেতেছি যেখানে খিমা
জরিপ করেছি সাত সাগরের সীমা।'[৬৬]

---

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৬৫. প্রাগুক্ত
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

www.pathagar.com

মুফাখ্খারুল ইসলাম (১৯২১)

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই সব শব্দ তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় প্রচলিত তৎসম, তদ্ভব ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে আরবি-ফার্সি ব্যবহারের কথা তিনি বলতেন। তাঁর অনেক কবিতাকে বাংলা কবিতা বলে চেনা বেশ মুশকিল বলে মনে হয়।[৬৭] দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

'সুধি কাজিরের পেশনূরী সেই ঝুট-ঘন কুহেলীকে
সাদিকের আলো অপসার করি করিয়া তুলিছে ফিকে
কাফিলার পালবান
বহুরাহু চুড়ি পাইয়াছে আজ মনজিল সন্ধান।'[৬৮]

যে সব আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত কিংবা বাংলা ভাষা মানুষের কাছে বোধগম্য বা তাদের মুখে প্রচলিত হয়ে আছে, সে ধরনের শব্দ তিনি প্রচুর ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফার্সি শব্দও তিনি জোর করে ব্যবহার করেছেন। ব্যবহার করতে হবে সেজন্যই এই শব্দগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন যার জন্য তাঁর কবিতা অনেকক্ষেত্রে বোধগম্য হয় না। উদাহরণ হিসেবে কতগুলো শব্দের কথা বলা যায়। যেগুলো বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে প্রচলিত নয়, অথচ তিনি ব্যবহার করেছেন, যেমন- দুর্মদ, আসোয়ার, পেশানী, পেশনূর, ছিজজীল ইত্যাদি।[৬৯]

আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে ফররুখ আহমদ যে সফলতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন মুফাখ্খারুল ইসলাম সেক্ষেত্রে অসফলই হয়েছেন বলা যায়।[৭০] অকাব্যিক আরবি-ফারসি শব্দের সাথে দুরুচচার সংস্কৃতানুগ শব্দ ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা তাঁর অনেক রোমান্টিক কবিতাকেও মূর্ত হতে দেয়নি। বস্তুতপক্ষে তাঁর আদর্শ ও ঐতিহ্যবোধ যতখানি তীব্র, শিল্পদৃষ্টি ততখানি প্রখর নয়।[৭১]

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

কবির বক্তব্য— 'আমার কাব্য কর্মের সূত্রপাতে আমি ইসলামী বিষয় অবলম্বন করে কবিতা লিখবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। ইসলামী বিষয় অর্থাৎ উন্মেষ যুগের ইসলামের ভাবাবহ। এই ভাবাবহকে কবিতায় শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দ আমি

---

৬৭. নিতাই দাস, *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৯২।

৬৮. প্রাগুক্ত

৬৯. প্রাগুক্ত

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৭১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *সমকালীন সাহিত্যের ধারা,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৬৬৫, পৃ. ২১৯।

www.pathagar.com

ব্যবহার করেছি।'[৭২] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ বলেন, 'সৈয়দ আলী আহসান বিষয়বস্তুর জন্য মুসলিম ঐতিহ্যের এবং পুঁথি সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন সত্য, কিন্তু পুঁথি সাহিত্যের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন নি।'[৭৩]

কবিতায় ঃ

'আকাশে ছড়ালো রূপার কুসুম অযুত সেতারা গুলি
দূরের পথের নির্দেশ দিয়া আদম সুরাত ঠোঁটে তুলে অঙ্গুলী
বায়ুর জীবনে খেজুর পাতার তোলে শুধু মর্মর
আলোর দোলায় কেঁপে উঠে অম্বর,
মনে মাটিতে প্রশান্ত সুর।
আল্লাহু আকবর।
আল্লাহু আকবর।[৭৪]

শামসুর রাহমান (১৯২৯)

আরবি-ফার্সি শব্দের প্রতি শামসুর রাহমানের আকর্ষণ আছে। তিনি আরবি-ফার্সি শব্দের চমৎকার ব্যবহার করেছেন।[৭৫] তিনি অতি পরিচিত আরবি-ফার্সি শব্দরাজি ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনুভূতি প্রকাশকল্পে এ আরবি-ফার্সি শব্দগুলো অপরিহার্য। রাহমানের কৃতিত্ব যে তিনি আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে সার্বজনীন অনুভূতিকেও প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

ক. পোশাকের জেল্লা তবু পারে না লুকাতে কোনমতে
বিকৃত দেহের ক্ষত।

খ. কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি।
বাদশা নেই কেউ, গোলাম সব,
বেগম পেতে চায় বাঁদির সুখ;
আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর।[৭৬]

জেল্লা, আসমান, বেয়াদবি, বান্দা, বাদশা, গোলাম, বেগম, বাঁদি, আউড়ে অতি পরিচিত শব্দ; আর এ শব্দরাজি অপরিহার্য উদ্ধৃতি পংক্তিসমূহে। জেল্লার পরিবর্তে আর কোন শব্দ ভাবা যায় না। ক. উদ্ধৃতিতে, তেমনি অন্যান্য শব্দের বিকল্পও অভাবিত।[৭৭] আবার প্রথম উক্তিটি সার্বজনীন অনুভূতিকেও ব্যক্ত করেছে। রাহমানের কবিতায় সাফল্যাভিলাষী আরবি-ফার্সি শব্দগুলো তাঁকে

---

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৭৩. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪
৭৫. হুমায়ুন আজাদ, শামসুর রাহমান, *নিঃসঙ্গ শেরপা,* আগামী প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ২১৬।
৭৬. প্রাগুক্ত
৭৭. হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

www.pathagar.com

মহিমা দেয়নি।[৭৮] দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ

'জামিন কবির মাথা নক্ষত্রগুচ্ছের কাজে আর
পুশিদা পথের কাছে।'[৭৯]

উক্ত উদ্ধৃতিটিতে 'পুশিদা' অপরিহার্য নয়। যেমন অপরিহার্য নয় 'শূন্যতায় তুমি শোকসভা কাব্যের অন্তর্গত 'সেই আজনবি' নামী কবিতার 'আজনবি' শব্দটি। 'আগন্তুক' শব্দটি আজনবির চেয়ে অধিক ইঙ্গিতময়।[৮০]

আল মাহমুদ (১৯৩৬)

আল মাহমুদ তাঁর কাব্যে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে খুবই মিতব্যয়ী। মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কবিতায় অল্প পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই আরবি-ফার্সি শব্দগুলো তাঁর অনুভূতির মাত্রাকে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত করেছে; কোনরূপ আবেগ উচ্ছলতা প্রকাশ পায় নি। পাশাপাশি তাঁর আরবি-ফার্সি শব্দগুলো প্রায় সর্বজনে পরিচিত। এ গুণটি তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্ত দেখা যাক —

'লাঞ্ছিতের আসমানে তিনি যেন সোনালি ঈগল
ডানার আওয়াজে তাঁর কেঁপে ওঠে বন্দীর দুয়ার ;[৮১]
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় জাহেলের সামান্য সিকল।
আদিগন্ত ভেদ করে চলে সেই আলোর জোয়ার।'

'সালাত ভাঙলো। আমিন, আমিন-
প্রতিটি মসজিদ থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছেন। যেন কেউ
ওমরের গণকোষাগার থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন হিসেব করা দীনার।'[৮২]

রওশন ইয়াজদানী (১৯১৭-১৯৬৭)

বিষয় অনুযায়ী কবি কখনো কখনো আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৮৩] দৃষ্টান্ত দেয়া যাক —

'এমনি দারুন অত্যাচারে বিষ্ঠা যখন দায়
ভাবেন বইয়া দীনের নবী কি করেন উপায়,

---

৭৮. প্রাগুক্ত

৭৯. প্রাগুক্ত

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. হযরত মোহাম্মদ : অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, *আল মাহমুদ কবিতা সমগ্র,* ঢাকা : অনন্যা ৩৮/২ বাংলা বাজার, ২০০০, পৃ. ১৫৯।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৮৩. আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ,* আধুনিক যুগ, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ৫৫৩।

www.pathagar.com

যায় না বইয়া নামাজ পড়া, কেরাত পড়া জোরে
সব কাফেরে দল বাঁধিয়া সেই তালাসে ঘোরে।'[৮৪]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসরে দেখা যায় যে, মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে অল্প পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া আরাকান রাজসভা ধারার কবিদের মধ্যে অল্প পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ষোল শতকের মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'কালকেতু' উপাখ্যানে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দ পরিলক্ষিত হয়, সতের শতকের শেষ দিকে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকা-মঙ্গল', 'রায়-মঙ্গল', 'শীতলা-মঙ্গল'-এ উর্দু বা হিন্দি প্রচুর শব্দ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 'অন্যদা মঙ্গল' কাব্যের মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। উনবিংশ শতাব্দিতে সতেন্দ্রনাথ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণুদে, জসীম উদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রওশন ইয়াজদানী প্রমুখ কবি আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সকল কবি বাংলাদেশের মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, আবহ এবং সার্বজনীন অনুভূতি প্রকাশ কল্পে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সকল শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলা ভাষা বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সকল শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত ও মর্যাদাবান হবে তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ যার জনসংখ্যার ৮৮.৩৫% মুসলমান। বর্তমানে এদেশের অধিকাংশ কবি মুসলমান। তারা তাদের কাব্যে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে বাংলা কাব্যকে আরো উন্নত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ করতে প্রয়াসী হবেন বলে আমরা আশাবাদী।

---

৮৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

বাংলা উপন্যাসে মুসলিম প্রয়াস : প্রথম পর্ব

শেখ রেজাউল করিম*

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কাহিনীধর্মী গ্রন্থ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্য আধুনিক-কালের সৃষ্টি হলেও এর সূচনা লোকগাঁথামূলক রচনা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় পেয়েছি। এর ভাব প্রকাশে কথ্যভাষার প্রয়োগ, মানবমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বাস্তবপ্রীতি ও বিভিন্নদিক পর্যালোচনাকালে নিঃসন্দেহে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'কে উপন্যাস সাহিত্যের পূর্বসূচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[১] এছাড়াও আরাকান রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যিকগণ গাঁথা-সাহিত্য, প্রণয়-রোমান্সের চমক সৃষ্টি করে কাহিনীধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

উনিশশতকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনাপর্বে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)-এর 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩), হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্সের (১৮২৬-১৮৬১) অনুবাদগ্রন্থ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এর গদ্যধর্মী কাহিনী পরবর্তী পর্যায়ে সার্থক বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পথ নির্মাণ করে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাময় পথ অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশ করেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে 'দুর্গেশনন্দিনী' উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানাবিধ কারণে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা বিলম্বিত হয়েছিল। সে কারণেই বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের উপস্থিতি হয়েছে বিলম্বিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ

> বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম অবদান খুব দীর্ঘকালের নয়। কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং গদ্যের বিভিন্ন ধারায় মুসলমানদের সাহিত্যিক প্রয়াসের শুরু। বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম সাধনার শুরুতে মুসলিম মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল পুঁথিসাহিত্যের ধারা। এই ধারা অবশ্য কাজ করেছে তাঁদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও। সমকালীন জীবন-চেতনা সূচনাপর্বের মুসলিম কথাশিল্পীদের ততখানি প্রভাবিত করতে পারেনি যতখানি করেছে মুসলিম ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত পুঁথিসাহিত্যের ধারা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা কথাসাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে পুঁথিসাহিত্যের ধারাটি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন।[২]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'*, কালকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ (পঞ্চম সংকরণ) ১৯৬৫, পৃ. ১৬

২ আজহার ইসলাম, *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ)'* , ঢাকা; দ্বি-সং-১৯৮৮, পৃ.

www.pathagar.com

১৭৫৭ সালে পলাশি-যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা তথা ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র অধিকারভুক্ত হয়। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনী' ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে রাজস্ব আদায়ে যথেচ্ছা শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে। কোম্পানি শাসনের ফলে 'দেশীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়, রোপিত হয় পুঁজিবাদী শিল্পের বীজ, নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয় সমাজ-কাঠামো, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরোজা উন্মোক্ত হয়, জন্ম নেয় নতুন শ্রেণী ও সমাজ।'[৩] বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ শুরু হবার ফলে নতুন ভূমি ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে বাংলা তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে এবং শুরু হয় নবতর চিন্তা-চেতনার।

২.

ইংরেজ বণিক ১৭৫৭ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নিয়ন্ত্রণকর্তা হবার পর 'ক্লাইভের গর্দভ' অনুগত নবাবদের নামেমাত্র ক্ষমতায় রাখেন। দেওয়ানি লাভের পর প্রথমে লর্ড ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪) প্রবর্তন করেন 'দ্বৈতশাসন'। এরপর গভর্নর জেনারেলের (বড় লাট) অধীনে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের (ছোট লাট) মাধ্যমে ১৮৫৪ সাল থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এ সময় অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গৃহীত হলেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ তথা বাংলার মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপ নেয়।

ইংরেজ শাসনভুক্ত হবার পর বিভিন্ন সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ভারবতর্ষের কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন অকার্যকর হয়ে পড়ে। পলাশি যুদ্ধের পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা গণমানুষের অনেক সংগ্রাম-বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রাম 'কৃষক-বিদ্রোহ' (১৭৬৭-১৮০০) নামে খ্যাত।[৪] এরপর বাংলায় অনেক ছোট বড় বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছে "এর মধ্যে ওহাবী আন্দোলন (১৭৭০-১৮৩০), ফারায়জী আন্দোলন (১৮৩৮-৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) ও নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য"।[৫] এইসব আন্দোলনের মধ্যে ওহাবী আন্দোলন, ফারায়জী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ সর্বভারতীয় পর্যায়ে। তবে ওহাবী ও ফারায়জী বিদ্রোহ ছিল প্রধানত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকামী ধর্মীয় পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে। ইংরেজ শাসন-বিরোধী এসব আন্দোলনের লক্ষ্যহীনতা, পশ্চাৎ-মুখী দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক দুর্বলতা সাফল্য অর্জনের পথে ছিল বড় বাঁধা। তবে ভারতবর্ষে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের মূল ভিত্তি ছিল বুর্জোয়া দর্শন। উপরিউক্ত আন্দোলনের পক্ষে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীকে প্রতিহত করার মতো প্রাণশক্তির স্বল্পতা ছিল। তবে "এইসব সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্রমশ জনমানসে বৃটিশ বিরোধী চেতনা, স্বাদেশিকতাবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও সামন্তবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে।"[৬]

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই গণ-বিদ্রোহ সফল হতে পারেনি বটে কিন্তু ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। 'সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া

৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *'মীর মশাররফ হোসেন ; সাহিত্য কর্ম ও সমাজচিন্তা'*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯

৪. সুপ্রকাশ রায়, *'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'* (১ম খণ্ড), কলকাতা ১৯৭০, পৃ. ১০৪

৫. *'মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা'*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫

৬ ঐ, পৃ. ১৬

www.pathagar.com

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর এক ঘোষণাবলে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজহাতে গ্রহণ করেন।[৭] ঘোষণাপত্রে পরাধীন ভারতবাসীর অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা কার্যে পরিণত হয়নি। ফলশ্রুতিতে নানা সভা সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে, জন্ম নেয় বিভিন্ন সংগঠনের। এর মধ্যে 'বেঙ্গল-বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৭৬), 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' (১৮৮৩), 'জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) অন্যতম।

ব্রিটিশ শাসকের স্বার্থরক্ষা ও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্থিতিশীলতা ও শ্রেণীগত বিদ্রোহ প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৮৮৫ সালে আবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান এ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমের (১৮২৯-১৯১২) পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত হয়। এ কারণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত 'কংগ্রেস ছিল অত্যন্ত নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান'।[৮] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ঘটতে শুরু হয়। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সিপাহি বিদ্রোহের পর সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) নেতৃত্বে উত্তর ভারতীয় একদল মুসলিম সমাজ-নেতা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এ ছিল এক গুণগত পরিবর্তন ও কার্যকর পদক্ষেপ। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান সিপাহি বিদ্রোহের পর মুসলিম ভারতের চিন্তারাজ্যে এক যুগান্তকর পরিবর্তন আনেন। তিনি ইংরেজ শাসকের অধীনে সাবজজ হিসাবে চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন।[৯] তিনি চাকুরিতে থাকাকালেই সিপাহি বিদ্রোহ প্রত্যক করেন। মুসলমানরা দেশে মুঘল শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং 'ফারায়জী ও ওহাবী আন্দোলনজনিত' সন্দেহে সিপাহি বিদ্রোহের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সবটাই মুসলমানদের উপর পড়ে এবং পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদেরকে ষড়যন্ত্রকারীরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকের বিদ্বেষভাব দূর করার জন্য 'সিপাহী বিপ্লবের হেতু' (১৮৫৮) এবং 'রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান' (১৮৬০) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এভাবে মুসলিমসমাজ আলাদা জাতি হিসেবে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয়তাবোধে স্বাক্ষর রাখতে শুরু করে। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের ক্রোধ প্রশমনের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বসমাজের সংস্কার ও উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু করেন। 'আলিগড় আন্দোলন' নামে খ্যাত এই আন্দোলনের মূল কথা হলো-শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা ও শাসন কার্যে অধিকার লাভ করা। তিনি ইংরেজদের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করেন। সৈয়দ আহমদ 'আসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক'[১০] দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও 'অনগ্রসর মুসলমান সমাজের উন্নতির স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি মুসলমানদের রাজনীতিতে

---

৭. আনিসুজ্জামান ঃ *'মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য'*, ঢাকা ১৯৬৪, পৃ. ৫৮

৮. *'মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্য কর্ম ও সমাজ চিন্তা'*, পৃ. ১৬

৯. *'মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য'*, পৃ. ৬৬

১০. বদরুদ্দীন উমর, *'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন'*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ অনুমোদন করেন নি'।[১১] নবাব আবদুল লতিফ খানবাহাদুর (১৮২৬-১৮৯৩), ও সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) এবং মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা সৈয়দ আহমদের কংগ্রেস বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন এবং জনমত গড়ে তোলেন। তবে 'বাংলা এবং বহির্বাংলায় কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষেও মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ সক্রিয় ছিলো।'[১২]

সিপাই বিপ্লবের পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলমান সমাজে নবাব আবদুল লতিফের কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো আর ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা। ১৮৬০ সালের পর থেকেই মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসকের সঙ্গে মুসলমানদের সহৃদয় সম্পর্ক গঠনে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। 'প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রয়াস, যুগের দাবী'তে বিশ্বাসী সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৮ সালে 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'অন্যদের মতো সৈয়দ আমীর আলীও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক-স্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন।'[১৩]

১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ বৃদ্ধির কারণে মুসলানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মুসলিম প্রতিনিধিদল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। এরপর ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও অন্যান্য অধিকার নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। 'মুসলিম লীগের' মাধ্যমে সর্বভারতীয় মুসলমান তথা বাঙালি মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক অধিকার, স্বার্থ রক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট হয়।

৩.

পলাশি-যুদ্ধের পর 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' দেশের রাজস্ব আদায়ের অর্থ সিংহভাগ হস্তগত করেন। এই সংগৃহীত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশের বেশী অর্থ ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করতেন। এরফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পরে তাদের রাজস্ব আদায়, শোষণ, লুণ্ঠন ও নির্যাতন বৃদ্ধিপায়। বাংলায় এর ফলে দেখা দেয় ১৭৬৯-৭০ সালে এক ভয়বাহ দুর্ভিক্ষ। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) পরিচিত এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং 'দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির মারাত্মক ক্ষতি' সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরে আগের বছরের তুলনায় অধিক খাজনা আদায় হয়। এ বিষয়ে জানা যায় ঃ

> ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব সংগ্রহের আরো সুষ্ঠু ও নিশ্চিত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গদেশে প্রথমে 'পাঁচসালা' পরে 'দশশালা' এবং সর্বশেষে ১৭৯৩

১১. 'মীরমশারফ হোসেন ঃ *সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা*', পৃ. ১৮
১২. ঐ, পৃ. ১৮
১৩. ঐ, পৃ. ১৯

www.pathagar.com

সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর ফলে যুগযুগ ধরে প্রচলিত এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার রূপ ও রীতির মৌল পরিবর্তন ঘটে। রাজস্ব আদায়ের চুক্তিতে জমিদার জমিতে লাভ করলো বংশানুক্রমিক দখলিস্বত্ব। বঙ্গদেশে জমিদারের পক্ষ থেকে সরকারকে দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষক-প্রজার নিকট থেকে এর প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায়ে সক্ষম হয়।[১৪]

ব্রিটিশ শাসন-শোষণের প্রথম দিকে কতিপয় ভূমি-সংস্কারনীতি প্রবর্তিত হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় পূর্বতন জমিদার শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে যে জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠে তাতে বাঙালি মুসলমান জমিদারের সংখ্যা হ্রাস পায়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ছাড়াও 'লাখেরাজ সম্পত্তি' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে গবেষক আনিসুজ্জামান বলেছেন ঃ

> ১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকগুলো আইন তৈরি হয়। এইসব আইন-কানুন লোকসাধারণের গোচরীভূত করার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ফলে অনেকের সম্পত্তি তাদের অগোচরেই নতুন আইন অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এইসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন করেও সাধারণত কোন ফল হত না।[১৫]

৪.

সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ ছিল শিক্ষাদীক্ষা। উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালি মুসলমান শিক্ষালাভ করে চাকুরি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। শিক্ষালাভের ফলে 'উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণী গড়ে ওঠে,[১৬] বাঙালি মুসলমানসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসতে বিলম্ব ঘটলেও মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা ও ইংরেজ সরকারের সুদৃষ্টি ও সহযোগিতার ফলে বাঙালি হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

> নবাবী আমলের অবসান হলেও পরবর্তী কোম্পানি আমলের বঙ্গদেশ এই সাংস্কৃতিক-উত্তরাধিকারকে অস্বীকার তো করেইনি বরঞ্চ গভীর আগ্রহে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।[১৭]

উপরিউক্ত মন্তব্যে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক ধারা পরিস্ফুট হয়েছে। 'বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যহীন' ইংরেজ-ফরাসি বণিকদের সহযোগী বাঙালি সমাজের 'হঠাৎ বিত্তবান'দের উন্নত রুচিবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপ্রিয়তা না থাকায় সঙ্গত। এদের সংস্কৃতিচর্চার পদ্ধতি ও উপকরণ সম্বন্ধে জানা যায় ঃ

> উনিশ শতকের বাংলায় নিম্নস্তর থেকে উত্থিত কিছু ব্যক্তির হাতে আকস্মিক অপরিমিত ধনাগম জন্ম দিয়েছিল বিলাস-মত্ততার। আমোদ-বিনোদনের উপকরণ ছিলো বাইজীর

---

১৪. ঐ, পৃ. ১০

১৫. *'মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য'*, পৃ. ২৯

১৬. *'মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা'*, পৃ. ২৬

১৭. ঐ, পৃ. ৩৮

www.pathagar.com

নাচ-গান, গণিকাচর্চা, আখড়াই-হাফ্ আখড়াই-কবিগান-পাঁচালি, যাত্রা-তরজা-টপ্পা, খেউড়-বুলবুলির লড়াই–এইসব। এই জীবন ও সংস্কৃতিচর্চা 'নব্যবাবু'দের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না।[১৮]

কোম্পানি আমলে কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ সংস্কৃতিচর্চা, এবং 'বিকৃতরুচির আদিরসাত্মক যৌন-উদ্দীপক গ্রন্থ'[১৯] প্রকাশ সাংস্কৃতিক অবস্থাকে করে তুলেছিল অসুস্থ। তবে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার মধ্যযুগের ধারাটি ছিল সমৃদ্ধ। মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাসাহিত্য হয়েছিল পরিপুষ্ট তবে রাজ্যহারা মুসলমানদের দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষপর্বে অবদান রাখা সম্ভব হয়নি। তারা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের মানসে মুসলিম ঐহিত্যগাঁথামূলক দোভাষীপুঁথি সাহিত্যের চর্চা করেছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্য-চর্চায় বাঙালি হিন্দুসাহিত্যিকগণ আত্মনিয়োগ করেন অথচ নানাবিধ কারণে মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় অংশগ্রহণ বিলম্ব ঘটেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-১৮৮৭) প্রমুখ মনীষী আবির্ভাবে বাংলাসাহিত্য যখন সমৃদ্ধ তারও অনেক পরে মুসলমান সাহিত্য-শিল্পীদের আবির্ভাব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ

"শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, মাতৃভাষার প্রশ্নে দ্বিধা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-জাতীয়তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও মধ্যশ্রেণীর অনস্তিত্ব, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মুসলিম-প্রয়াসকে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করেছে। এই অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যখন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক-পর্বে মুসলিম প্রয়াস সূচিত হলো, তখন আর্থ-সামাজিক জীবনের মতো শিল্প সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিবেশী হিন্দুর তুলনায় সে পিছিয়ে রইলো।"[২০]

জীবনযুদ্ধে সংগ্রামী বাঙালি মুসলিমসমাজ ইংরেজ শাসক ও পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতি অনুগামী হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাঙালি মুসলমান সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জনগোষ্ঠী কারোপক্ষে দারিদ্রের তাড়নায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি তবে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ও সমাজ-সচেতনায় তাঁদের মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে। এই সমাজ-সচেতন সমাজের মধ্য থেকে হয়েছে প্রতিভাবান সাহিত্যশিল্পীর আত্মপ্রকাশ। মুসলিম সাহিত্যশিল্পী হিসেবে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসময়ে সৃষ্টিধর্মী গদ্যশিল্পী ও গ্রামীণ মুসলিম-সমাজজীবনের রূপকার হিসেবে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের (১৮৬০-১৯২৩) আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৫.

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উন্মেষপর্বে 'নানাবিধকারণে' মুসলিম ঔপন্যাসিকদের আগমন বিলম্বিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে শিল্পসম্ভার সৃষ্টি হয় তার মূলে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানধর্মী' সাহিত্যকর্মের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্য

---

১৮. ঐ পৃ. ৩৯

১৯. মুরারি ঘোষ ঃ *'প্রাক-আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতি'*, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৫-৬৬

২০. *মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা'*, পৃ. ৪১

www.pathagar.com

সাহিত্যসমালোচক বলেছেন ঃ

> এই মুসলমান কবি-গোষ্ঠী ভাষারীতি ও উপমা প্রয়োগের দিক দিয়া সংস্কৃতানুসারী প্রাচীন কাব্যধারার অনুবর্তন করিলেও ধর্ম প্রভাবমুক্ত প্রণয়কাহিনীর প্রবর্তনে ইহারা নতুন বিষয়বস্তু ও আখ্যানভঙ্গির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়েছেন। বলিতে গেলে প্রণয়-রোমান্সের বর্ণবৈভব ও চমকপ্রদ সংগঠন 'ইহারাই প্রথম বাংলা-কাব্যে আনিয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের ধর্মনিয়ন্ত্রিত পরিবার ও সমাজ-জীবনচিত্রের একঘেঁয়েমির সঙ্গে তুলনায় এই আখ্যানসমূহে স্বাদের অভিনবত্ব ও ঐহিক জীবনের দৈব-প্রভাবহীন স্বাধীন আবেদন অনুভব করা যায়।[২১]

বাংলাসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভেতরে যে জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে তা 'দেবানুগৃহীত বা দেবস্থান স্থলিত' মানব চরিত্র। এখানে মনুষ্যত্বের মহিমায় বিকাশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়নি। বলা যায় সংস্কৃত-সাহিত্যকে অনুসরণ করেই মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুঁথিসাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োখ্যান এবং পাশ্চাত্যসাহিত্যের প্রভাব সমান কার্যকরী। আধুনিকযুগে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-চর্চার ধারাও পরিবর্তিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বলেছেন ঃ

> উপন্যাসের কাছ থেকে আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ-বিধৃত মানুষ, পট ও পট-নির্ভর জীবন উপন্যাসের উপাদান।[২২]

'সমাজ ও জীবনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তি' সাহিত্যিকদের গদ্যমাধ্যমে শিল্পসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক জীবনধারায় উপন্যাস সাহিত্যের ক্রমবিকাশে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঔপন্যাসিকদের অবদান স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশ হবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' (১৮৬৯) কৌতুকাবহ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত মীর মশাররফ গবেষক উল্লেখ করেছেন ঃ

> 'রত্নবতী' রচনা হিসেবে 'অকিঞ্চিৎকর' হলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর তাৎপর্য অপরিসীম। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা গদ্যে মুসলিম-প্রয়াসের সার্থকধারা যুক্ত হয়।[২৩]

উনিশ শতকে হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন এবং সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁদের পদচারণা বিদ্যমান। এ সাহিত্য সৃষ্টির প্রবলস্রোতে মুসলমান সাহিত্যিকগণও পিছিয়ে থাকেন নি।

বঙ্গিমচন্দ্রের সমকালে মুসলিম সাহিত্যিক হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের অবদান উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কবি-সাহিত্যিক ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর পাশাপাশি বাংলা গদ্যসহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনের অবদান সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

> মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনা-পাঠ দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গদ্য, উপন্যাস কিংবা নাট্যশাখায় মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে

---

২১. *'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'*, পৃ. ১৬

২২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'*, কলকাতা, দ্বি-দেজ সং ১৯৮৮, পৃ. ৪

২৩. *'মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা'*, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১০৭

www.pathagar.com

তিনিই প্রথম সার্থক শিল্পী। দ্বিতীয়তঃ তাঁর গদ্যরচনা তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ জীবনের বিশেষ করে কয়েকটি দিকের পরিচয় বহন করে। সমাজ জীবনের এই পটউন্মোচন শুধু সমাজ বিজ্ঞানী নয়, সাধারণ পাঠকদের কৌতুহলের উদ্রেক করে।[২৪]

দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে হিন্দু সাহিত্যিকগণ উন্নত চিন্তাধারা ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে 'উন্নত রস-রুচি সম্মত' সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকগণের তখনও দোভাষী পুঁথিসাহিত্যের আসর থেকে আধুনিক সাহিত্যে প্রবেশ হয়েছে বিলম্বিত। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়েই পরিণত প্রতিভা সম্পন্ন সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নধারা একের পর এক সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে পূর্ণ করলেন। এ সম্বন্ধে একজন গবেষকের অভিমত স্মরণযোগ্য ঃ

মশাররফ হোসেন একজন আধুনিক-মনা সুসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে শুধু প্রতিষ্ঠিত করেননি, মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সাহিত্যসাধনার প্রেরণা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।[২৫]

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মোহাম্মদ নজিবর রহমান পূর্ববর্তী মুসলিম-প্রয়াস অনুসন্ধান করলে মীর মশাররফ হোসেনের পরবর্তী বেশ কয়েকজন মুসলিম ঔপন্যাসিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য [উপন্যাসের নামসহ] হলেন-নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৫৮-১৯০৩) 'রূপজালাল' (১৮৭৬); মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৭০-১৯১৪) 'প্রেমদর্পণ' (১৮৯১); মতীয়র রহমান (১৮৭২-১৯৩৭), 'মোক্ষপ্রাপ্তি' (১৯০২) প্রমুখ। এছাড়াও সাাহিত্য রচনায় নজিবর রহমানের সমসাময়িক ছিলেন 'জোহরা' (১৯১৮) উপন্যাসের রচয়িতা মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ও রায়নন্দিনী (১৯১৮) উপন্যাসের রচয়িতা ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)।

মীর মশাররফ হোসেনের পরবর্তী অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ভাগে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলিম ঔপন্যাসিকের সংখ্যা ব্যাপক ছিল না। তথাপিও এই সময়কালের মধ্যে রচিত উপন্যাসগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা উপন্যাসে মুসলিম প্রয়াস মূল্যায়নে উপরিউক্ত উপন্যাসগুলোর অবদান অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও সার্থক গদ্যশিল্পী মীর মশাররফের পদ্যরচনা পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় তাঁর গুরুত্ব ও কৃতিত্ব ত্রিবিধ ঃ

প্রথমত ঃ উপন্যাস ও নাট্য সাহিত্যে মুসলিম হিসেবে সার্থকতা অর্জন।

দ্বিতীয়ত ঃ তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে অর্থাৎ 'মশাররফের জীবন কাহিনী তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনেক উপাদান যুগিয়েছে'।

তৃতীয়তঃ মীর মশাররফের গদ্য রচনারীতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলিষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। 'বিষাদসিন্ধু' রচনারীতি, ভাষা সবকিছু মিলিয়ে এক উৎকৃষ্ট সাহিত্য নির্দশন। কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন ও উপন্যাসধর্মী রচনা মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশখানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।[২৬]

---

২৪. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল ঃ *'মীর মশাররফের গদ্য রচনা'*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১

২৫. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *'বহুবতী থেকে অগ্নিবীণা সমকালের দর্পণে'*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭

২৬. *'মীর মশাররফের গদ্য রচনা'*, পৃ. ৫

www.pathagar.com

মীর মশাররফের প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনা 'রত্নবতী' (১৮৬৯) প্রকাশের পর ১৮৮৫ সালে মহরমপর্ব, ১৮৮৭ সালে উদ্ধারপর্ব ও ১৮৯১ সালে এজিদবধপর্বের মধ্যদিয়ে বাংলাসাহিত্যের অমরগ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের শিল্পসার্থকতার গুণে ধর্মীয়-আবেগ রূপান্তরিত হয়েছে হৃদয়গত ভালবাসার উপাখ্যানে। গবেষক মুনীর চৌধুরী বলেছেন ঃ

> মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবনবিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয় পরবশ মানব-মানবীর হর্ষ-শোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ, কিস্‌সা-কাহিনীর ক্রোড়োদ্‌ভূত হয়েও অনেকদূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংলগ্ন, প্রিয়-পরি-জনবেষ্টিত, শত্রু-মিত্র পরিবৃত সজীব নরনারী।[২৭]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) গ্রন্থটি মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা। এর কাহিনী দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমত ঃ নীলকর কেনী সাহেবের সাথে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার প্যারী সুন্দরীর বিরোধ ও কেনী সাহেবের অধঃপতন। দ্বিতীয় ধারায়-গ্রন্থকারের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী শাগোলামের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মীর সাহেবের স্ত্রীর অকালমৃত্যুর কারণ নির্দেশ। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র বিশেষ আকর্ষণ হল দ্বিতীয় ধারাটি। এ গ্রন্থটি উপন্যাস ও আত্মজীবনী সংমিশ্রণে একটি সঙ্করসৃষ্টি। এর ভাষা সরল ও সাবলীল। রসোত্তীর্ণ এ গ্রন্থে তৎকালীন সমাজচিত্রের পরিচয় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এতে প্রজা 'পীড়নের 'মর্মান্তিক চিত্র' ফুটে উঠেছে। কেনী কৃষকের ধানের জমিতে জোর করে নীল বুনেছে, প্রজাদের ধরে বেগার খাটিয়েছে, অবাধ্য প্রজার ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের ভয়ানক বন্দিখানায় আবদ্ধ করে রেখে জোতদার তালুকদারদের জোত-জমি লিখে নিয়েছে। নির্যাতিত কৃষকেরা প্রথমে স্থানীয় জমিদারের সাহায্যে লাঠিয়াল সেজে লড়াই করেছে, রাজদরবারে সুবিচারের প্রার্থনা জানিয়েছে, পরিশেষে নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারকে শুধু প্রতিরোধ করেনি–নিরসনও করেছে।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীরের আর এক অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রন্থটিতে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত সময়ের বিচিত্র ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারদের অন্দরমহলে যে যথেচ্ছাচার, সধবা ও বিধবা মেয়েদের যে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা এতে বর্ণিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক সত্যতা বহন করে। গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র যে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা নয়–এতে সে সময়ের একটি 'মনোজ্ঞ সমাজচিত্র' অঙ্কিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির সামাজিক গ্লানীর এক পরিষ্কার দর্পণ এ গ্রন্থটি। সমকালীন জীবনের বিক্ষিপ্ত বাণীচিত্র হিসেবে এ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক সৃষ্টি।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর (১৮৫৮-১৯০৩) গদ্যে-পদ্যে রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসধর্মী গ্রন্থ 'রূপজালাল' (১৯৭৬)। এর ভাষা মাধুর্য ও বিষাদময়ভাব গ্রন্থটিকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করেছে। মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস 'প্রেমদর্পণ' (১৮৯১)। বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম অবদান হিসেবে 'প্রেমদর্পণ' বিশেষ গুরুত্ববহ। সমালোচকের ভাষায় উল্লেখ করা যায় ঃ

> "উপন্যাসে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলিম যুবকের প্রণয় কাহিনীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কাহিনীর বিবৃতিতে লেখক রোমান্টিক ভাবালুতার পরিচয় দিয়েছেন। আত্মপ্রক্ষেপ-জনিত

২৭. মুনীর চৌধুরী ঃ *মীর মানস*, ১৯৬৪, পৃ. ৪৫

www.pathagar.com

দুঃখ-বেদনা বর্ণনার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালী মুসলমান রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস হিসেবে গ্রন্থখানি স্মর্তব্য।"[২৮]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শক্তিশালী সাহিত্যবলয়ে নতুন কোন সাহিত্যিকের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা ছিল অকল্পনীয়। মীর মশাররফ হোসেন এ বলয়ে নতুনত্ব সৃষ্টির স্বাক্ষরই শুধু রাখেন নি, সৃষ্টি করেছেন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঔপন্যাসিকদের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায়। উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে মীর মশাররফের ভূমিকা ছিল পথ প্রদর্শকের। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই ধারায় সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে বিশ শতকের প্রথম দশকে মোহাম্মদ নজিবর রহমান শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দেন। নিরঙ্কুশ সমাজ ভিত্তিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' মুসলিম সমাজ জীবনের প্রথম শিল্প নির্দশন।[২৯]

মোহাম্মদ নজিবর রহমান 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯১৮), 'পরিণাম' (১৯১৮), 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩) প্রভৃতি উপন্যাসে বাস্তব সমাজচিত্র ও চারপাশের পরিচিত পরিবেশকেই তাঁর উপন্যাসগুলোতে বিধৃত করেছেন। উনিশ শতকের শেষদশক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের গ্রামবাংলার সমাজকে নজিবর রহমান তাঁর উপন্যাসে যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও সামজের পতিতা ও দুঃশ্চরিত্র মানুষগুলোর সাবলীল চিত্র তুলে ধরতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। ১৯০৩ সালে 'বিলতী বর্জ্জন রহস্য' এবং ১৯১৪ সালে 'আনোয়ারা' প্রকাশের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের ধারা পল্লবিত, বিকাশিত এবং পূর্ণতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মনোবিশ্লোষণধর্মী উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'চোখের বালি'র প্রকাশ একটি নতুন দিকের সূচনা করে।

নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) সমাজের উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিতদের 'গভীর জীবনবেদনা' সহানুভূতির সাথে উপলব্ধি করে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা উপন্যাসের পূর্ণতা এলেও মুসলিম ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে উনিশ শতকের ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। মোহাম্মদ নজিবর রহমান তাঁর সমকালে একজন 'জনপ্রিয়' কথাশিল্পী ছিলেন। কালের পরিধি অতিক্রম করে নজিবর রহমানের উপন্যাসগুলো এখনো পাঠকসম্পৃক্ত। গবেষক মযহারুল ইসলাম বলেছেনঃ

"... উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিপর্বে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ে সমাজ জীবনে সংস্কৃতি ও শিক্ষার যে বিবর্তন এসেছিল নজিবর রহমান তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠ দিয়েছেন এবং সে কণ্ঠ কেবলমাত্র আদর্শবাদী সংস্কারকের নয়, বহুলাংশে তা একজন অনুভূতিবান গুণীশিল্পীর।"[৩০]

নজিবর রহমান নগরসভ্যতা থেকে দূরে অবস্থান করে গ্রামীণ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর উপন্যাস রচনার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মীর মশাররফ হোসেন যে উপন্যাস রচনার ধারা সৃষ্টি করে গেছেন সেই পথ অনুসরণ করেই নজিবর রহমান বাংলা উপন্যাস রচনায় স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

---

২৮. *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ)'*, পৃ. ৫৫৭

২৯. ঐ, পৃ. ৫৫৭

৩০. মযহারুল ইসলাম ঃ *'নজিবর রহমান'*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৩৮

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল – জুন ২০০৬

ইবনুল জাওযী'র ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম' একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ রহিম উল্যাহ*

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতার সূচনা হয় প্রথম মানব হযরত আদম (আ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আ) থেকে। হযরত আদম (আ) যেমনিভাবে প্রথম মানব ছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন প্রথম নবীও। সৃষ্টির আদি থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী তাঁর বান্দার নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম রাখা হয়েছে আম্বিয়া (আ)গণকে। তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসী সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এসব আম্বিয়া (আ)-এর প্রতি যে অহী নাযিল করেছেন তা দ্বারা নির্ভুলভাবে জ্ঞানের এ পরিব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছিল আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের মাধ্যমেই, যা কেবল পৃথিবীর আদি থেকে ঘটে যাওয়া প্রবহমান এসব ইতিহাস স্বার্থকভাবে পরবর্তীরা জানতে সক্ষম হচ্ছে। ইসলামের ইতিহাস সঠিকভাবে জানার মূল উৎস যদিও কুরআন এবং আল-হাদীস, তথাপিও সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলাম, আম্বিয়া (আ), বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টি রহস্য, আম্বিয়া (আ)-এর সুবিশাল তত্ত্বভিত্তিক ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে যে গ্রন্থগুলোতে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হচ্ছে "আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম"। এটি ১৬ ভলিওমে ১৮ খণ্ডে প্রায় ৬৪১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এটি নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় ইতিহাস গ্রন্থ, যাতে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের জীবন-চরিত ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সঠিক তত্ত্ব তথ্যযোগে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়াও সৃষ্টি জগতের তত্ত্ব-রহস্যাবলী, উল্লেখযোগ্য খলিফাগণ, রাজা-বাদশাহদের উত্থান-পতন, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নশর, তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলীসহ হিজরী ৫৭৪ সন পর্যন্ত ঘটমান বিভিন্ন কাহিনী এবং উক্ত সনগুলোতে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যবহুল এ গ্রন্থটির রচয়িতার অতিশয় সরল নাম, 'ইবনুল জাওযী' যিনি একাধারে প্রখ্যাত বক্তা, হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ, মুফাস্‌সির, বরেণ্য মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ছিলেন, যাঁর চারণ ক্ষেত্র ছিল সুবিস্তীর্ণ। নিম্নে আমরা সন ভিত্তিক আলোচিত এ ইতিহাস গ্রন্থটি এবং গ্রন্থকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

তাঁর নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম আবদুর রহমান, তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত।[১] পুরো নাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল জাওযী।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-জাওযী, *আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম*, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৯২ ইং) খ. ১, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

তিনি মূল আরব্য অধিবাসী কুরাইশী তাইমী গোত্রীয়।[২] তাঁর বংশ পরিচয় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও সঠিক মত হলো, তিনি আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাম্মাদী ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন জাফর আল জাওযী ইবন আবদুল্লাহ্ ইবনুল কাসিম ইবনুন নাসার ইবনুল কাসিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর আস-সিদ্দীক (রা)।[৩] অর্থাৎ তাঁর ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষের পর্যায়ে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত যুক্ত হয়।[৪]

তাঁর উপনাম

'আল-জাওযী' উপনাম হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, জাওযী শব্দটি তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মত হলো, এটি তাঁর দাদা পরদাদার নামের পরিচিতি থেকে প্রাপ্ত অথবা বাগদাদে আখরোট বিক্রেতা হওয়ার কারণে হয়েছে। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবরণ মতে এটি বসরার 'জাওযা' নামক মহল্লার সহিত সম্পর্কিত, কেননা তাঁর একজন পূর্ব পুরুষ জা'ফর ঐ মহল্লায় বসবাস করতেন বিধায় তাঁর উপনামটি প্রযোজ্য হয়।[৫]

তাঁর উপাধী

জামালুদ্দীন, আল-হাফিজ, আল-মুফাস্সির, আল-ফকীহ্, আল-ওয়াইজ, আল-আদী, যুগ প্রাজ্ঞ, যুগশ্রেষ্ঠ।[৬]

জন্ম

তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতান্তর রয়েছে। ইবন রজবের বর্ণনা অনুযায়ী ৫০৮ হি. থেকে ৫১৭ হি. সনের কোন এক সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।[৭] আল্লামা সাবতী তাঁর গ্রন্থ 'মিরআতুয যাহিরাহ'-এর মধ্যে ইবনুল জাওযীর জন্ম ৫১১ হি. বরে উল্লেখ করেছেন।[৮] কিন্তু আল্লামা আদ-দিময়াতী (র)-এর 'আল-মুসতাফাদ'[৯] গ্রন্থে এবং ইবনুল জাওযীর লেখা পত্রে তাঁর 'লাফফাতুল কাবদ'[১০] নামক গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ৫১১ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনুল জাওযীর পৌত্র তাঁর জন্ম বৎসর ৫১০/১১২৬ সনের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

---

২. আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-জাওযী, প্রাগুক্ত।
৩. সিবত ইবনুল জাওযী, *মির'আতুয-যামান ফী তারীখিল আ'য়ান*, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৫২ ইং) খ. ৮. পৃ. ৩১০।
৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সংক্ষিপ্ত, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ ইং) খ. ১, পৃ. ১৬২।
৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১৬২।
৬. সিবত ইবনুল জাওযী, *মির'আতুয-যামান ফী তারীখিল আ'য়ান*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১০ ; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩।
৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬২।
৮. সিবত ইবনুল জাওযী, *মির'আতুয-যামান ফী তারীখিল আ'য়ান*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১০।
৯. আদ-দিময়াতী, *আল-মুস্তাফাদু মিন যাইলি তারীখি বাগদাদ* (লেবানন : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা- ১৯৬৩ ইং), পৃ. ৪১৮।
১০. ইবনুল জাওযী, *লাফ-ফাতুল কাবাদ ফী নাসীহাতি ইবনিল ওয়ালাদ* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৫৩ ইং) পৃ. ৪৬।
১১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬২।

www.pathagar.com

তাঁর প্রতিভা ও শিক্ষা জীবন

ইবনুল জাওযীর জীবন শুরু হয় তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য ব্যবসায়িক কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর বাবা নুহাস ব্যবসা করতেন। ইবনুল জাওযী তাঁর 'নাসিহাতুল ওয়ালাদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন—[১২] 'হে বৎসরা জেনে রেখো আমি আবু বকর (রা)-এর সন্তান, তৎপর আমাদের বংশ পরম্পরায় ব্যবসায়, কেনা-বেচায় আত্মনিয়োগ করেন।'

তিনি আরো বলেন, 'জেনে রেখো হে বৎসরা আমার বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি বিভিন্ন প্রকারের পণ্যের সমাহার করেছেন'[১৩]

তিন বছর বয়সে জাওযীর বাবা মারা যান। মাতা ও ফুফুই তাঁর লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর মাতাও মারা যান। এরই মধ্যে যখন তিনি বিচার-বিশ্লেষণ উপলব্ধির বয়সে উপনীত হলেন, তখন তাঁর চাচা তৎকালীন ভাষাবিদ শায়খ আবুল ফাযল মুহাম্মদ ইবন নাসিরের নিকট জ্ঞানার্জনের জন্য সোপর্দ করলেন, তাঁর নিকটই ইবনুল জাওযীর জ্ঞানের হাতে খড়ি হয়। তথায় তিনি আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের অনেক ভাষ্য মুখস্থ করেন, পরবর্তীতে তাঁরই সহযোগিতায় বিষয়ভিত্তিক বিশেষ পণ্ডিতগণের নিকট তিনি যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। জীবন সায়াহ্নের দিনগুলো সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন,[১৪] 'আমার এ জ্ঞান অর্জিত নয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত, মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই আমি মজবুত মনোভাব নিয়ে জ্ঞানার্জনে অগ্রসর হই, আমার স্মরণ নেই আমি কখনও বাচ্চাদের সাথে রাস্তায় খেলা করেছি বলে, কখনও শব্দ করে হেসেছি বলেও আমার জানা নেই। শায়খ আবুল ফাযল আমাকে অন্যান্য পণ্ডিতগণের নিকট নিয়ে গেলেন এবং হাদীস, মাসনাদ, বড় বড় কিতাব, হাদীস ও সকল বিষয় গভীর জ্ঞান অর্জনে লাগিয়ে দিলেন, আমি জ্ঞান পিপাসু হয়ে গেলাম।' আমাকে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে নতুন নতুন বিষয়াবলী দিয়ে যতই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তা আমার নিকট মধুর রস আস্বাদনের মত সহজই মনে হচ্ছে।

ইবনুল জাওযীর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ

ইবনুল জাওযীর লিখিত গ্রন্থ 'আল-মুনতাজাম'-এ তাঁর শিক্ষকদের সংখ্যা সম্পর্কে তিনি নিজে ৭৮ জনের কথা যদিও উল্লেখ করেছেন,[১৫] তথাপি এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 'আমি ৮৬ জন শিক্ষক এবং ৩ জন শিক্ষিকার নিকট লেখাপড়া করেছি। যারা তৎকালীন বাগদাদসহ শিক্ষার জগতে সুপণ্ডিত হিসেবে সম্যক পরিচিত ছিলেন।'[১৬] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম আমরা উল্লেখ করছি। যেমন—

১. ইব্রাহিম ইবন দ্বীনার আন-নাহরাওয়ানী, ২. আহমদ ইবন আহম্মদ আল-মুতাওয়াককিলী, ৩. আহম্মদ ইবনুল হুসাঈন আল-বাগদাদী, ৪. আহমদ ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আস্-সুলামী, ৫. আহমদ ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মাজাল্লী, ৬. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবীল ফরয আদ্দ্বীনওয়ারী, ৭. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আঃ কাহির আত্তুসী, ৮. আহমদ ইবন

---

১২. ইবনুল জাওযী, *লাফ-ফাতুল কাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৩. ইবনুল জাওযী, *লাফ-ফাতুল কাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫।

১৪. ইবনুল জাওযী, *লাফ-ফাতুল কাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩।

১৬. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

www.pathagar.com

মানসুর আস-সূফী, ৯. ইসমাঈল ইবন আহমদ উমর আস্-সামরকান্দী, ১০. আল-হাসন ইবন আহমদ ইবন মাহবুব, ১১. আল-হুসাঈন ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব আদ্দিবাস, ১২. জা'ফর ইবন আলী আল-হামদানী, ১৩. আবদুল্লাহ্ ইবন মুহম্মদ ইবন আবী বকর আশ-শুলী এবং ১৪. ইয়াহ্ইয়া।

ইবনুল জাওযীর গ্রন্থের সংখ্যা সম্পর্কে উস্তাদ আঃ হামীদ আল-'আলভী[১৭] বলেন, তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা অন্তত ৫১৯টির মত। ইবনুল জাওযীকে একদা তাঁর রচনাবলী স্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা ৩৪০টির বেশী হবে, এর মধ্যে ২০টি একাধিক খণ্ডে এবং বাকিগুলো মৌলিক।[১৮] ইবনুল জাওযীর লেখনী সম্পর্কে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,[১৯] তাঁর অনেক লেখনী এবং রচনাবলী রয়েছে। আমার জানা মতে জাওযীর হাজারো লেখনী এবং রচনাবলী রয়েছে, এর অধিকাংশই জনসম্মুখে আসেনি। অবশ্য তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'আল-মুন্তাজাম'-এ নিজ রচনাবলীর মাত্র ৬৯টির নাম উল্লেখ করেছেন।[২০] তন্মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ মাত্র কয়েকটির নাম আমরা তুলে ধরেছি।

১. আল-মুগনী ফীত্ তাফসীর, ২. তায্ কিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গারীব, ৩. ফুনুনুল আফনান ফী উলূমি উয়ুনিল কুরআন, ৪. ওয়াদুল আগসান ফী ফুনুনিল আফনান, ৫. উমদাতুর রাসিখ ফী মা'রিফাতিল মানসূখ ওয়ান্নাসিখ, ৬. গারীবুল গারীব, ৭. যাদুল মাসীর ফী ইলমিত্ তাফসীর, ৮. মুন্ তাকিদুল মু'তাকিদ, ৯. মিনহাজুল উসূল ইলা 'ইলমিল উসূল, ১০. মাসলাকুল আক্ল, ১১. মানহাজু আহলিল ইসাবা, ১২. আর রাদ্দু 'আলাল মুতা'আস্সাবিল আনীদ, ১৩. দাফউ শুবু হাতিত্ তাশবীহ, ১৪. জামিউল মাসানীদ বি আল-খাসিল আসানীদ, ১৫. আল-হাদাইক, ১৬. নফী উন্নক্ল, ১৭. উয়ূনুল হিকায়াত, ১৮. মানাকিবি বাগদাদ, ১৯. আল-মুন্তাজাম, ২০. আল-মাযহাবু ফিল মাযহাব, ২১. আল- 'ইবাদাতুল খমছ, ২২. আল-মুনতাখাব ফিন্নাওব, ২৩. নাওয়াসিখুল কুর'আন।

ইবনুল জাওযীর কর্মজীবন

ইবনুল জাওযীর কর্মতৎপরতার বেশির ভাগই ছিল বক্তৃতা, তাঁর অলংকারমণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার জন্য খুবই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইবন হুবায়রার মন্ত্রিত্বকালে তিনি তাঁর অতিশয় প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। ৫৫৫ হিজরী সনে আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ যখন খলীফা হলেন তখন তিনি বাগদাদের অন্যান্য পণ্ডিতের সহিত তাঁকেও একটি বহু মূল্যবান খিল'আত প্রদান করেন।[২১] তিনি আব্বাসীয় খলিফার নামে উৎসর্গ করার নিমিত্তে 'কিতাবুন-নাসার 'আলা মিসর' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২২] খলিফা ও উযিরগণের সহিত ইবনুল জাওযীর এ সম্পর্ক অর্থোপার্জন অথবা কোন

---

১৭. আবদুল হামীদ আল-'আলুজী, *মু'আল্লাফাতু ইবনুল জাওযী*, ১ম সংস্করণ, (বাগদাদ : আলামুল কুতুব, ১৯৬৫ ইং) পৃ. ১০২।

১৮. ইবন রযব, *আয-যায়লু 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলা* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা-তা.বি.) খ. ৩, পৃ. ৪১৩।

১৯. ইবন রযব, *আয-যায়লু 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৫।

২০. ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০।

২১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩।

২২. আবুল মুহাসিন আল-হুসায়নী, *যায়লু তাবাকাতিল হুফ্ফায* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা-তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৪০৫।

www.pathagar.com

প্রকার ইহলৌকিক স্বার্থের জন্য ছিল না বরং তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যেও এটি একটি স্বাভাবিক পরিণতি। তিনি বলেন, 'জীবিকার জন্য আমি কখনও কোন আমীরের তোশামোদ করিনি'। ৫৭০ হিজরী সনে ইবনুল জাওযী বাগদাদের দারবী দিনার নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং তথায় অধ্যাপনা শুরু করেন। একই বছর তিনি তাঁর বক্তৃতায় কুর'আন মাজীদের তাফসীর সম্পন্ন করেন।[২৩] যা তৎকালীন বক্তৃতা মজলিশের জন্য প্রথম এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য ছিল বে নযীর ঘটনা। বিশ হাজার ইয়াহুদী-খৃষ্টান তার ওয়াযে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্তত লক্ষাধিক মুসলমান তাঁর হাতে তাওবা করেন।[২৪] মনে হয় ইবনুল জাওযীর কর্মতৎপরতার বেশির ভাগ ছিল বক্তৃতা। তাঁর বক্তৃতায় বেশির ভাগ সময়ই তিনি হাম্বলী মাযহাবের সমর্থনে কথা বলতেন, কারণ তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের [illegible] রচনার ব্যাপারেও ইবনুল জাওযীর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি যেমন দ্রুত গতিতে বক্তৃতা দিতে পারতেন, তেমন দ্রুত গতিতে লিখতেও পারতেন। তাঁর শেষ জীবন কেটেছে [illegible]দের মধ্যে। ইসলাম বিরোধী দার্শনিক ও যিনদীকদের গ্রন্থাবলী তাঁর জীলীর মাদ্রাসায় রাখার কারণে তাঁকে পাঁচ বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয়। তবে তার ধর্মপ্রাণ মাতার হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। অতঃপর কিছু দিন রোগভোগের পর ইন্তিকাল করেন।[২৫]

তাঁর মৃত্যু

কারাভোগ থেকে মুক্তি পেয়ে ইবনুল জাওযী বিপুল সম্বর্ধনার মাঝে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বল্পদিন অসুস্থ থাকার পর ৫৯৭/১২০০ সনের রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।[২৬] তাঁর মৃত্যু দিবসে বাগদাদের সমস্ত দোকান-পাঠ বন্ধ থাকে এবং সমগ্র শহর শোকগৃহে পরিণত হয়।[২৭]

ইবনুল জাওযী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

১. ঐতিহাসিক হাফিজ আয্ যাহাবী বলেন,[২৮] 'ইবনুল জাওযী ছিলেন সুবক্তা, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ইতিহাসে অপ্রতিরোধ্য অখণ্ডনীয় উক্তির ধারক এবং অদ্বিতীয় প্রশংসার অধিকারী লেখক।'

২. ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান এর মতে,[২৯] 'তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, হাদীসের ইমাম, গঠনমূলক যাদুকরী সমালোচক, বিভিন্ন বিষয়ে অনেক রচনাবলীর অধিকারী এবং অগণিত অসংখ্য লেখনী যার জীবনে সজ্জিভূত।'

---

২৩. আবুল মুহাসিন আল-হুসায়নী, *যায়লু তাবাকাতিল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৫।

২৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩।

২৫. আবুল মুহাসিন আল-হুসায়নী, *যায়লু তাবাকাতিল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৫; সিবত ইবনুল জাওযী, *মিরআতুয-যামন ওয়া 'ইবরাতুল য়াকজান* (হায়দারাবাদ : দক্ষিণাত্য, ১৩৩৮ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭৭।

২৬. উমর রিজা কাহালা, *মু'জামুল মু'আল্লাফীন*, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত মুআস্সাসাতুর রিসালা- ১৯৯৩ ইং), পৃ. ৭৭।

২৭. উমর রিজা কাহলা, *মু'জামুল মু'আল্লাফীন*, প্রাগুক্ত; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৬৩; মাওলানা মুহাম্মদ হানিফ গাংগুহী, *যাফরুল মুফাসসিরীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন* (দেওবন্দ : হানীফ বুক ডিপো-১৯৯৬ ইং) পৃ. ৪৭।

২৮. ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০; হাফিজ আয-যাহাবী, *আল-'ইবার ফী খবরি মিন গাবার* (বাগদাদ : মাত-বা'আতু দারিস্সালাম, ১৯৭৪ ইং) খ. ৪, পৃ. ২৯৭।

২৯. ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাইয-যামান*, ২য় সংস্করণ (বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৭৭ ইং), খ. ২, পৃ. ৩২১।

www.pathagar.com

৩. ঐতিহাসিক ইমাদুদ্দীন আল ইস্‌ফাহানীর মন্তব্য[৩০] 'তিনি ছিলেন সুবক্তা... শব্দ সংযোজন এবং প্রয়োগে প্রত্যুৎপন্নমতী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল সৌকর্য মণ্ডিত।'

৪. আবুল মিজফার সাব্‌তি ইবনুল জাওযী বলেন,[৩১] 'তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, স্বল্পেতুষ্ঠ, সপ্তাহান্তে একবার আল-কুরআন খতম করতেন, জুমার নামায এবং আলোচনা সভা ব্যতীত ঘর থেকে বের হতেন না। কখনও বাচ্চাদের সাথে খেলা করেন নি।

৫. আল্লামা যাহাবী বলেন,[৩২] 'আল্লামা জাওযী সকল প্রকার জ্ঞানের সুপণ্ডিত ছিলেন, তবে তাফসীর, হাদীস, ইলমুল ফিক্‌হ, বাগ্মীতা, ভাষা বিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।'

কিতাবুল মুনতাজামের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইবনুল জাওযী তাঁর সীরাত বিষয়ক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সমৃদ্ধ এ গ্রন্থখানা প্রণয়নে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করেছেন। যাতে তিনি তথ্য নির্ভর, সমাদৃত গ্রন্থ সমূহের সহায়তা নিয়েছেন। যেমন- ইবন ইসহাক রচিত 'আস-সীরাতুন্নাবাবিয়াহ'; ইবন সা'আদ রচিত 'আত-তাবাকাত'; আল-খতীব রচিত 'তারীখু বাগদাদ'; ইমাম আহমদ রচিত 'আল-মুসনাদ', আবু আলী আত-তানূখী রচিত, 'নাসওয়ারুল মুহাদারা'; হিলাল ইবনুল মিহসান আসসাবী রচিত 'খুতাতি বাগদাদ ওয়া হাদারাতিহা'; আবু বকর আস-সূলী রচিত 'আল-আওরাক' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরতার প্রতীক গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচ-পরতাল করে কলম ধরেছেন এবং সুদীর্ঘ সময় ধরে অধ্যাবসায়ের ফসল এ 'আল-মুনতাজাম' গ্রন্থখানা। ইতিহাস জগতে আলোচিত ও বিশেষায়িত একটি গ্রন্থ, গবেষক এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের খোরাক।[৩৩] গ্রন্থখানা সনের ধারাবাহিকতায় রচিত, যাতে অন্য সকল ঘটনাবলীর বর্ণনার সাথে সাথে খলীফা, বাদশাহ, মন্ত্রী, ফকীহ, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবি, লেখক মিলিয়ে প্রায় ৩৩৭০ জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত আলোচিত হয়েছে।[৩৪]

ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম' একটি বিশ্বকোষ জাতীয় সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানা বৈরুতি ছাপায় ১৬ ভলিয়্যুমে ১৮ খণ্ডে প্রায় ৬৪১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতে ভূমিকা, ইতিহাস শাস্ত্রের পরিচয়, এর গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন— সৃষ্টিজগত, পৃথিবী সৃষ্টি, শহর, পাহাড়, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এবং হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে কুরআনে উল্লেখিত এবং অনুল্লেখিত অনেক নবী-রাসূলের দাওয়াতী কর্ম তাঁর জাতির সাথে ঘটমান সমস্যাবলী, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, রাজা-বাদশাহদের কাহিনী, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম, হিযরত, নবুয়ত, মদীনা রাষ্ট্রগঠন, যুদ্ধাবলীসহ পৃথিবীর ঘটমান বিষয়াবলীর তথ্য নির্ভর বর্ণনা প্রদানের মধ্য দিয়ে ৫৭৪ হিজরী সময়কাল পর্যন্ত বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।[৩৫]

---

৩০. ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানী, *জারীদাতুল কাসর ওয়া জারীদাতুল 'আসর*, ১ম সংস্করণ (কায়রো : লাজনাতুত-তা'লীফ ওয়াত-তারজামাহ, ৭২১ হি.) খ. ২, পৃ. ২৬১।

৩১. সিবত ইবনুল জাওযী, *মিরআতুয-যামান*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১১।

৩২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আয-যাহাবী, *তায-কিরাতুল হুফ্‌ফায*, (আল-হিন্দ : হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য, ১৩৮৪ হি.) খ. ৪, পৃ. ১৩৪।

৩৩. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০-৪২।

৩৪. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২।

৩৫. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭-৩৮।

www.pathagar.com

গ্রন্থখানার প্রতিটি আলোচনাই কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেয়ী ও অন্যান্য মনীষীগণের উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। বর্ণনা ক্ষেত্রে তিনি যথাসাধ্য ইয়াহুদী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি বর্জন করেছেন।

খণ্ড. ১ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

এ খণ্ডে ইবনুল জাওযীর জীবনী, ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, 'আল-মুনতাজাম' গ্রন্থখানার রচনারীতি-পদ্ধতি, রচনার মৌল উৎস, গ্রন্থখানার গুরুত্ব এবং শেষে একটি ভূমিকা প্রদানের মধ্য দিয়ে মূল আলোচনা শুরু করা হয়।[৩৬] প্রথমেই তিনি সৃষ্টি রহস্য যেমন পৃথিবী, পাহাড়, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবীবাসী, মাটির নীচের রহস্যাবলী, সপ্তাকাশ, 'আরশ, জিব্রাঈল, ফেরেশতা এবং তাদের কার্যাবলী, জান্নাত-জাহান্নাম, হযরত আদম (আ) ও তাঁর সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, হযরত নূহ, হযরত লুৎ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত আয়ূব, হযরত শো'আইব, তাঁদের জীবন চরিত এবং তাদের সাথে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বর্ণনা, হযরত মূসা (আ) এবং ফির'আউনের সাথে তাঁর ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া হযরত ইউশা (আ), হযরত হারুন, হযরত ইলয়াস, হযরত ইউনুস (আ)-এর বর্ণনাসহ আরো অন্যান্য ছোটখাট ঘটনাবলীর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশেষে আল-ইসকান্দারের কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে ৪৩১ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে।[৩৭]

খ. ২ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

৩৯১ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই খণ্ডে হযরত জাকারিয়া (আ)-এর আলোচনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ), বণী ইসরাঈলদের নবী হত্যা, হযরত ঈসা (আ)-এর বর্ণনা, হযরত মারইয়াম (আ) ও তাঁর গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, হযরত ঈসা (আ)-এর গুণাবলী, নবুয়ত ও অন্যান্য কাহিনীসহ আল্লাহ্র নিকট তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ঈসা (আ)-এর পর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্র ঘটনা, নবী-রাসূলগণের সংখ্যা বিষয়ে বর্ণনা, নবীগণের জীবন যাপন রীতি, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মকাহিনী, দুধমাতা হালীমার আলোচনা তাঁর বাবা-মা, চাচা, নবী করীম (সা)-এর নাম সমূহ, সিফাত সমূহ, জন্মের বছর ঘটে যাওয়া কাহিনীর বিবরণ। তাঁর জন্মের তৃতীয় বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং নবুয়তের প্রথম বর্ষ থেকে অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত হাবসায় হিযরত, রোম বাদশাহ্র কাহিনীসহ অন্যান্য বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে।[৩৮]

খ. ৩ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

নবুয়তের দশম বর্ষ থেকে এই খণ্ডের আলোচনা শুরু হয়ে হিজরী দশম সাল পর্যন্ত সময়কারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ৩৮৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ খণ্ডে বিধৃত হয়েছে। এতে নবুয়তের ত্রয়োদশ সাল পর্যন্ত আলোচনার পর হিজরী প্রথম সন থেকে ধারাবাহিক আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেরা গুহায় অবস্থানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, মদীনার পথ চলা, উম্মে মা'বাদের তাবু

---

৩৬. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫-১৩।

৩৭. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৯-৪৩১।

৩৮. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯০-৩৯২।

www.pathagar.com

পরিদর্শন, প্রথম খুৎবা, নেকড়ের সাথে বাক্য বিনিময়, আনসার ও মুহাজিরগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। দ্বিতীয় হিজরীর আলোচনায় হযরত আলী (রা)-এর সাথে হযরত ফাতেমার বিয়ে, আবওয়া, বুয়াত যুদ্ধ, যাকাতুল ফিতর, বদর যুদ্ধ, আবু জাহল-এর নিহত হওয়া, বদরবাসীর বর্ণনা, অমুসলিম নেতৃস্থানীয় লোকদের বর্ণনা। হিজরী তৃতীয় সনে শুরাইক যুদ্ধ, কা'ব এর হত্যা, উসমান (রা)-এর বিবাহ, বনী সুলাইম, উহুদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং হিজরী চতুর্থ সনে মুনজির ইবন আ'মর, মারসাদ এর বর্ণনা, বনু নাজির যুদ্ধ, সা'দ ইবন বকর ও মুযায়নার প্রতিনিধি প্রেরণ, মুরাইসী এবং ইফক-এর ঘটনা, খন্দকের যুদ্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাহিনীর বর্ণনা। হিজরী ষষ্ঠ সনে বনু লিহয়ান, গাবার যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপন মায়ের কবর পার্শে অবস্থান, ছোট ছোট কতক যুদ্ধ পরিচালনা, পরিশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাহিনী।

হিজরী সপ্তম সনে ওয়াদি আল-কুরা যুদ্ধ, হযরত আবু বকর ও হযরত 'উমর (রা)-এর ছোট ছোট যুদ্ধ পরিচালনা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরাতুল কাযা পালন। হিজরী অষ্টম সনে সুজা ইবন ওয়াহাবের ছোট যুদ্ধ, মুতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, হুনাইন যুদ্ধ, তাঈফ অভিযান, ওরওয়ার ইসলাম গ্রহণসহ অন্যান্য ঘটনা। হিজরী নবম সনে বনু আসাদ, কিলাব, বালা, লাখম, তাঈফ, বাহরা, তাঈ এর ঘটনা বর্ণনাকরণ, তাবুক যুদ্ধ, কা'ব এবং তার সাথীদের কাহিনী, হযরত আবু বকর (রা)-এর হজ্জ পালন, মসজিদে দিরার ধ্বংসের নির্দেশসহ অন্যান্য ঘটনাবলী এবং উক্ত সনগুলোতে মৃত্যুবরণকারী বিশেষ ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে।[৩৯]

খ. ৪ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

৩৭১ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ খণ্ডে বিদায় হজ্জ দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে হিজরী ২৮ সন পর্যন্ত ঘটমান বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যাতে রয়েছে আহলে বাক্কীর জন্য রাসূলের ক্ষমা প্রার্থনা, ভণ্ড নবীদের উদ্ভব কাহিনী, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগাক্রান্ত হওয়া, ইন্তিকাল, কাপন-দাপন, আবু বকর (রা)-এর খিলাফত, ইয়ামামা, আম্মান, ইয়ামানের বর্ণনা, ওয়ালজার ঘটনা, হযরত আবু বকর (রা)-এর সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কাহিনীর বর্ণনা। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত গ্রহণ, তাঁর ইসলাম গ্রহণ কাহিনী, কাহাল, দামেস্ক, বায়সান, বুয়াইব এর ঘটনা। বাগদাদ কাহিনী, কাদিসিয়ার ঘটনা, আগওয়াস, আম্মাস, হিমস, কানসির, জালুলা, হালওয়ান ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনা। বায়তুল মাক্বদাস বিজয়, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের বর্ণনা, জাবিয়ায় হযরত উমরের খুৎবাহ, মসজিদে হারামের নবায়ন, আজার বায়জান ও তাবারিস্তান বিজয়, নাহওয়ান্দের ঘটনা, হযরত উমর (রা) কর্তৃক মসজিদে নববীর পুনঃ নির্মাণ, মিসর এবং ইস্কান্দারিয়া বিজয়, মদীনায় ভূ-কম্পন। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত কাল এবং তাঁর সন্তানদের আলোচনাসহ অন্য সকল ছোট ছোট ঘটনাবলীর বর্ণনাসহ উক্ত সনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে এ খণ্ডের ইতি টানা হয়।[৪০]

খ. ৫ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

হিজরী ২৯ সনের কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু করে হিজরী ৬১ সন পর্যন্ত প্রায় ৩২ বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলী ৩৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত পঞ্চম খণ্ডটি রচিত হয়। আলোচনার ধারাবাহিকতা, যেমন- উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, হযরত উসমান (রা)-এর

---

৩৯. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫-৩৮৭।

৪০. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯-৩৭১।

www.pathagar.com

আবদ্ধকরণ, তাঁর ইন্তেকাল, দাফন ও এ বিষয়ক বর্ণনা। হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত লাভ এবং তাঁর সন্তানাদি ও তৎসময়কার গৌরবান্বিত বিষয়াবলীর বর্ণনা। হযরত আলী (রা)-এর সাথে অন্যদের মত বিরোধ যেমন বসরা, জামাল, সিফ্ফীন ইত্যাদি যুদ্ধের বর্ণনা, খারিজীদের উত্থান, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর এর হত্যা, মু'য়াবিয়া এবং তাঁর সৈন্যদের মতবিরোধ, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ, হযরত আলীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত ইমাম হাসান এর খিলাফত লাভ, ইয়াযিদের ক্ষমতা লাভ, কুপার দুর্ভিক্ষ, হাজার ইবন আদীর হত্যা, ইবন উম্মে হাকামের ঘটনাসহ অন্যান্য ছোট ছোট বিষয়াবলীর আলোচনার সাথে সাথে এ সময়কালে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য বিশেষ ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে।[৪১]

খ. ৬ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

হিজরী বাষট্টিতম সন থেকে হিজরী পঁচানব্বইতম সন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং এ সময়কালের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের আলোচনা নিয়ে এ খণ্ডটি লিখিত। এতে মোট ৩৪৭ পৃষ্ঠা রয়েছে। আলোচনার ধারা, যেমন- সিরিয়ার ঘটনা, আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র, ইবনে যিয়াদ, বসরার দুর্ভিক্ষ, কুফায় শি'য়া বিদ্রোহ, আল-মালিক ইবনে মারওয়ানের খিলাফত গ্রহণ, ইবনুল যুবায়েরের কাবাঘর পুনঃনির্মাণ, মাস'আব ইবন যুবায়র হত্যা, আবদুল্লাহ ইবন মারওয়ানের যুদ্ধের জন্য ইরাক সফর, আব্দুল মালিকের কুফা অধিগ্রহণ, কুফায় হাজ্জাজের নেতৃত্ব গ্রহণ, শাবীবের কুফায় প্রবেশ, তার হত্যা, কাতারিদের ধ্বংস, ইবনুল আস'আব এবং হাজ্জাজের দ্বন্দ্ব, ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিকের খিলাফত লাভ, কুতায়বা ইবন মুসলিমের খোরাসান আগমন, আল-ওয়ালিদের দামেস্ক মসজিদ নির্মাণ, হাজ্জাজের মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে সমাপ্তি টানা হয়।[৪২]

খ. ৭ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

হাজ্জাজের মৃত্যু কাহিনী নিয়ে এ খণ্ডের আলোচনা শুরু হয়ে হিযরী ছিয়ান্নব্বইতম সনের ঘটনাবলী থেকে হিজরী একশত ছত্রিশ সনের বিষয়াবলী বর্ণনার মধ্য দিয়ে ৩৬০ পৃষ্ঠায় এ সপ্তম খণ্ড শেষ হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় সুলায়মান ইবন আবদিল মালিকের ক্ষমতা গ্রহণ, তাঁর জীবনী ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণনা। উমর ইবন আব্দুল আযীয, ইয়াযীদ ইবন আব্দুল মালিক, হিশাম ইবন আব্দুল মালিক, ইয়াযীদ ইবন ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক, মারওয়ান ইবন মুহাম্মদ ইবন মারওয়ান-এর খিলাফত গ্রহণ, তাঁদের জীবন-চরিত, এ সনগুলোর মধ্যকার বিশেষ ব্যক্তিদের হত্যা, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং ছোট খাট ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়। পরিশেষে আবুল আব্বাসের খিলাফত, আল-মানসুরের খিলাফত, এদের বায়'আত গ্রহণ ও ১৩৬ হিজরী সন পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছরের বিশেষ ঘটনাবলী ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের কাহিনী বর্ণনার মধ্যদিয়ে এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে।[৪৩]

খ. ৮ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

উক্ত খণ্ডে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৭। এ খণ্ডটি ১৩৭ হিজরী সনের আবু মুসলিম আল-খুরাসানির হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা শুরু, এর ধারাবাহিকতায় আল-মুলাব্বাদ আল-খারিজীর

৪১. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫০-৩৫২।

৪২. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪৫-৩৪৭।

৪৩. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৫৯-৩৬০।

www.pathagar.com

হত্যা, তাবারিস্তান বিজয়, বাগদাদ শহর প্রতিষ্ঠা, মানসুর এবং তাঁর সহযোগী সৎলোকদের আলোচনা, আল-মাহদীর খিলাফত লাভ, মাহদী কর্তৃক আল-রুসাফা মসজিদ নির্মাণ, পশ্চিমা বিশ্বে এবং আযারবায়জানে মাহদী কর্তৃক তার ছেলে হারুনকে মসনদে অধিষ্ঠিতকরণ, মাহদীর উদ্যোগে জিন্দীক তথা লা-মাযহাবীদের অনুসন্ধান, মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ, মূসা আল-হাদী ও আর-রশীদের খিলাফত গ্রহণ, তাঁদের জীবনালেখ্য এবং সন্তানাদী, তাঁদের বায়'আত গ্রহণসহ হিজরী ১৭৩ সন পর্যন্ত আরো ছোট খাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও উক্ত ছত্রিশ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশেষ ব্যক্তিদের জীবন-চরিত বর্ণনার এ খণ্ডের ইতি টানা হয়েছে।[৪৪]

খ. ৯ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

২৩৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ খণ্ডে ১৮৪ হিজরী সন থেকে আলোচনা শুরু হয়, যাতে রয়েছে, ইয়াহয়া ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসানের উত্থান, হামযাহ ইবন আতরাফের খুরাশানে বের হওয়া, রাশিদের মৌশিল অভিযান, আল-আমীন এবং আল-মামুনের ক্ষমতা ও বায়'আত গ্রহণ, আবু উমর আশ-শারীর হত্যা, বারামিকায় জা'ফর ইবন ইহয়াকে হত্যা, ইব্রাহিম ইবনে জাবীলের রোম দখল, রাশিদের শেষ হজ্জব্রত পালন, সাঈদ আল-জারাশীর চারশত লোক নিয়ে তাবারিস্তানে প্রবেশ এবং ইসলাম গ্রহণ, রাশিদের হিরাক্লিয়াস বিজয়, মানসুরের সর্বস্ব ধ্বংস, আমীনের খিলাফত লাভ, হারসামার সামারকন্দে প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনাবলী আলোচনায় ১৯৩ হিযরী সন পর্যন্ত সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। পরিশেষে নাকফুর কর্তৃক রাহান নামক যুদ্ধে রোমের বাদশাহ্কে হত্যা করার বিষয় বর্ণনা করে উক্ত নয় বছরে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য বিশেষ ব্যক্তিদের কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনায় এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে।[৪৫]

খ. ১০ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

১৯৪ হিজরী সনের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে এ খণ্ডের আলোচনা শুরু করা হয়, যাতে রয়েছে মুহাম্মদ কর্তৃক তার ভাইদের প্রত্যাখ্যান, আল আমীন এবং আল মামুনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, আমীন কর্তৃক মামুন ও কাশেমের জন্য দোয়া নিষিদ্ধকরণ, সিরিয়ায় সাফানীর উত্থান, মামুন কর্তৃক আল-ফযল এর মর্যাদা বৃদ্ধি, ইরাক থেকে কাশেম ও মানসুরের প্রস্থান, বাগদাদে তাহির, হারসামাহ, যুহায়র, মুহাম্মদ ইবন হারুনের বন্দী, মুহাম্মদ ইবন হরুনের হত্যা, মামুনের খিলাফত লাভ, হারসামার নিকট মামুনের চিঠি। মুহাম্মদ, ইসমাঈল, ইব্রাহিম ইবন মূসার ইয়ামেন গমন। খলীফা আল-মামুনের ব্যক্তিত্ব, বাওয়ান বিনতিল হাসান ইবন সাহালের সাথে তাঁর বিবাহ বন্ধন, মামুনের ইরাক গমন, মামুন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতায়ন এবং অন্যান্য ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে সাথে গত ২২ বছরে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে খলীফা আল-মামুনের রোমে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে ২৮৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ২১৬ হিযরী সন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ আলোচনায় এ খণ্ডের ইতি টানা হয়।[৪৬]

খ. ১১ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

হিজরী ২১৭ সন থেকে আলোচনা শুরু করে হিজরী ২৪৭ সন পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর কালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাহিনী প্রবাহ বর্ণনায় ৩৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই একাদশ খণ্ডটি রচিত হয়। যাতে

---

৪৪. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৫৫-৩৫৮।

৪৫. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

৪৬. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৮৩-২৮৬।

www.pathagar.com

রয়েছে, মামুন কর্তৃক আলী ইবন হিশামের হত্যা, বসরায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, মামুনের মৃত্যু, মু'তাসিমের খিলাফত ও বায়'আত গ্রহণ, বাবেকের ঘটনা, জাফর ও আল-আফসীনের উপর মু'তাসিমের রাগান্বিত হওয়া, কারখ ধ্বংস, মু'তাসিমের মৃত্যু। আল-ওয়ালিদের ক্ষমতা গ্রহণ ও অন্যান্য ঘটনা। আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট বর্ণনা, বাগার আগমন, আল-মুতাওয়াফ্ফাহ কর্তৃক হুসাঈন ইবন আলী (রা)-এর কবর ধ্বংসকরণ নির্দেশ। পারস্য, রোম, খোরাসানে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তাঁর দামেস্কে প্রবেশ, খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের অন্য সকল কৃতকর্ম জীবন-চরিত নিয়ে আলোচনা এবং উক্ত ত্রিশ বছরের মধ্যকার মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিবর্গের আলোচনা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। পরিশেষে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বর্ণনার মধ্য দিয়ে এ খণ্ডের ইতি টানা হয়।[৪৭]

খ. ১২ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

৪২৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ বারতম খণ্ডে ২৪৮ হিজরী সন থেকে আলোচনা শুরু করে ২৮৯ হিজরী সন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া হয়, যাতে রয়েছে মুস্তাঈনের খিলাফত লাভ, আলী ইবন ইয়াহয়া আল-আরমানির হত্যা, আল-মুতাযের খিলাফত লাভ, ঈসা ইবন জা'ফর ও আলী ইবন যায়দের উত্থান, আল-মাহদী বিল্লাহর খিলাফত গ্রহণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বর্ণনা, আল-মুতামাদ 'আলাল্লাহর খিলাফত গ্রহণ ও এ বিষয়ক ঘটনাবলী ও তাঁর মৃত্যু, আল-মুতাদ বিল্লাহর খিলাফত লাভ ও তাঁর শাসন আমল, মিশর থেকে ইবনুল জাস্‌সাসের আগমন, মু'তাযাদ কর্তৃক মু'আবিয়া ইবন আবী সুফিয়ানকে খুতবায় অভিসম্পাত প্রদান রীতির প্রচলন, সূর্যগ্রহণসহ অন্যান্য বিশেষ ঘটনাবলী এবং উক্ত ৪১ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা করা হয়, পরিশেষে কারামিতা ও কুফার কাহিনী আলোচনার মধ্য দিয়ে এ খণ্ডের যবনিকা টানা হয়।[৪৮]

খ. ১৩ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

আল-মুকতাফী বিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ দিয়ে এ খণ্ডের সূচনা হয়, যাতে আরো রয়েছে সুলতান এবং কারমিতার ঘটনা, হুসায়ন ইবন যাকারিয়ার উত্থান, মুকতাদির বিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, মানসুর আল-হল্লাজের বর্ণনা, পারস্য, রোম, মালতিয়ার বর্ণনা, আল-কাহির বিল্লাহ্‌র খিলাফত লাভ, আর-রাদী বিল্লাহ্‌র খিলাফত লাভ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রবাহের আলোচনার সাথে সাথে ২৯০ হিজরী সন থেকে ৩২৯ হিজরী সন পর্যন্ত প্রায় ৩৯ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন-চরিত বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে ৪০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ ত্রয়োদশ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে।[৪৯]

খ. ১৪ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

উক্ত খণ্ডে আল-মুত্তাকী বিল্লাহর খিলাফত লাভের বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়, যাতে ৩৩১ হিজরী সন থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়ে ৩৮৭ হিজরী সন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার এ চৌদ্দতম খণ্ডে মুত্তাকী বিল্লাহ্‌র জীবন-চরিত, কার্যকলাপ, বাগদাদের ঘটনা, আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, মুসতাকফী কর্তৃক নিজেকে 'আল-ইমামুল হক' ঘোষণার রোমাঞ্চকর কাহিনীর বর্ণনা, আল-মু'তিয়ের

৪৭. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৬৯-৩৭২।
৪৮. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪২৫-৪২৮।
৪৯. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪০৫-৪০৮।

www.pathagar.com

খিলাফত লাভ, রোম ট্র্যাজেডি, হাজরে আসওয়াদের বর্ণনা, কারখের মহাকেলেংকারী, রক্ত ও পঙ্গ-পালের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আযাব, বাগদাদে ভূ-কম্পন, ধ্বংসযজ্ঞ, আল-মুতানাব্বীর হত্যা, আত্-তাঈ লিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, আল-কাদীর বিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবহুল বর্ণনার সাথে সাথে প্রায় ৫৬ বছরের মধ্যকার মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিত্ব ও স্মরণীয় অন্যান্য ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এ খণ্ডের ইতি টানা হয়।[৫০]

খ. ১৫ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

হিজরী ৩৮৮ সন থেকে আলোচনা শুরু করে হিজরী ৪৪৭ সন পর্যন্ত ঘটমান বহুল আলোচিত বিষয়াবলী নিয়ে প্রায় ৩৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ খণ্ডখানা রচিত হয়েছে। যাতে রয়েছে- আল-কাদির বিল্লাহ্ কর্তৃক আবুল হাসান আলীর বন্দীকরণ, সিজিস্থানে সোনার খনির সন্ধান, কাদির বিল্লাহ্‌র সাথে খোরাসানীদের বৈঠক, দ্রবণীয় তারকার উদয় হওয়া, কারখ অধিবাসী এবং ফকীহগণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, দজলা নদীর পানির সংকট, শি'য়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মুশাররাফুদ্দৌলার মৃত্যু, আল-কায়িমের খিলাফত লাভ, আবুল হাসান আল-আশ'আরীর ঘটনা, পুনরায় শি'য়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি বর্ণনার সাথে সাথে উক্ত ৫৯ বছরের মধ্যকার মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনালেখ্য লেখনীর মধ্য দিয়ে এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে।[৫১]

খ. ১৬ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

এ খণ্ডে ৪৪৮ হিজরী সনের ঘটনাবলী থেকে আলোচনা শুরু করে ৪৮৫ হিজরী সন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রয়েছে, খলীফা আল-কায়িম বিল্লাহ্‌র বিভিন্ন নির্দেশ, খলীফা তনয়ার বিবাহ, ইনতাকিয়্যা এবং লাথিকিয়্যার ভূ-কম্পন, মু'তাযিলা মাযহাব নিয়ে আলোচনা, যিমিয়্যা মাদরাসার কার্যাদী, ইমাম আবু হানিফার বর্ণনা, ফিলিস্তীন ধ্বংস, রোম সমস্যা, বায়তুল মাকদাস বিজয়, আল-মুকতাদিরের খিলাফত লাভ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, বাগদাদে দুর্ভিক্ষ, কারখবাসী এবং আহলুস সুন্নাহ্‌র মাঝে মতবিরোধ, আবু মুহাম্মদ আত-তামীমীর উত্থান, ইলমুন্‌নাহু শাস্ত্রে প্রণয়ন, আবু হামিদ আল গাযালীর আগমন, মু'আল্লা নদের বিপর্যয় ইত্যাদি ঘটনাবহুল আলোচনা নিয়ে প্রায় ৩৭ বছরের মধ্যকার মৃত্যুবরণকারী এবং ঘাতক কর্তৃক নিহত ব্যক্তিবর্গের আলোচনার মধ্যদিয়ে ৩২০ পৃষ্ঠা এ খণ্ডের ইতি টানা হয়।[৫২]

খ. ১৭ : এ খণ্ডে আলোচ্য বিষয়াবলী

হিজরী ৪৮৬ সনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী দিয়ে আলোচনা শুরু করে হিজরী ৫৩৩ সন পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এ খণ্ডে। যাতে রয়েছে তাযুদ্দৌলার বক্তৃতা, পশ্চিমা বিপর্যয় আল-মুসতাযহির বিল্লাহ্‌র খিলাকত লাভ, ঝড়ো হাওয়া বিষয়ে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী, আশুরা দিবসের বর্ণনা, সত্তর জন মুসলিম হত্যার ট্রাজেডি, নাহাওয়ান্দের নবুয়তদাবীদার, গাল্লাত ধ্বংস, সিরিয়ার বাদশাহগণ, বাগদাদের আলোচকবৃন্দ, বাগদাদে ভূ-কম্পন, আরাফার দিন, আল-মুসতারসিদ বিল্লাহ্‌র খিলাফত লাভ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, বাগদাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আর-রাশিদ-এর খিলাফত গ্রহণ ও তাঁর জীবনালেখ্য, আল-মুকতাফী বিল্লাহ্‌র খিলাফত লাভ ও তাঁর কার্যাদী

---

৫০. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩৯৭-৪০০।

৫১. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩৫৪-৩৬০।

৫২. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩১৬-৩২০।

www.pathagar.com

ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী আলোচনার সাথে সাথে দীর্ঘ ৪৭ বছরের ঘটনাবহুল জীবনী আলোচনার এবং অন্য সকল মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ৩৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ সতেরতম খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে।[৫৩]

খ. ১৮ : এ খণ্ডের আলোচ্য বিষয়াবলী

২৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ আঠারতম খণ্ডের লেখনী শুরু হয় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দিয়ে, যাতে হিজরী ৫৩৪ সনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে হিজরী ৫৭৪ সনের ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচনার মধ্য দিয়ে এ খণ্ডের সমাপ্তি এবং 'আল-মুনতাজাম' গ্রন্থখানার ইতি টানা হয়। যাতে রয়েছে, নাহওয়ানের সম্রাজ্ঞী খাতুনের প্রবেশ, ইব্রাহিম আস-সুহায়লির মৃত্যু, সুলতান মাসউদের বর্ণনা, আর-রাহা বিজয়, সুলতান মাসউদের বাগদাদ প্রবেশ এবং প্রস্থান, খলীফা কন্যা এবং ইয়াকুব আল খাত্তাবীর মৃত্যু, আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ্‌র খিলাফত গ্রহণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বর্ণনা, জা'ফর ইবন আস-সাকাফীর জীবনালেখ্য, আল-মুস্তাযী বিল্লাহ্‌র খিলাফত লাভ ও তৎবিষয়ক বর্ণনা, কারখবাসী এবং বসরাবাসীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, আমীর আল-মামুনের সমীপে ইবনুল জাওযীর বক্তব্য, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের কবর পাশে নাম ফলক স্থাপনসহ অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনাসহ উক্ত ৪০ বছরের মধ্যকার মৃত্যুবরণকারী বহুল আলোচিত ব্যক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থখানার যবনিকা টানা হয়।[৫৪]

আলোচনার শেষ কথা

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, 'ইবনুল জাওযী' রচিত 'আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম' একটি অসাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ, এর প্রাথমিক অধ্যায়গুলো সংক্ষেপে ইবন জারীর তাবারীর তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক হতে গৃহীত, পরবর্তী অংশ যাতে ২৫৭/৮৭১ হতে ৫৭৩/১১৭৭ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস রয়েছে, যা ইবনুল জাওযীর সময়ের মৌলিক ঐতিহাসিক দলীলরূপে গণ্য করা যায়। এতে বিশেষ করে খুরাসানের সালজুকীদের ইতিহাস এবং আব্বাসী খলীফাদের সাথে তাদের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে আলোচনার চেয়ে বিভিন্ন ঘটনা বেশি স্থান পেয়েছে, যেমন- বাগদাদসহ অন্যান্য স্থানে ঘটমান কাহিনীগুলোর বংশানুক্রমে বর্ণনা ও উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। যার সব তত্ত্ব এবং তথ্য নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে এটি ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে অন্তত সঠিক দিক নির্দেশনার ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

---

৫৩. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৩৪৩-৩৪৮।
৫৪. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাজাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ২৫৬-২৬০।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

আল্লামা কুরতুবী (র) ও তাঁর তাফসীর পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ*
মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী**

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে স্পেন ও আরব বিশ্বে যে ক'জন মুসলিম মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল আল্লামা কুরতুবী (র) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে মালিকী মাযহাবের এ মহামনীষী ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে তীব্র সোচ্চার, সমাজ ও দীনের সংস্কারক, হাদীসবিশারদ, তাফসীরকার ও মালিকী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ। তিনি ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাফসীর রচনা করে তৎকালে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের অনবদ্য সৃষ্টি হলো, "আল্ জামিউ' লি আহকামিল কুর'আন ওয়াল মুবায়্যিনু লিমা তাদাম্মানা মিনাস্ সুন্নাতি ওয়া আয়া আল ফুরকান" নামক তাফসীর গ্রন্থ। তাঁর এ তাফসীর সাহিত্য তাঁকে সুখ্যাতির উচ্চ আসনে সমাসীন করেছে।

আল্লামা কুরতুবী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

আল্লামা কুরতুবী (র)-এর প্রকৃত নাম 'মুহাম্মদ' ও উপনাম 'আবু আব্দুল্লাহ'। তাঁর বংশক্রম হলো- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবু বকর ইবন ফারহ আল আনসারী, আল্ খাযরাজী, আল্ আন্দালুসী, আল কুরতুবী (র)।[১] তবে তিনি ইমাম আল কুরতুবী নামে সুপরিচিত।

আল্লামা কুরতুবী (র) স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন এবং শৈশবকাল স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে অতিবাহিত করেন। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা বাল্য চরিত্রেই উন্মেষিত হয়েছিল, যা উত্তরকালে তাঁকে জ্ঞান তাপস ও ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের প্রতিও তাঁর প্রবল ঝোঁক ও উচ্চাভিলাষ ছিল।[৩] এ সম্পর্কে আল্‌যাহাবীর ভাষ্য

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** প্রভাষক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আবদুর রহমান, জালাল উদ্দীন, আল্ সুয়ূতী, *তাবকাত আল মুফাসসিরীন* (স্থান অনুল্লেখিত, মাকতাবাত ওয়াহবা, ১৯৭৬ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৯২।

২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদিত, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯০ খ্রি., ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৩. আল-মাক্কারী, *নফহু আলতীব*, বৈরুত : দার সাদির, ১৯৬৮ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০।

www.pathagar.com

হলো- তিনি ভ্রমণ করেন, রচনা করেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৪] তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে স্পেন থেকে প্রাচ্যে গমন করেন এবং মিসরের উজান অঞ্চলে "মুন'য়াতি বানী খাসীব"[৫] নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। আজীবন তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন।[৬] তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে জগত বিখ্যাত মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সম্পর্কে আল-যাহাবী'র ভাষ্যটি প্রণীধানযোগ্য,—"আল-কুরতুবী (র) ছিলেন পাণ্ডিত্যের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী এবং একজন ইমাম এবং বিদ্যার মহাসাগর।"[৭] তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শায়খ আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্ন ওমর আল্ কুরতুবী,[৮] শায়খ আল-হাফিয আবু আলী আল হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল বিকরী, শায়খ আল হাফিয আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হাফস আল ইয়াহসিবী,[৯] শায়খ ইব্ন রাওয়ায,[১০] শায়খ আল-জামিযী,[১১] প্রমুখ।[১২]

আল্লামা কুরতুবী (র) তাফসীর, হাদীস ফিকহ্ ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য অর্জনের ফলে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন স্পেনের কর্ডোভা নগরীর ইমাম এবং মালিকী মাযহাবের ফকীহ, হাদীসবেত্তা ও পবিত্র কুরআনের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাতা।[১৩] তিনি সরকারী কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও জীবনের সর্ব

---

৪. মুহাম্মদ ইবন আহমদ, শামস উদ্দীন, আবু আব্দুল্লাহ্, আল্ যাহাবী, *তারিখ আল ইসলাম,* তাহকীক : ড. আব্দ আল্সালাম তাদমীরী), স্থান অনুল্লেখিত, দার আলকুতুব আলআরাবী, তা.বি., পৃ. ১১৫।

৫. 'মুনয়া'তি বাণী খাসীব'- মিসরের নীল নদের তীরে অবস্থিত একটি বৃহত্তর মনোরম শহর। (ইয়াকুত ইব্ন আব্দুল্লাহ, শিহাব উদ্দীন, আবু আব্দুল্লাহ, আলহামুবী, *মু'যাম আল-বুলদান,* (স্থান অনুল্লেখিত : দার সাদির, তাবি), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৮।

৬ ইব্ন আল্ইমাদ আলহাম্বালী, *শাযারাহ আলযাহাব,* (কায়রো : নাশরাত আল কুদসী, ১৩৫০ হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

৭. আল যাহাবী, *তারিখ আল ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৮. তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। ৫৭৮ হিজরীতে কর্ডোভায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫৬ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষার একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং আল্লামা কুরতুবী (র)-এর হাদীসের শিক্ষকদের অন্যতম। *ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৯. শায়খ মুহাম্মদ কারীম রাজিহ, *মুখতাসার তাফসীর আল কুরতুবী,* বৈরুত : দার আল কিতাব আল আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

১০. তাঁর প্রকৃত নাম রশীদুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহহাব ইব্ন রাওয়ায আল্ ইয্দী আল্ মালিকী, (মৃ. ৬৪৮ হি.)। মুহাম্মদ ইবন আহমদ, শামস উদ্দীন, আবু আব্দুল্লাহ, আল যাহাবী, *সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা,* স্থান অনুল্লেখিত : মুয়াস্সাসাত আল্ রিসালা, তা.বি., ২৩ খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

১১. তাঁর প্রকৃত নাম বাহা উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন সালামাহ, আল-লাখমী, আল-মিসরী, আল-শাফিয়ী, *সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২৩ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

১২. আবদুর রহমান, জালাল উদ্দীন, আল্ সুয়ূতী, *তাবকাত আল মুফাস্সিরুন,* (স্থান অনুল্লেখিত, মাকতাবা ওয়াহবা, ১৯৭৬ খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ৯২।

১৩. ইব্রাহীম ইব্ন আলী ইব্ন ফারহান, বুরহান উদ্দীন, *আল দীবাজ আল্মায ফী মা'রিফাতি আয়া আল*

www.pathagar.com

সময়ে ব্যস্ত থাকতেন। তবে তাঁর এ ব্যস্ততা ছিল ইবাদতে, কিংবা লিখালিখিতে।[১৪] তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও ফিকহসহ ইসলামী উলূমের বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য।

১. আল জামিউ' লি আহকামিল কুরআন ওয়াল মুবায়্যিনু লিমা তাদাম্মান মিনাস্ সুন্নাতি ওয়া আয়া আল ফুরকান (الجامع لاحكام القران والمبين لما تضمن من السنة واى الفرقان)

২. শারহু আসমায়িল্লাহিল হুসনা (سرح اسماء الله الحسنى)

৩. আত্ তাযকার ফী আফদ্বালিল আযকার (التذكار فى افضل الاذكار)

৪. আত্ তাযকিরাতু বি উমূরিল আখিরা (التذكرة بامور الاخرة)

৫. শারহুত তাকাস্সী (شرح التقصى)

৬. কামউল হারস বিয্যুহদি ওয়াল কানা'আতি ওয়া রাদ্দি ওয়া যিল্লিস সুআল বিল কুতুবি ওয়াশ শাফা'আত (قمع الحرص بالزهدو القناعة وردذل السو ال بالكتب والشفاعة)

৭. উরজূযা (ارجوزة) ইত্যাদি।

আল্লামা কুরতুবী (র) ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও আন্তরিক বন্ধুভাবাপন্ন এবং মিষ্টিভাষী। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন এবং কটু ভাষা বা বাক ব্যবহার পরিহার করতেন। তিনি ছিলেন পরহেযগার আল্লাহ্ভীরু, অল্পেতুষ্ট, পার্থিব লোভ-লালসা মুক্ত ও রাসূল (সা) প্রেমিক। তাঁর হৃদয়ে রাসূল প্রেম ছিল সাগরতুল্য। ফরয ইবাদতের সাথে সাথে তিনি প্রতিনিয়ত নফল ইবাদতে মশগুল থাকতেন। জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সুন্নাতে মুস্তাফা (সা)-এর অনুসরণ করতেন এবং ভক্তবৃন্দের সার্বিক জীবনে সুন্নাতে মুস্তাফা (সা)-এর পাবন্দ হওয়ার নির্দেশ দিতেন। তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা, তথা সার্বিক জীবনে সীরাতে নববী (সা)-এর বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হতো। তিনি ব্যক্তি স্বার্থ, আত্মগৌরব, অপরের অবমূল্যায়ন, গীবত বা আত্মঘাতি পরিনন্দা পরিহার করে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসতেন এবং অন্যদেরকে নসীহত করতেন। বিবেকবান বিদ্বান হওয়ার পাশাপাশি পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। একখানা মাত্র বস্ত্র পরিধান করতেন, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টুপি দিয়ে লোকসমক্ষে উপস্থিত হতেন।[১৫] পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করে এ মনীষী ৬৭১ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মিসরের উজান অঞ্চলে "মুনয়া'তি বানী খাসীব" নামক স্থানে দাফন করা হয়।[১৬]

মাযহাব (তাহকীক : মুহাম্মদ আল আহমদী আবু আল নূর), কায়রো : দার আল তুরাস, তা.বি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮।

১৪. শায়খ মুহাম্মদ কারীম রাজিহ, *মুখতাসারু তাফসীর আল কুরতুবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; সালাহ আল দীন খলীল ইবন আইবেক সাফিদী, *আল্ওয়াফী বি আল ওয়াফিয়াত* (স্থান অনুল্লেখিত : আলম'আনিয়্যা জামই'য়্যা আলমুশতাশরিকীন, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

১৫. শায়খ মুহাম্মদ কারীম রাজিহ, *মুখতাসারু তাফসীর আল কুরতুবী,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩; ইসমাঈল পাশা আলবাগদাদী, *হাদয়া আল আ'রিফীন* (ইস্তাম্বুল : ১৯৫১ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।

১৬. জালাল উদ্দীন, আল্ সুয়ূতী, তাবকাত মুফাস্সিরীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল

www.pathagar.com

আল্লামা কুরতুবী (র)-এর তাফসীর পদ্ধতি

আল্লামা কুরতুবী (র)-এর কর্মজীবনে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি হলো "আল-জামি'উ লি আহকামিল কুর'আন ওয়াল মুবাইয়্যিন লিমা তাদাম্মানা মিনাস-সুন্নাতি ওয়া আয়া আল ফুরকান"।[১৭] তবে এটা "তাফসীর কুরতুবী" সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আহকাম সম্পর্কিত বিষয়সহ শানে-নুযুল ও তাফসীরের মাধ্যমে নির্গত আহকামসমূহ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আহকামুল কুরআন বিষয়ক রচিত তাফসীর গ্রন্থাদির মধ্যে এটা একটি বৃহত্তর গ্রন্থ। প্রাচীন এ তাফসীরটি সম্প্রতি বৈরুতের 'দারু ইয়াহ্ইয়াউত তুরাসিল আরাবী' থেকে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পদ্ধতিগত মান ও বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে মুসলিম পণ্ডিতদের নিকট এ তাফসীরটি আহকাম বিষয়ক শ্রেষ্ঠ তাফসীর অর্থাৎ তথ্যসমৃদ্ধ তাফসীর বলে বিবেচিত হয়েছে। আল্লামা ইব্ন ফারহুন উক্ত তাফসীর সম্পর্কে বলেন, মাহাত্ম্য ও উপযোগিতার মানদণ্ডে এ তাফসীর গ্রন্থ সর্ববৃহৎ তাফসীর গ্রন্থাদির মধ্যে অন্যতম।[১৮] নিম্নে আল্লামা কুরতুবী (র)-এর তাফসীরের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরা হলো।

১. আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে শুধু আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসীর করে ক্ষান্ত হন নি; বরং আল কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতের তাফসীরও করেছেন। তবে অত্র তাফসীরে ফিকহ বিষয়ক মাসআলা-মাসায়িল প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে এ তাফসীরকে ফিক্হী তাফসীর বা আহকাম বিষয়ক তাফসীর হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. আলোচ্য তাফসীরের সূচনায় তাফসীরকার কর্তৃক লিখিত ইলমে তাফসীর বিষয়ক যে অনবদ্য ভূমিকাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা তাফসীর সাহিত্যে পবিত্র কুরআনের অন্যান্য ভাষ্যকার ও পাঠক সমাজের জন্য পাঞ্জেরীর ভূমিকা হিসেবে কাজ করছে।

৩. এ তাফসীরে প্রাসঙ্গিক এক বা একাধিক আয়াত চয়নপূর্বক এগুলোর তাফসীরকে কয়েকটি মাস'আলায় বিভাজন করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মাস'আলা ইত্যাদি ক্রমানুসারে সজ্জিত করা হয়েছে।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম মাস'আলায় সংশ্লিষ্ট আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ বিবৃত হয়েছে।

৫. তাফসীরকার এ তাফসীরে 'ইরাব' বা স্বরচিহ্ন, 'কিরআত' বা পবিত্র কুরআনের পঠননীতি, 'শানে নুযুল বা আয়াত অবতরণের উপলক্ষ বা মাহাত্ম্য, 'কিস্সা-কাহিনী' বা আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী দ্বারা তাফসীরকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

নাদাবী, তাবকাত আল্ মুফাস্সিরীন, (আল মদীনা আল মুনাওয়ারা : মাকতাবাত আল'উলূম ওয়া আল হিক্মা, ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ২৪৭; ইব্রাহীম ইব্ন আলী ইব্ন ফারহান, আল দীবাজ আল্ মাযহাব ফী মা'রিফাতি আয়া আল মাযহাব, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮।

১৭. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, আবু আবদুল্লাহ আল কুরতুবী, *আল জামিউ' লি আহকাম আল কুরআন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

১৮. ইব্রাহীম ইব্ন আলী ইবন ফারহান, *আল দীবাজ আল মাযহাব ফী মা'রিফাতি আয়া আল মাযহাব* (কায়রো : মাকতাবাত আল সা'আদা, ১৩১৯ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আল্ যাহবী, *আল তাফসীর ওয়া আল মুফাসসিরূন* (পাকিস্তান : ইদারা আল কুরআন ওয়া আল উলূম আল ইসলামিয়্যা, ১৯৮৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

www.pathagar.com

৬. তাফসীরকার 'নাসিখ' বা রহিতকারী আয়াত, 'মানসুখ' বা রহিতকৃত আয়াত, 'মুহকাম' বা সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত, 'মুতাশাবিহ'-বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের পার্থক্য নির্ণয় করে তাফসীর করার চেষ্টা করেছেন।[১৯]

৭. আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় তাফসীর সাহিত্যকে অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কিত রচনাবলী এবং আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থাদি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে ভাষাতত্ত্বের সৌন্দর্য ও রচনাশৈলী সংক্রান্ত আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন।[২০]

৮. তিনি হাদীসের মাধ্যমেই অধিকাংশ আয়াতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[২১] পবিত্র কুরআনের তাঁর ভাষ্যে এমন অনেক হাদীস দৃষ্ট হয়, যা ইমাম তাবারী (র) উল্লেখ করেন নি। তাঁর উদ্ধৃত অধিকাংশ হাদীস 'সিহাহ সিত্তাহ' ও 'মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক' (র) থেকে গৃহীত। এ প্রসঙ্গে "আহকামুল কুরআন" গ্রন্থের মুকাদ্দামায় তিনি বলেন,

وشرطى فى هذا الكتاب اضافة الاقوالى قائلهاو الاحاديث الى مصنفها.[২২]

'আমি যে নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তা হলো উদ্ধৃতি দিয়ে আলিমদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি এবং হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে হাদীস ব্যবহার করেছি।'

৯. তিনি বহু ফিক্হী মাস'আলা সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে আল বারদুনী উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থখানি এরূপ যে, এর পাঠক অনেকাংশে ফিকহ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ পরিত্যাগ করতে পারে।[২৩]

১০. তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে আরবী কবিতার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ[২৪] এ 'মুত্তাকীন'-এর ব্যাখ্যা করতে তিনি কবি নাবিগের বাণী উল্লেখ করেছেন।

سقط للنصيف ولم ترد استاطه* فتناو لته واتقتنا باليد.[২৫]

১১. তিনি তাঁর তাফসীরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন মুতাযিলা, জাবারিয়া, কাদারিয়া, রাওয়াফিয, দার্শনিক ও চরমপন্থী সূফীবাদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। সাথে সাথে আল কুরআনের ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করত সুন্নী দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী —

---

১৯. মান্ন' আল্কাত্তান, *মাবাহিস ফী 'উলূম আল কুরআন,* (রিয়াদ : মাকতাবাত আল মা'আরিফ, ১৯৮১ খ্রি.), ৮ম সং, পৃ. ৩৮০।

২০. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

২১. মান্ন' আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০; ড. হুসাইন আল যাহাবী, *আল তাফসীর ওয়া আল মুফাসসিরুন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

২২. মুহাম্মদ ইবন আহমদ, আবু আবদুল্লাহ, আল কুরতুবী, *আল জামিউ' লি আহকাম আল কুরআন* (বৈরুত : দার আল্ ইলম লি আল মাল্লায়্যিন, ১৯৮৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৬।

২৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২৪. আল কুরআন, ২ : ২।

২৫. শায়খ মুহাম্মদ করীম রাজিহ, *মুতাসারু তাফসীর আল কুরতুবী,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.[২৬]

'আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তকরণ এবং কানসমূহ সীলমোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি কাদারিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা বর্জন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[২৭]

১২. তিনি দার্শনিক ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেকাংশে আল্লামা ফখরুদ্দীন আল্ রাযী (র)-এর তাফসীর পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী [২৮]

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি চিরঞ্জীব অন্যকে কায়িম রাখেন। এ আয়াতে القيوم। (আল-কায়ুম) শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা করার সময় ইমাম আল রাযী (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইব্ন সীনার ব্যাখ্যার অনুসরণে القيوم لذاته। (আল কা'ইউয়ূম লি-যাতিহী), অর্থাৎ যিনি নিজে নিজেই আছেন অর্থ বুঝায় বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯]

১৩. তিনি আল কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অনেক মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ভাষাবিদ, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বনামধন্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উক্তির উপর নির্ভর করেছেন। মুফাস্সিরগণের মধ্য থেকে ইমাম ইব্ন জারীর আত্তাবারী, ইব্ন আতিয়্যা, ইবনুল আরাবী, আল-কাইয়্যা আল-হাররাসী, আল-জাস্সাস প্রমুখের উক্তি অধিক উল্লেখ করেছেন।[৩০]

১৪. আল্লামা কুরতুবী (র) আল কুরআনের তাফসীরকালে বানোয়াট কিস্সা-কাহিনী ও ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা তথা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সাধ্যমত নিবৃত্ত থাকতেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন তা বর্ণনা থেকে নিবৃত্ত হননি। ফলে তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী রিওয়ায়েত তেমন স্থান না পেলেও কিছু স্থানে তা বিদ্যমান। যেমন, 'আসহাব-ই-কাহাফ'-এর কুকুর সম্পর্কীয় অলীক বর্ণনা।[৩১] এ পৃথিবী এক মাছের পিঠের উপর স্থাপিত ;[৩২] আদম (আ)-এর খাদিমরূপী সাপ[৩৩] ইত্যাদি কতিপয় কাল্পনিক বর্ণনা, যা তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারতেন।

---

২৬. আল কুরআন, ২ : ৭।

২৭. শায়খ মুহাম্মদ করীম রাজিহ, *মুতাসারু তাফসীর আল কুরতুবী,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪।

২৮. আল কুরআন, ২ : ২৫৫।

২৯. শায়খ মুহাম্মদ করীম রাজিহ, *মুখতাসারু তাফসীর আল কুরতুবী,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৩০. মুহাম্মদ ইবন আহমদ, আবূ আবদুল্লাহ, আল কুরতুবী, *আল জামিউ' লি আহকাম আল কুরআন* (বৈরুত : দার ইয়াহইয়া আল তুরাস আল আরাবী, ১৯৯৫ খ্রি.), ২৪ খণ্ড, পৃ. ১৯৫-২২১; ড. হুসাইন আল যাহাবী, *আল তাফসীর ওয়া আল মুফাস্সিরুন,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯।

৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, আবু আবদুল্লাহ, কুরতুবী, *আল জামিউ' লি আহকাম আল কুরআন,* প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

৩২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩।

www.pathagar.com

১৫. আল্লামা কুরতুবী (র) তাফসীর করতে গিয়ে বিভিন্ন ফিক্‌হী মাস'আলার সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাকেও উল্লেখ করে প্রত্যেক মাযহাবের দলীলসমূহও উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর তিনি অধিকাংশ ফিক্‌হী মাস'আলায় নিজ মাযহাবের (মালিকী) প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মাযহাবী গোঁড়ামীর মায়াজাল ছিন্ন করে অন্য মাযহাবের মতকেও প্রাধান্য দিয়েছেন[৩৪] যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ[৩৫]

'রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালার করা হয়েছে।'

এ আয়াতে ব্যাখ্যায় রমযান মাসের দিনে ভুলক্রমে পানাহার করলে রোযাদারের রোযার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মত উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইমাম মালিক (র)-এর মতে রোযাদারের রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার কাযা করতে হবে। অপর দিকে একদল আলিমের মতে, উক্ত রোযাদারের রোযা পূর্ণ হবে। তার কোন কাযা করতে হবে না। আল্লামা কুরতুবী (র) এ ক্ষেত্রে স্বীয় মাযহাবের ইমামের মত গ্রহণ না করে যাঁরা বৈধতার মত পোষণ করেছেন, তাঁদের মত গ্রহণ করে নিম্নোক্ত হাদীস দিয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل الصاءم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله تعالى اليه ولا قضاءعليه.[৩৬]

'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন কোন রোযাদার ভুলবশত খেয়ে নিবে অথবা পান করে নিবে এটা শুধুমাত্র রিযক, যা আল্লাহ তাকে ভক্ষণ করিয়েছেন। এ জন্য তাকে কাযা করতে হবে না।'

অনুরূপ আল্লাহ্‌র বাণী

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ[৩৭]

'আর নামায কায়িম কর, যাকাত আদায় কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অপ্রাপ্ত বয়স্কের পিছনে নামায পড়া যাবে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করে আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় মাযহাবের ইমামের মত গ্রহণ না করে যাঁরা বৈধতার মত পোষণ করেছেন তাদের মত গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (র) নিম্নোক্ত উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা তাঁর গৃহীত মতকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

---

৩৪. মান্ন' আল কাত্তান, *মাবাহিস ফী 'উলূম আল কুরআন,* (রিয়াদ : মাকতাবা আল মাআ'রিফ, ১৯৭১ খ্রি.), ৮ম সং, পৃ. ৩৮০।

৩৫. আল কুরআন, ২ : ১৮৭।

৩৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল কুরতুবী, *আল জামি'উল আহকাম আল কুরআন,* (দার আল-কুতুব, ১৯৩৫-১৯৪৫ খ্রি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২।

৩৭. আল কুরআন, ২ : ৪৩।

www.pathagar.com

عن عمرو بن سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثر كم قرانا قال عمرو بن سلمة فنظر قومى فلم يكن احد اكثر منى قرانا لما اتلقى من الركبان فقدمونى بين ايديهم وانا ابن ست اوسبع.[৩৮]

'আমর ইবন সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যিনি কুরআন ভাল পড়েন তিনি যেন তোমাদের ইমামতি করেন। আমর ইবন সালমা (রা) বলেন, অতঃপর আমার সম্প্রদায় চিন্তা করে দেখল যে, আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানে এমন কেউ নেই, যখন আমি কোন আরোহী কাফেলার সাথে অবস্থান করতাম তখন তাঁরা আমাকে ইমামতির জন্য সামনে দিতেন অথচ আমার বয়স ছিল ছয় কিংবা সাত।'

১৬. আল্লামা কুরতুবী (র) পবিত্র কুরআনের ভাষ্য লিখেছেন খুবই সহজ-সরলভাবে। এ ক্ষেত্রে তিনি কাউকে কটূক্তি না করে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণে তাফসীর করেছেন। পাশাপাশি যাঁরা মুসলিম উলামার সমালোচনা করেছেন তাঁদের তিনি নিন্দা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর এ জাতীয় মত প্রতিফলিত হয়েছে।[৩৯]

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হানাফী উলামা ও অন্যান্যরা যারা 'সির্কা' না 'নবীয' কে হালাল বলেছেন, ইবনুল আরাবী তাদের বোকা কাফিরদের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (র) ইবনুল আরাবীর এ ধরনের উক্তিকে অশালীন বলে মন্তব্য করেছেন।[৪০]

১৭. কেউ কেউ মনে করেন, আল্লামা কুরতুবী (র) তাঁর তাফসীর সাহিত্যের পাশাপাশি ফিক্হী মাস'আলার পাহাড় গড়ে তুলেছেন এবং ফিক্হী মাস'আলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইব্ন কুদামা'র[৪১] ফিক্হী পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যেহেতু তিনি তাঁর পূর্ববর্তী একজন মালিকী ফকীহ ছিলেন।[৪২]

১৮. আল্লামা কুরতুবী (র) তাঁর তাফসীর সাহিত্যে যেভাবে আধুনিক তাফসীর রীতি অনুসরণ করেছেন, ঠিক তেমনি পূর্ববর্তী মনীষীদের তাফসীর রীতির সমাহার ঘটিয়েছেন। তথা প্রথমে কুরআনকে কুরআনের সাহায্যে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে কোন জটিলতা থেকে গেলে সেগুলোর সমাধান অনুসন্ধান করেছেন হুযুর (সা)-এর বাণী ও তাঁর কাজ-কর্মে। তারপরও কোন বিষয়ে বিশ্লেষণের অবকাশ থেকে গেলে তার সমাধানের উদ্দেশ্যে সাহাবা কিরাম (রা)-এর বর্ণনা-বিবৃতির সাহায্য নিয়েছেন। কারণ, কুরআন মাজীদ সেসব লোকের অবস্থা ও ঘটনাবলীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

---

৩৮. আল কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকাম আল কুরআন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৫৮।

৩৯. আল কুরআন, ১৬ : ৬৭।

৪০. আল কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকাম আল কুরআন,* প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

৪১. ইবন কুদামা, *আল মুগান্না* গ্রন্থের লেখক। তিনি ৬২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪২. ড. আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম আল ওহাবী, *আত তাফসীর বিল আসার ওয়াল, মাযাল্লাত আল ইসলামিয়া,* ৭ম সংখ্যা, (রিয়াদ : দার আল-ইফ্তা, ১৪০৩ হি.), পৃ. ২২৬।

www.pathagar.com

নিম্নোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে কুরআনের তাফসীরের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী [৪৩] اَلرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ (নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু)। এ আয়াতে প্রথমে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের দ্বারা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পবিত্র কুরআনে দু'টি আয়াত উদ্ধৃত করে তাঁর ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনে বলেছেন,

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الاَلِيْمُ.[৪৪]

'খবর দিন আমার বান্দাদেরকে যে, নিশ্চয় আমিই হই ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং আমার শাস্তিই অতি বেদনাদায়ক শাস্তি।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটি আরও সুদৃঢ় করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد.[৪৫]

'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নিশ্চয় রাসূল (সা) বলেন, যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে জানত; তাহলে কেউ তার জান্নাতের প্রত্যাশা করত না। আর যদি কোন কাফির ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কে জানত, তাহলে কেউ তার জান্নাতের আশা থেকে নিরাশ হত না।'

১৯. সর্বোপরি আল্লামা কুরতুবী (র) তাফসীর সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তিনি 'তাফসীর বিল মা'সূর' ও 'তাফসীর বির রায়'-এর সমন্বয় করেছেন। গবেষণামূলক পদ্ধতিতে সূতীক্ষ্ণ ও সুগভীর আলোচনার পাশাপাশি সহজ সরল আরবী ভাষায় তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর করেছেন, যা সাধারণ মানুষও খুবই সহজে বুঝতে পারেন।

উপসংহার

এ মহান মনীষীর জীবন, কর্ম ও তাঁর তাফসীর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন হিজরী সপ্তম শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, হাদীস বিশারদ, দীন ও মিল্লাতের পথ নির্দেশক, সংস্কারক, বিশ্লেষণধর্মী আলিম-ই দীন, ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ। তৎকালীন কর্ডোভা নগরীর মালিকী ফকীহদের ইমাম, দার্শনিক, বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার মুজাহিদ, সুন্নাতে নববী (সা)-এর উজ্জ্বল চিত্র, আধ্যাত্মিক সাধক, সুন্নী মতাদর্শের কর্ণধার তথা ইসলামের সঠিক পথ নির্দেশক ও ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গিতে পবিত্র কুরআনের সর্ব বৃহৎ তাফসীরকারক। তাঁর তাফসীর পদ্ধতি তাফসীর সাহিত্যে তাঁর সমসাময়িককালে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাফসীরকারদের জন্য অনুসরণীয় এবং আরবী তাফসীর সাহিত্যে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক বিশাল সম্পদ।

---

৪৩. আল কুরআন, ১ : ২।

৪৪. আল কুরআন, ১৫ : ৪৯-৫০।

৪৫. শায়খ মুহাম্মদ করীম রাজিহ, *মুখতাসার তাফসীর আল কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

গণিত শাস্ত্রের উদ্ভব ও উৎকর্ষ সাধনে মুসলমানদের অবদান : পর্যালোচনা

ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন*

আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হলো বিজ্ঞান। জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে মুসলমানরা পদচারঈা করেন নি। মধ্যযুগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন সমস্ত খ্রিস্টান ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং নানাবিধ পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত, তখন পশ্চিমে আন্দালুসিয়া থেকে পূর্বে খোরাসান আর গজনী পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ডে মুসলিম পণ্ডিতেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কার ও গবেষণা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বেলে রাখেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওফাতের একশ বছর পর থেকেই ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ জয় করে প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর বাণী থেকে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান চর্চার অনুপ্রেরণা পেয়ে মুসলমানরা এসব প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অজস্র মনিমুক্তা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো নিজেদের পাণ্ডিত্যের জারক রসে সিক্ত করে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান। এসব বিজ্ঞানময় আলোচনার মধ্যে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ছিল অন্যতম। নিম্নে জ্ঞান বিজ্ঞানের এসব বিষয় থেকে গণিত শাস্ত্রের উদ্ভব ও উৎকর্ষতা সাধনে মুসলমানদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

একথা অতীব সত্য যে, বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হলো গণিত শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গণিত শাস্ত্র ব্যতীত কখনই জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন হতো না। গণিত শাস্ত্রের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ঐতিহাসিক Rom Landau তাঁর 'Islam and the Arabs' গ্রন্থে বলেন, "The mother of all emperieal science is Mathmatics and Mathematics does indeed play a decisive part in around sciecne."[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আল কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. Rom Landau : Islam and the Arabs উদ্ধৃত, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬ জুন, ২০০৩, ঢাকা পৃ. ১০

www.pathagar.com

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব, কর আদায়, উত্তরাধিকার বণ্টন, ক্ষতিপূরণ, যাকাতের হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি বিষয়ের সমাধানের জন্য হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়। যার দরুন মুসলমানরা গণিত শাস্ত্র চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠে। এছাড়া পবিত্র কুরআনের ফারায়িয বা দায়ভাগের নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট গাণিতিক প্রক্রিয়ার নিদর্শন বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনের সূরা সোয়াদ-এর ১০ নং আয়াত ও সূরা মু'মিনুন-এর ৩৬-৩৭ নং আয়াতে গণিত শাস্ত্রের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন একটি অলৌকিক গাণিতিক ফর্মূলায় তৈরি। ফর্মূলাটির নাম "Numerical Valu-19"[২]। এই ফর্মূলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে আল কুরআনের বর্ণ, শব্দ এবং সূরা ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। পবিত্র কুরআনের এই গাণিতিক ফর্মূলা মুসলমানদের গণিত শাস্ত্র চর্চায় উৎসাহিত করেছে।

আরব গণিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব সক্রিয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে খলীফা আল মনসুরের (৭৫৪-৭৫ খ্রি.) রাজত্বকালে এ প্রভাবের সূত্রপাত এবং আল বেরুনীর (মৃ. ১০৫০ খ্রি.) সময় এর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। আল-বেরুনীর সংস্কৃত ভাষার পারদর্শিতা এবং ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর রচনা উপরোক্ত ধারণা সপ্রমাণ করে। কিন্তু, জুয়ান ভার্নেটের মতে- ভারতীয় জ্ঞানের এ সঞ্চরণ সরাসরি না হয়ে পারসিক সভ্যতার মাধ্যমেই হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।[৩] তবে আরব গণিতের সিংহভাগ গ্রীক ঐতিহ্য থেকে গৃহীত। এ বিষয়ের প্রায় সমুদয় গ্রীক বই আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। গণিতে ইউক্লিডের Elements, Data, Optics, এপোলোনিয়াসের Conics, The section of a Ratio; থিওডোসিয়াসের Spherics; মেনেলক্সের Spherics, Elements of Geometry, The book of Triangles প্রভৃতি বই আরবীতে অনূদিত হয়।[৪] তবে গণিতে সর্বাগ্রে আর্কিমিডিসের নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর বহু গ্রন্থ যেমন The sphere and the Cylinder, The Measurement of the circle, The equilibriusm of planes, Fleating Bodies প্রভৃতি আরবীতে অনূদিত হয়। এছাড়া আরও দশটি বই তাঁর প্রতি আরোপিত হয়। এসব বই আরবী গণিত বিদ্যার প্রারম্ভের সূচনা করে।[৫]

মুসলমানদের গণিত চর্চাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

১. পাটিগণিত, ২. বীজগণিত, ৩. জ্যামিতি, ৪. ত্রিকোণমিতি

১. পাটিগণিত ঃ গণিতের মধ্যে মুসলমানরা সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় পাটিগণিতের (আল-হিসাব) প্রতি। আল-খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) প্রথম পাটিগণিতের প্রচলন করেন। তিনি ভারতীয় গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ পদ্ধতিতে সংখ্যার সাহায্যে গণনা করা হয়। মুসলমানরা ভারতীয়দের কাছ থেকে সংখ্যাভিত্তিক গণনাপদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাদের মাধ্যমে এ পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যে প্রচলিত হয়। তাই এ সংখ্যা পাশ্চাত্যে আরব সংখ্যা নামে পরিচিত। ভারতীয় পদ্ধতির মূলকথা-সংখ্যার সঙ্গে 'শূন্যের ব্যবহার'। আরবরা শূন্যকে বলত

---

২. মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কোরআন*, (চট্টগ্রাম, ইডেন প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৯৯), পৃ. ৩৩৩।

৩. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (তা. বি.), পৃ. ১৯৪।

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

'সিফর'। বর্তমানে আরবী 'সিফর' শব্দটি ইংরেজিতে Cipher শূন্য, Ciphering অঙ্কসমাধান প্রভৃতি নামে পরিচিত। তবে সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন 'ভারতীয় সংখ্যা' বলে অভিহিত এ সংখ্যা আদৌ ভারতীয় নয়।[৬] কারও কারও মতে এসব সংখ্যা ভারতে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে ইন্দোচীনে প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়াতেও এ সংখ্যা প্রচলিত ছিল বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। পাশ্চাত্য জগতে দ্বাদশ শতাব্দীতে সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আরবরা প্রথম থেকেই সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার জানত এবং এর ব্যবহার তারা ভারতীয়দের কাছ থেকেই শিখেছিল।

শুধু শূন্য নয়, দশমিক মানও মুসলমানরা জানত। O. J. Thatcher and F. Sckwell বলেন, "শূন্যের ন্যায় দশমিক মানও (decimal equation) মুহাম্মদ বিন মুসার আবিষ্কার; তিনিই সংখ্যার স্থানীয় মান (Value of position) নির্দেশ করেন।"[৭] গণিতের আরবী পাঠ্যপুস্তকে সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ এবং অমূলদ সংখ্যায় ভাগ করা হয়। গ্রীকদের কাছ থেকে আরবরা মূলনীতি ও সংজ্ঞা শিক্ষা গ্রহণ করে। আরবরা কোন কোন রাশিধারার সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন এবং লেখকগণ যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি দিয়েছেন। যেমন- সমান সংখ্যার সমষ্টি এবং কোন কোন অসম সংখ্যার সমষ্টি কিন্তু সাধারণভাবে এসবের ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। আল ফারাজী (মৃ. ১০২৯) তা সত্ত্বেও ১+২+৩ ..... +n এই শ্রেণীর তৃতীয় ঘাতের যোগফল নির্ণয় করার একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে আল-কাশী (মৃ. ১৪৩৭) চতুর্থ ঘাতের যোগফল দিয়েছেন।

মুসলমান গণিতবিদরা ঘাতকের সূচক ব্যবহার করতেন এবং বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয় করতেন। এ সম্পর্কে J.W. Draper বলেন, "বর্গীয় সমীকরণের (quardratic equation) সাধারণ নিয়মও আরবরাই আবিষ্কার করেন"[৮]। তারা ঘন সমীকরণের (cubic equation) একটি নির্দিষ্ট নিয়মের প্রস্তাব করে। আরবরা সংখ্যা নিপুণভাবে ব্যবহার করার মৌলিক নীতিগুলো জানতেন। যেমন- জটিল সংখ্যা নির্ণয়ে $am+bm=(a+b)m\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ প্রভৃতি নিয়ম তাদের জানা ছিল। তারা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, যে সব সংখ্যা ২, ৩, ৭, ৮ অথবা বিজোড় সংখ্যার শূন্যে শেষ হয়, সেগুলি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয়। গণনা সহজ সাধ্য করার জন্য তারা গণনা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। এছাড়া, 'জোড় ভুলের নিয়ম' নামের পদ্ধতিও তাদের প্রতি আরোপ করা হয়। তারা 'এ্যামিকাল' বা সুসামঞ্জস সংখ্যার গুণ আলোচনা করেছেন এবং সাবীয় পণ্ডিত সাবিত ইবন কুররা (মৃ. ৯০১) এ সব সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। 'সুসামঞ্জস' সংখ্যা হলো সে সব সংখ্যা যাদের একটি আনুপাতিক অংশের যোগফল অন্যটির সমান এবং বিপরীত ক্রমেও। যেমন ২২০ এবং ২৮৪ এ দু'টি সংখ্যা নিলে, ২২০=

---

৬. Carra De Vaun, *Legacy of Islam*, London 1940, p. 385.

৭. O.J. Thatcher, and Fsckwell, *General History of Europe*, Oxford University Press, London, 1924, Vol. I, p. 173

৮. J.W. Draper, *Intellectual Development in Europe*, Vol. II, 1919, p. 48

www.pathagar.com

১+২+৩+৪+৭১+১৪২, যা ২৮৪-এর অংশ এবং একইভাবে ২৮৪ = ১+২+৩+৪ +৫+১০+১১+২০+২২+৪৪+৫৫+১১০ যা ২২০-এর অংশ।

নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আল খাওয়ারিজমী তাঁর বইগুলো লিখেছিলেন। অক্ষরের পরিবর্তে শূন্য ও অন্যান্য শব্দের ব্যবহারে ক্ষেত্রে তাকেই জনক বলা হয়।[৯] এই সংখ্যাগুলোকে তিনি 'হিন্দী' বলতেন অর্থাৎ এর দ্বারা সংখ্যাগুলোর ভারতীয় চরিত্রকেই তিনি বুঝাতে চাইতেন। হিন্দু গণনা পদ্ধতির উপর তার রচনাবলী বাথ এর অধিবাসী এডিলার্ড দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই ল্যাটিন অনুবাদ DC numero Indico অক্ষত থাকলেও মূল আরবী গ্রন্থটি হারিয়ে গেছে।"[১০] স্পেনের মুসলিমরা নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আকৃতিতে কিছুটা আলাদা একধরনের সংখ্যা উদ্ভাবন করেছিলেন। এগুলো 'হুরূফ আল-গুবার' (ধূলোর অক্ষর) নামে পরিচিত ছিল।[১১] এক ধরনের বালির গণনা যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলো ব্যবহৃত হতো। অধিকাংশ পণ্ডিতরা মনে করেন যে 'হিন্দু' সংখ্যার মত গুবার সংখ্যাও ভারতীয় উৎস থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু অন্যরা দাবি করেন যে, গুবার সংখ্যাগুলো আসলে রোমান উৎস থেকেই উদ্ভূত এবং আরবদের আগমনের আগেই তা স্পেনে চালু হয়।[১২] দ্বিতীয় পোপ সিলভেসটার জেরবার্ট সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুবার সংখ্যাগুলোর বর্ণনা দেন। এ ধরনের সংখ্যা সংবলিত আরবী পাণ্ডুলিপি লেখায় ১০০ বছর পর জেরবার্টের রচনাবলী প্রকাশিত হয়। হিন্দু সংখ্যাগুলোর তুলনায় গুবার সংখ্যার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সংখ্যাগুলোর অনেক বেশি সাদৃশ্য ছিল।

উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টান ইউরোপের গণিতজ্ঞরা একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রোমীয় সংখ্যাতত্ত্ব 'অ্যাবাকাস' ব্যবহার করতেন। গুবার সংখ্যা আবিষ্কৃত হবার পর স্পেন থেকে তা সর্বপ্রথম ইটালীতে প্রচলিত হয়।[১৩] ১২০২ খ্রিস্টাব্দে পিসার লিওনার্ডো ফিবোনাসী যিনি একজন প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীর নিকট গণিতশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন, তিনি উত্তর আফ্রিকা সফর করেন এবং মুসলিম সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থটি ইউরোপে আরবী সংখ্যাতত্ত্ব প্রচলনে সহায়তা করে।[১৪] ঐতিহাসিক P.K. Hitti এ ঘটনাকে "The main landmark in the introduction of Arabic numerals. More than that, it marks the beginning of European mathematics"[১৫] বলে অভিহিত করেন। তিনি

---

৯. P. K. Hitti, *History of the Arabs* (সৈজ্জুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত, জয়ন্তসিংহ; বাংলা অনুবাদ-*আরবজাতির ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৬৫১।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫১-৫২।

১২. David E. Smith and Louis C. Karpinski, *The Hindu Arabic Numerals* (Bostom and London, 1911), p. 65 seq; solomon gandz in Isis, Vol. XVI, (1931) pp. 393-424, see ibn-Khaldun, Muqaddamah, p. 4, 1.22; P. K. Hitti, Ibid, p. 574.

১৩. P. K. Hitti বাংলা অনুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. P. K. Hitti, *History of Arabs*, (London, 1970), p. 574.

www.pathagar.com

আরও বলেন যে, "পুরনো ধরনের সংখ্যার সাহায্যে পাটিগণিতের অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ত। আজ যে ধরনের গণনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার মূলে রয়েছে শূন্য এবং আরবীয় সংখ্যাগুলোর উপস্থিতি।[১৬]

২. বীজগণিত ঃ বীজগণিতেও মুসলমানদের অসামান্য অবদান ছিল। বিখ্যাত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-খাওয়ারিজমির 'আল জবর ওয়া আল মুকাবালা'র 'আল জবর' শব্দ থেকে Algebra নামের উৎপত্তি। এই বইয়ের মূল আরবী এখন দুষ্প্রাপ্য। ঐতিহাসিক P. K. Hitti "দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রেমোনার জেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় এই বইটির অনুবাদ করেন। তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই বইটি অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান পাঠ্যবই রূপে ব্যবহার করা হত। আসলে, আল-খাওয়ারিজমির লেখা এই বইটি ইউরোপে বীজগণিতের প্রচলন করে। এমন কি 'বীজগণিত' নামটিও এই বই'র মাধ্যমেই চালু হয়। শুধু তাই নয়, আল-খাওয়ারিজমির বইয়ের মাধ্যমেই তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংখ্যাতত্ত্ব 'অ্যালগোরিজম' নামেও পরিচিত। আল-খাওয়ারিজমির নামানুসারেই এই সংখ্যাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে।[১৭] আল-খাওয়ারিজমির আল-জবর-ওয়া-আল-মুকাবালা গ্রন্থের আল-জবর শব্দের অর্থ ভগ্নবস্ত জোড়া লাগানো অথবা অসম্পূর্ণ কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ করা। নতুন বিদ্যায় এর অর্থ সমীকরণের উভয় পার্শ্বকে এমনভাবে সাজানো, যাতে সংখ্যাগুলো সবই ধনাত্মক হয়। আল-মুকাবালা অর্থ এক জাতীয় সংখ্যাকে কমিয়ে নেওয়া। আবার এ দু' প্রক্রিয়ার সাথে 'হাত' নামে একটি প্রক্রিয়া জড়িত যার অর্থ অবরোহণ, উভয় পার্শ্বকে ভাগ করে এটা সম্পন্ন করা হয়।[১৮] যেমন-

$6x^2-36x+60 = 2x^2-12$ থেকে
জবর প্রক্রিয়ার সাহায্যে $6x^2+60+12 = 2x^2 + 36x$
মুকাবালার সাহায্যে $4x^2 + 72 = 36x$
হাতের সাহায্যে ভাগ করে $x^2 + 18 = 9x$

লক্ষণীয় যে, এ সকল প্রথম যুগের বীজগণিতবিদগণ কখনো ঋণাত্মক অথবা অমূলদ সমাধান আলোচনা করেন নি। অপর একজন বিখ্যাত গণিতবিদ আল-মাহানী (মৃ. ৮৭৪) যিনি আর্কিমিডিসের নিম্নোক্ত উপপাদ্য আলোচনা করেছিলেন, "একটি বর্তুলকে একটি তল দিয়ে বিভক্ত করতে হবে যাতে দু'টি অংশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে।"[১৯] এ সমস্যার সঠিক প্রকাশ তিনি এভাবে করেছিলেন নিম্নোক্ত সমীকরণ দিয়ে ঃ $x^3 + a = bx^2$

পরবর্তীকালে এ সমীকরণের সমাধান করেছিলেন আল-খাযিন। প্রথম যুগের এ সকল অনিশ্চিত পদক্ষেপের পর আবু কামিল শুজা (দশম শতাব্দী) সাফল্যের সাথে এ সকল সমস্যার সমাধান করেন। তিনি পাঁচটি অজ্ঞাত রাশির সমীকরণসমূহ সমাধান করেন এবং অনির্ধারিত বা

---

১৬. P. K. Hitti বাংলা অনুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২।
১৭. P. K. Hitti প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩।
১৮. মফিজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।
১৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ডায়োফ্যান্টাইন সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। মধ্যযুগে স্পেনীয় অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর অবদান আংশিকভাবে পাশ্চাত্যে পরিচিত হয়। এরপর আল-ফারাজী একখানি বীজগণিতের গ্রন্থ রচনা করেন এবং এতে তিনি ডায়োফ্যার্থাসের ধারণাসমূহের বিকাশ ঘটান। সর্বশেষে ওমর খৈয়াম (মৃ. ১১২৩ খ্রি.) তৃতীয় ঘাত পর্যন্ত বীজগণিতের সমীকরণকে শ্রেণী এবং প্রকারে বিভক্ত করেন। এই ভাগ করা হয়েছিল রাশির সংখ্যা এবং সহগের বিন্যাস অনুসারে যা তিনি শুধুমাত্র ধনাত্মক নিয়েছিলেন। তিনি সমীকরণকে মূল অনুসারেও ভাগ করেছিলেন এবং তৃতীয় ঘাতের সমীকরণও সমাধান করেছিলেন, যদিও শংকু বিভক্তি (কৌণিক সেকশন) দিয়ে এ ধরনের সমীকরণকে দ্বিঘাত সমীকরণে পর্যবসিত করা যায় না।[২০]

৩. জ্যামিতি ঃ গণিতের অন্যান্য শাখার মত জ্যামিতিতে মুসলিম গণিতজ্ঞরা সমান পারদর্শি ছিলেন। মুসলমানদের জন্য জ্যামিতির ব্যবহার ছিল বহুবিধ। যেমন জমি জরিপ কাজে, দশম শতাব্দীর ইরাকে এবং পারস্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণের অনুশীলনে উন্নত ধরণের কারখানা প্রস্তুত করার কাজে, নোরিয়া (একবচনে নাউরা) তৈরি করার কাজে (এটা হলো খাজ কাটা চাকা, যার সাহায্যে পানি প্রবাহ থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পানি ওঠানো যায়) পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র ম্যাংগোনেল ও ট্যাক্টর ইত্যাদি তৈরি করার কাজে জ্যামিতির ব্যবহার করা হতো। যার দরুন মুসলমানরা জ্যামিতি চর্চায় আগ্রহী হয়।[২১]

মুসলিম জ্যামিতি প্রাচীন গ্রীক কাজের বিশেষত ইউক্লিও, আর্কিমিডিস এবং এপোনোনিয়াসের কাজের গভীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এতে ভারতীয় 'সিদ্ধানের'ও প্রভাব ছিল। কোন কোন 'এ্যারাবেস্ক' নক্সায় যে সব সুষম বহুভুজ অংকন করা হতো তা তৈরি করতে মুসলমানগণ পরস্পরছেদী শংকু বিভক্তি (কৌণিক সেকশন) ব্যবহার করেছিলেন। যেমন- একটি নয়বাহু বহুভুজ তৈরি করতে আবু আল-লায়স পরাবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সংযোগ ব্যবহার করেছিলেন। আর্কিমিডিস তাঁর 'অন দি স্ফিয়ার এন্ড দ্য সিলিন্ডার' গ্রন্থে যে উপপাদ্যটি প্রমাণ করেন নি তার উপর গবেষণা করেছিলেন ইবন-আল-হায়সাম। এ গবেষণার সাহায্য নিয়ে আল-কুহী একটি বর্তুলের অংশ প্রস্তুত করেন যার ঘন একটি নির্দিষ্ট বর্তুলের অংশের সমান এবং যার আয়তন একই বর্তুলের আর একটি অংশের সমান। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন দু'টি সহায়ক শংকুর সাহায্যে। পরস্পর সংশ্লিষ্ট নক্সা তৈরির সমস্যায় বনু মূসা অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।[২২]

মুসলিম জ্যামিতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে, অধিবৃত্তের পাদসংস্থান (quadraiture) সম্বন্ধে ইব্রাহীম ইবন সীনানের কাজ; সুষম বহুভুজ তেরি সম্পর্কে আবুল-ওয়াকার (মৃ. ৯৯৭ খ্রি.) এর কাজ যা থেকে তৃতীয় ঘাতের সমীকরণের উৎপত্তি এবং আবু কামিলের (নবম শতাব্দী) সমীকরণের সাহায্যে পঞ্চবাহু এবং দশবাহু প্রস্তুতের কাজ। আরো

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-৯৮।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওমর খৈয়ামের (মৃ. ১১৩১) কাজ। তিনি ইউক্লিডের একটি ভাষ্য রচনা করেন। এটি অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগামী কাজ, যা সম্ভবত নাসির আদ-দীন তুসীর (মৃ. ১২৭৪) কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।[২৩]

আরব লেখকদের জন্য জ্যামিতির আরেকটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক ছিল গণনার জন্য এর ব্যবহার। এম. এ কাদেরের ভাষায়, 'পিউরব্যাক (peurback) রেজিওমোন্টেনাস ও কোপারনিকাসের গৌরবের যুগ স্মরণ করতে গেলে আরবদের মৌলিক ও প্রাথমিক পরিশ্রমের কথা মনে না উঠে পারে না। তাঁরাই বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে তাঁদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে ভালবাসতেন। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের আকার ও পরিমাপ নিরূপণশাস্ত্র (Geodesy) পর্বত শ্রেণীর উচ্চতা, উপত্যকার প্রস্থ বা একই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত দুটি দ্রব্যের দূরত্ব নির্ধারণ ক্রিয়ার অত্যধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। কার্য প্রণালীর নকশা অঙ্কনে এবং যুদ্ধ যন্ত্র ও অত্যাধিক সুকুমার (sensitive) দাঁড়িপাল্লা নির্মাণে বল বিজ্ঞানের নীতি প্রয়োগ করতে এটি বিশেষ কাজে লাগত।[২৪]

৪. ত্রিকোণমিতি ঃ মুসলমানরা নিঃসন্দেহে তলীয় ও বর্তুল ত্রিকোণমিতির (Plane and spherical Trigonometry) আবিষ্কারক। গ্রীকদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে এ সবের অস্তিত্ব ছিল না। বস্তুত হিপ্পারকাস জ্যা-র একটি সারণী প্রস্তুত করেছিরেন এবং টলেমী তাঁর সিনট্যাক্সের প্রথম পুস্তকে আরও বিস্তৃত একটি সারণী দিয়েছেন অর্ধ ডিগ্রী ব্যবধানের পাপের জন্য। আসলে ১৮° ডিগ্রী কোণ বিশিষ্ট সুষম বহুভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে এই হিসেব করা হয়েছিল। ত্রিকোণমিতিতে মুসলমানদের সাফল্যের কথা স্বীকার করে ঐতিহাসিক S.P. Scott বলেন, 'They substituted sines for chords invented modern Trigonometry".[২৫]

মুসলমানগণই ত্রিকোণমিতির সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট, কোট্যানজেন্ট এবং সেকেন্ট-কোসেকেন্ট অপেক্ষকগুলো পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করেন। সাইনের জন্য তারা জায়ব (Jayb) নাম ব্যবহার করত। এর অর্থ ফাঁক, উপসাগর, জামার বক্রতা, বিশেষ করে কোণের খোলামুখ। ল্যাটিন নাম 'sinus' আরবী Jayb এর অনুবাদ মাত্র। আল-বাত্তানীর (মৃ. ৯২৯) গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমা Demotu stellarum এ দ্বাদশ শতাব্দীতে এ শব্দটি প্রথম পাওয়া যায়। এই বইতে সর্বপ্রথম সাইন এবং কোসাইনের অপেক্ষক হিসেবে কোট্যানজেন্টকে প্রকাশ করা হয় এবং এ বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রিকোণমিতি একটি সুস্পষ্ট ও স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। বর্তুল ত্রিভুজের তিনটি বাহু একটি কোণ একত্রিত করে বর্তুল জ্যামিতিতেও আল বাত্তানী একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র প্রকাশ করেন যা টলেমীর কাজে পাওয়া যায় না। সূত্রটি হলো,

Cos a = Cos b Cos c - Sin b Sin c Cos A.

আবুল ওয়াফা (মৃ ৯৯৮ খ্রি.) ত্রিকোণমিতিতে আরও অগ্রগতি সাধন করেন। সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম সাধারণ বর্তুল ত্রিভুজের সাইন উপপাদ্য প্রমাণ করেন। শুধু তাই নয়, সাইন অপেক্ষকের

---

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. এম. এ. কাদের, *মুর সভ্যতা*, পৃ. ১৫৭-৫৮।

২৫. S. P. Scott, *History of the morish Empire in Europe*, Vol. II, Phladelption, 1904, p. 477.

www.pathagar.com

সারণী প্রস্তুত করার নতুন একটি পদ্ধতিরও প্রস্তাব করেন। একইভাবে গণনাকৃত Sin 30-এর মান আটটি দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধভাবে নির্ণয় করেন। তিনি নিচের ফর্মূলাটি আবিষ্কার করেন কোণের যোগফল নির্ণয়ের জন্যে ঃ

$$\text{Sin } (a+b) = \frac{\text{Sin a Cos b + Sin b Cos a}}{R}$$

$$\text{Cos } (a+b) = \text{Cos a Cos b + Sin a Sin b}$$

এই ফর্মূলা দশম শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হলেও ল্যাটিন বিশ্বে এটা জানা ছিল না। কোপার্নিকাস এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। ট্যানজেন্টের উপর বিশেষ গবেষণার পর আবুল ওয়াফা এর মানের একটি সারণী প্রস্তুত করেন এবং সেকেন্ট ও কোসেকেন্টের প্রবর্তন করেন। এ ছয়টি ত্রিকোণমিতির অপেক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিনি জানতেন যা সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য আজকালও প্রায় ব্যবহার করা হয়। এটা নিশ্চিত জানা গেছে যে, আবুল ওয়াফাই সেকেন্টের আবিষ্কারক, কোপার্নিকাস নয়। তিনি এটাকে 'ছায়ার ব্যাস' বলতেন এবং পরিষ্কারভাবে তিনি নীচের অনুপাতটি আধুনিক কায়দায় উপস্থাপিত করেছেন।[২৬] যেমন ঃ

$$\frac{\text{Tana}}{\text{Seca}} = \frac{\text{Sina}}{1}$$

এবার বিভিন্ন যুগে যে সকল মুসলিম গণিত শাস্ত্রবিদগণ গণিতে মূল্যবান অবদান রেখে গণিত শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

অষ্টম শতাব্দী ঃ অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলীফা আল-মনসুরের রাজত্বকালেই মুসলমানগণ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় গণিতশাস্ত্র আলোচনা ও গবেষণায় মনোযোগী হয়। এ সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত গণিতবিদের নাম হলো— আবু ইয়াহয়া, আবু ইসহাক আল ফাজারী এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফাজারী, ফাজারীদের উৎসাহেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ কক ব্রহ্মাগুপ্তের 'সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতির্বিদ্যার বইটি বাগদাদে আনয়ন ও 'সিন্দহিন্দ' নামে অনুবাদ করা হয়।[২৭]

নবম শতাব্দী ঃ নবম শতাব্দীতে খলীফা হারুন-অর-রশীদ ও খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকালে গ্রীক ও ভারতীয় গণিত বিজ্ঞানের বই নিয়মিতভাবে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। হারুন-অর-রশীদের আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইউক্লিডের জ্যামিতি বিষয়ক গ্রন্থ 'Elements' এর অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৩ খণ্ডের মধ্যে ৬ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। বাকী সাত খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হয় খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকালে। এ সময় অনুবাদ কার্যে মূল্যবান অবদান রাখেন সাবিত-বিন কোররা এবং ইসহাক ইবন হুনায়ন। তাঁরা 'Elements' এর অনুবাদ সমাপ্ত করে এর উপর সারগর্ভ ভূমিকা লিখেন। এছাড়া আল হিমসী (মৃ. ৮৮৮ খ্রি.) আপোলোনিয়াসের গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

---

২৬. মফিজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।

২৭. অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা ঃ ইফাবা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪), পৃ. ৫৫।

www.pathagar.com

আল-মামুনের আমলে একজন বিখ্যাত গণিত ও জ্যোতির্বিদ হলেন আবুল আব্বাস ইবন মুহাম্মদ ইবন কাছির আল ফারগানী। তিনি 'Elements of Astronomy' বইটির সাহায্যে গণিতের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করেছেন।

নবম শতাব্দীর গণিতশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং গণিতের জনক বলে পরিচিত মুহাম্মদ মূসা আল খাওয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) খাওয়ারিজমের খিবায় জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে আল খাওয়ারিজমি বলা হয়। আল-খাওয়ারিজমি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আরবী, হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি আল মামুনের দরবারে চাকরি গ্রহণ করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল-খাওয়ারিজমি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। গণিতের সকল বিভাগেই তিনি কাজ করেছেন। তবে এলজাব্রা বা বীজগণিতের উপর তাঁর লেখা 'হিসাব-আল-জবর ওয়া আল-মুকাবালা' নামক গ্রন্থটি তাঁকে গণিত শাস্ত্রের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। এই গ্রন্থের 'আল-জবর' শব্দ থেকে আধুনিক Algebra শব্দের উৎপত্তি। গ্রন্থটিতে বীজগণিত প্রাঞ্জল ও সরল ভঙ্গীতে লেখা এবং তাতে ৮০০ এর উপর বিভিন্ন রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। তিনি (Intergation) একীকরণ ও দুই ডিগ্রীর সমীকরণ (quadaratic equation) সম্বন্ধে আলোচনা করে তার হরণ ও পূরণ সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন। সমীকরণের সমাধানে ছয়টি নিয়ম আবিষ্কার করেন।[২৮] ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন, 'This al khwarizimi Muhammad ibn-Musa was the principal figure in early history of Arabs.'[২৯]

মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, 'অতীতে মুসলমানরা যেসব জ্ঞান অর্জন করেছিল তারই জের ধরে ইউরোপের লোক শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছিল। আজও আল-খাওয়ারিজমির উদ্ভাবিত 'এলগোরিদম' (বিশেষ ধরনের গাণিতিক নিয়ম) কম্পিউটার শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জ্ঞান না থাকলে ইন্টারনেটের যন্ত্রপাতি তৈরি হতো না।[৩০]

আল-খাওয়ারিজমি পাটিগণিতের উপর 'কিতাবুল জামা আল তাফ্রিক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আরবদের মধ্যে তিনিই পাটিগণিতে সর্বপ্রথম সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন। এর মূল আরবী পাণ্ডুলিপিটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে 'De nameco Indico' নামের ল্যাটিন অনুবাদটির অস্থিত্ব আছে।[৩১] আধুনিক বীজগণিতের আবিষ্কারক মুহাম্মদ বিন ইসা আল

---

২৮. আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা,* (ইফাবা, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৪ ইং) পৃ. ১৩-১৫।

২৯. P. K. Hitti : Ibid, p. 379

৩০. বিগত ১৯ জুলাই, ২০০২ ইং তারিখে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী ফোরামে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ এর ভাষণ। ভাষণটি *দৈনিক নিউ স্ট্রেইটস টাইমস* (২০-৭-২০০২) এ প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইনকিলাবের' ঢাকা থেকে এর বাংলা বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় বৃহস্পতিবার ১৮ আশ্বিন ১৪০৯, ৩ অক্টোবর ২০০২ ইং তারিখে। শিরোনাম *ড. মাহাথির মোহাম্মদের দৃষ্টিতে মুসলিম জাহানের দুরবস্থা;* পৃ. ৯।

৩১. আব্দুল মওদুদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

www.pathagar.com

সাহানী ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও ঘন সমীকরণ সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন। তিনি গণিত শাস্ত্রে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে ত্রিমাত্রিক সমীকরণ যেমন, $x^3 + a^2b = cx^2$ সূত্রটি আবিষ্কার করেন। এই সমীকরণটি আজ পর্যন্ত সাহানী সমীকরণ নামে পরিচিত।

আহমদ ইবন তাইয়েব আল সারাকশি (মৃ. ৮০৫ খ্রি.) এবং ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কিন্দি (মৃ. ৮৭৪ খ্রি.) নবম শতাব্দীর আরও দু'জন সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন। আল কিন্দি গণিত, জ্যামিতি, আবহাওয়াবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের উপর প্রায় দুইশতটি গ্রন্থ রচনা করেন।

দশম শতাব্দী ঃ দশম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গণিতবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবন শাবীয় সিনান আল-বাত্তানী আল হাররানী আল সারী। (৮৫৮-৯২৯ খ্রি.) তিনি হাররানী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা সাবীয়ান (চন্দ্র সূর্য-নক্ষত্র-উপাসক) ছিলেন। এজন্য তিনি নিজের নিসবায় হাররানী বা সাবী গ্রহণ করেছিলেন। আল-বাত্তানী বাগদাদের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। তবে আল-বাত্তানী একজন সফল জ্যোতির্বিদ ও গণিত শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পাশ্চাত্য জগতে তিনি Albalegnious ও Albetenious নামে আজও অমর হয়ে আছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'মুসলিম টলেমী' নামে অভিহিত হয়েছেন। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কেবলমাত্র 'কিতাব আল জিজ আল-সাবী' নামক গ্রন্থটির ল্যাটিন অনুবাদের অস্থিত্ব আছে। C.A Nallino কর্তৃক ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মূল গ্রন্থটি চার খণ্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। আল-বাত্তানী ত্রিকোণমিতির এবং গোলকীয় ত্রিকোণমিতির বহু সূত্র উদ্ভাবন করে টলেমীর মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।[৩২]

দশম শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ ইবন ইয়াহয়া ইবন ইসমাইল ইবন আব্বাস আল-বুজ্জানী (৯৪০-৯৯৮ খ্রি.)। তিনি ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। আবুল ওয়াফা জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ১. কিতাব ফি ইলমুল হিসাব, ২. আল-কিতাবুল কামিল, ৩. কিতাবুল হান্দাসা, ৪. কিতাবুল মানাজিল, ৫. আল-ম্যাজেষ্ট, ৬. কিতাবুল মাদখিল।[৩৩] আবুল ওয়াফা গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক অবদান রাখলেও ত্রিকোণমিতিতে তাঁর গবেষণা কর্ম সর্বজন সমাদৃত।

আল-খাওয়ারিজমির পর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মুসলিম গণিতবিদ হলেন আবু কালিম (৮৫০-৯৩০ খ্রি.)। মিসরের অধিবাসী এই গণিতজ্ঞকে প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ 'আল-হিসাব আল মিসরী' বা মিসরের গণনাকারী নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর বীজগণিতের ৬৯টি সমস্যার সমাধান সংবলিত বইয়ের নাম 'কিতাব ফি আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালাহ'। মুসলিম গণিতবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম দ্বিঘাতের চেয়ে বেশি শক্তির সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি x^8 পর্যন্ত রাশি বিবেচনা করেন এবং প্রথম গুণে মাত্রার যোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আবু

---

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৬।

৩৩. আব্দুননূর, *গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান, মাসিক শাহজালাল সিলেট,* জুন ১৯৮৫, পৃ. ৩৭।

www.pathagar.com

কালিমের সময় থেকেই শূন্য লিখতে একটি বিন্দুর ব্যবহার শুরু হয়। তাঁর রচিত 'কিতাব আল-তারায়েফ ফি হিসাব' গ্রন্থে কতকগুলো অনিশ্চিত সমীকরণের পূর্ণ সংখ্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। ভগ্নাংশ লেখার বর্তমান আকার আবু কামিলই প্রথম আবিষ্কার করেন। নিচের অভেদটি আবু কালিমের অভেদ নামে[৩৪] পরিচিত,

$\sqrt{12+2\sqrt{20}}=10\pm\sqrt{2}$

এছাড়া দশম শতাব্দীতে মুসলিম বিন আহমদ আল-ইয়াসী (৯০৮ খ্রি.) এবং শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবী (৯৫১ খ্রি.) জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও জ্যামিতির উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

একাদশ শতাব্দী ঃ একাদশ শতাব্দীতে গণিতের উপর বেশ কিছু প্রতিভাপূর্ণ কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় গণিতে যে সব মুসলিম বিজ্ঞানী বিশেষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো —

আনুমানিক ১০২০ খ্রিস্টাব্দে আল-কারখী বাগদাদে গণিত শাস্ত্র আলোচনায় মনোযোগ নিবন্ধ করেন। তিনি বীজগণিতের উপরই মৌলিক অবদান রাখেন। তাঁর রচিত চারটি গণিত গ্রন্থের মধ্যে যে দু'টির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো হলো, ১. আল-কাফি ফিল হিসাব (পাটিগণিত) ও ২. কিতাবুল ফাখরী (বীজগণিত)। আল-কারখী তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক উজির ফখরুল মুলকের নামানুসারে তার বীজগণিতের নাম রাখেন 'ফাখরী'। এই বইটি খাওয়ারিজমির Algebra এর পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বীজগণিতের বই। এখানে তিনি দ্বিমাত্রা ও ত্রিমাত্রা সমীকরণের সমাধান করেছেন এবং বীজগণিতের সমাধানে জ্যামিতি ব্যবহার করেন। ফারখী ডায়োফান্টাসের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর বই অনুবাদ করেন।

আবু রায়হান আল বেরুনী (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.) ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, প্রকৃতি ও খনিজ বিজ্ঞান এবং গণিত ও জ্যামিতির ক্ষেত্রে ইসলামের একজন মৌলিক প্রতিভাধর চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি খাওয়ারিজমের খিবায় জন্মগ্রহণ করেন। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কানুনে মাসুদী' একটি অমূল্য সম্পদ।[৩৫]

একাদশ শতাব্দীর অন্যান্য গণিতবিদদের মধ্যে আল মাজরিত আবুল কাসেম মাসলামা (১০০৪ খ্রি.) ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.), ইবনুল হাইসাম (১০৩৮ খ্রি.) এবং আবু বকর মুহাম্মদ ইবন হুসাইন ও মিসরের ইবন ইউনুস প্রমুখ গণিতের পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির উপর যথেষ্ট অবদান রাখেন।[৩৬]

এছাড়া আহমদ আল-নাসাবি (মৃ. ১০৪০) তাঁর 'আল মুকনি ফী আল হিসাব আল হিন্দি' (হিন্দু গণনা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্নকারী) নামের বইতে অনেকটা আধুনিক পদ্ধতিতেই ভগ্নাংশের ভাগ এবং বর্গমূল নির্ণয় করেছেন। তাছাড়া আল-খাওয়ারিজমির মত তিনিও এই বইতে ভারতীয় সংখ্যাগুলোকে ব্যবহার করেছেন।[৩৭]

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩৫. অধ্যাপক কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস,* (আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫ ইং) পৃ. ২৭৯।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

৩৭. P. K. Hitti বাংলা অনুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২।

www.pathagar.com

দ্বাদশ শতাব্দী ঃ ইউরোপীয়দের কাছে 'Astronomenpoet' নামে পরিচিত এবং আধুনিক বীজগণিতের প্রবর্তক আবুল ফাতাহ উমর বিন ইব্রাহিম আল খৈয়াম (১০৩৮-১১২৩ খ্রি.) খোরাসানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি নিশাপুরের বিখ্যাত শিক্ষায়তনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাজীবন শেষে নিশাপুরের বিখ্যাত কলেজেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। শীঘ্রই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ওমর খৈয়াম একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও কবি ছিলেন। তিনি দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যাদ্ধি ও গণিতের উপর কমপক্ষে দশখানি বই রচনা করেন। তার মধ্যে 'আল-জিবার' তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই গ্রন্থে তিনি গ্রীকদের চেয়েও বেশি মৌলিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং আল খাওয়ারিজমির চেয়েও আরও উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রথমত, আল খাওয়ারিজমি কেবল দ্বিশক্তি সমীকরণ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম ঘন সমীকরণ সম্বন্ধেই বেশি আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সম্পাদ্য প্রশ্নগুলো সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য উপায়ে বাস্তব সমাধানের সুবিস্তৃত আলোচনায় খৈয়াম গ্রীকদের চেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন। তিনি তিন ডিগ্রীর সমীকরণকে ২৭ রকমে অনুশীলন করে চারটি শাখায় বিভক্ত করেছিলেন। শেষ দুটি শাখায় ত্রিপদ সমীকরণ (Trinomial Equation) ও চারপদ সমীকরণ (Quadrinomial Equation) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ওমর খৈয়াম নিজেই বলেছেন ঃ "এই শিক্ষায় আমরা কতকগুলো এমন কঠিন প্রাথমিক উপপাদ্যের (Preliminary theorems) ও প্রতিজ্ঞার (Proposition) সম্মুখীন হই যার সমাধানে আমার পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণ অপারগ ছিলেন'।[৩৮] প্রাচীন লেখকদের কেউই এ বিষয়ে আলোচনা করেন নি। খৈয়ামের আল জিবার গ্রন্থখানি ১৮৫৭ সালে woepeke কর্তৃক সম্পাদিত ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত। তাঁর আরও একখানি পুস্তকে ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্বন্ধে বহু মৌলিক ও উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে। গ্রন্থখানির হস্তলিপি এখনও লীডেন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

এ শতাব্দীতে গণিতে আর যারা অবদান রাখেন তাঁরা হলেন স্পেনের ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) ও জাবির ইবন আফলাহ (মৃ. ১১৫০ খ্রি.)। জাবির ইবন আফলাহ প্রথম স্বাধীনভাবে গোলকীয় সমকোণী ত্রিভুজের সূত্রগুলো নির্ণয় করেন। তিনি 'কিতাবুল হাইয়া' নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী ঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণে বাগদাদ নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের পতন সূচিত হয়। তখন মিশরের মামলুক সুলতানদের প্রচেষ্টায় মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বলতে থাকলেও পারস্যে ইলখানী শাসক হালাকুখান মারাগায় একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাকে সচল রাখতে সচেষ্ট হন। এই মান মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন নাসির উদদীন আল তুসী। তিনি একাধারে এ জন দার্শনিক, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও কবি ছিলেন। নাসির উদদীন ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস প্রসিদ্ধ তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে আল তুসী বলা হয়। নাসির উদদীন প্রথমে তুসের বিখ্যাত

---

৩৮. আব্দুল মওদুদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২, ২৮-৩০।

www.pathagar.com

শিক্ষাকেন্দ্রে ও পরে বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আরবী ও ফার্সী ভাষা এবং সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তাছাড়া গ্রীক দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। এসব বিষয়ের উপর তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জ্যোতির্বিদ্যার উপর রচিত গ্রন্থ হলো, 'আল-জিজ-আল-ইলখানী'। আল-তুসী সম্পর্কে মুখতাসার উদ-দুয়ালের লেখক বলেন, 'মারগার মানমন্দিরের অধ্যক্ষ নাসির উদদীন আল তুসী দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।'[৩৯] তুসীর সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ছিল জ্যামিতি শাস্ত্রে। ক্যারা দ্য ভো (carra de vouse) বলেন, 'আরবরা প্রধানত জ্যামিতিকার ছিলো। জ্যামিতি ব্যতিরেকে বীজগণিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারতো না।'[৪০] আরবীতে জ্যামিতি বিদ্যাকে বলা হয় 'ইলমে হান্দাসা'। নাসির উদদীন আল তুসী 'তাহরিরে উকলিদস' নাম দিয়ে ইউক্লিডের গণিত বিষয়ক গ্রন্থটি অনুবাদ করে বহু মূল্যবান টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত করেন। তাঁর এ অনুবাদ কর্মটি কারও কারও মতে ষোলটি আবার কারও কারও মতে পনেরটি খণ্ডে বিভক্ত এবং মোট চারশো আটষট্টিটি প্রতিজ্ঞায় (Proposdition) সম্পূর্ণ। তুসীর লিখিত টীকা টিপ্পনী আধুনিক জ্যামিতিকারদের পথ-প্রদর্শক এবং সেসব থেকেই আধুনিক জ্যামিতির বহু উদাহরণ সংগৃহীত হয়েছে। তিনি চতুর্ভুজ সম্বন্ধে নিজে একখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থখানি চক্রত্রিকোণমিতি সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর বই। সামতলিক ও মান্ডলিক ত্রিকোণমিতি অতঃপর তুসীর হস্তেই সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে এবং তিনিই সর্বপ্রথম যথারীতি শৃঙ্খলার সঙ্গে এই বিষয়টির আলোচনা করেন। ত্রিভুজ বিদ্যাকে আরবীতে 'ইলমে-মুসাল্লাম' বলা হয়। বর্তমানে 'লগারিদম' টেবলের কিতাব দেখে প্রথমে লগারিদম ঠিক করে পরে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে অংক কষার নিয়ম প্রচলিত আছে। নাসির উদদীন আল তুসীই এই অভিনব প্রণালীর জন্মদাতা এবং আজও তাঁর প্রণালী চলে আসছে।[৪১] জর্জ মার্টনের মতে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৪টি। নাসির উদদীন আল তুসী ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র সদর উদদীনও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

চতুর্দশ শতাব্দী ঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া ও স্পেনের বিভিন্ন স্থানে গণিতের উপর কিছু কিছু কাজ হয়। কিন্তু সেগুলো খুব মৌলিক কাজ ছিল না।

পঞ্চদশ শতাব্দী ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলিম গণিত শাস্ত্রের বিখ্যাত গণিতবিদগণ হলেন, সমরকন্দের তৈমুরীয় বংশের যুবরাজ উলুগ বেগ, ও তার সহকারী জামসিদ বিন মাসুদ আল কসবী (১৪৩৬ খ্রি.), স্পেনের আলী বিন মুহাম্মদ আল কালামাদী, কনস্টান্টিনোপলের মুহাম্মদ বিন মারুফ, বাহাউদ্দিন আমালি প্রমুখ গণিতবিদগণ[৪২]। এসব গণিতজ্ঞ, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটিগণিত ও

---

৩৯. আর. এ. নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ২৬৯।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৯।

৪২. গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যার উপর গবেষণা করেন। বাহাউদ্দিনের পর গণিতে মৌলিক অবদানের জন্য বিখ্যাত কোন মুসলিম গণিতবিদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আধুনিক যুগ ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পর প্রায় চারশ বছর জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে দূরে থাকার পর বিংশ শতাব্দীতে প্রফেসর আব্দুস সালাম, ড. রাজি উদ্দীন সিদ্দীকী, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. আতিকুল্লাহ, ড. আব্দুল কাদির, মিসরের ড. রাশেদ খলীফা, ড. হামদী তাহা, মরক্কোর ড. আলী কিত্তানী প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ ফলিত গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানের বিভিন্ন শাখায় মূল্যবান অবাদন রাখেন।[৪৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, অষ্টম শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে গণিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। পরবর্তীতে মুসলমানদের পতনের যুগে ইউরোপীয়রা এ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ ও সংগ্রহ করে এবং তা থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের সমৃদ্ধশালী করে তুলে। মুসলমানদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা বীজগণিত ও সংখ্যা গণনা পদ্ধতি শিখেছিল। এ কথার প্রতিধ্বনি করে ঐতিহাসিক J.E. Swain বলেন, 'The prestige of the Muslim scholars in the field of Mathematics is indicated by the mathematical term that we borrowed from them, zero, cipher, and algebra. They developed algebra to second degree equations. They invented the tangent and the cotangent in trigonomety.[৪৪]

পরবর্তীতে ক্রুসেডের ফলে ইউরোপীয়রা মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধারণ করে তা ইউরোপে বয়ে নিয়ে যায়। যার ফলে পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক J.E. Swain আরো মন্তব্য করেন যে, 'The muslims continued the work begun in these earlier cultures and passed it on to western peoples to serve as a port of the foundation of the Renaissance. Medicine, Astronomy, Mathematics, Physics, Chemistry and art of the west depended much upon Arabic knowledge.'[৪৫]

---

৪৩. আঃ হাকিম, সভ্যতার উত্তরাধিকার, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ১১।

৪৪. James Edgar Swin, *A history of world civilization*, [Eurasia publishing house (pvt.) Ltd, New Delhi, 1976], p. 291

৪৫. Ibid.

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

বিবাহোত্তর ওয়ালীমা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও দেশীয় প্রচলন

মোঃ আকতার হোসেন*

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ 'ইসলাম আল্লাহ্ পাকের মনোনীত জীবন ব্যবস্থা'[১] হিসেবে মানব জীবনের ক্ষুদ্র বৃহত্তম এমন কোনো ক্ষেত্রও অবিদ্যমান যেখানে সুস্পষ্ট ও নিখুঁত নীতিমালা প্রণয়ন করে নাই। মানব জীবনের প্রতিটি অংশে, বিভাগে ইসলামের আছে জগদ্বিখ্যাত, বিজ্ঞানসম্মত, চমৎকার ও বিশ্লেষণধর্মী বিধি-বিধান বা কর্মপন্থা। মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিবাহের ক্ষেত্রে এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করে পুরুষ ও নারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

"হে মানব মণ্ডলী ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে।"[২] আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءَ .

"হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তাহা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[৩]

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে মানব সভ্যতার বংশ বিস্তার, মঙ্গল ও উন্নতি। এই সম্পর্কে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং মঙ্গল ও উন্নতির পথে বাধা ঘটে।[৪]

---

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৯।

২. আল কুরআন, সূরা হুজুরাত : ১৩।

৩. আল কুরআন, সূরা নিসা : ১।

৪. আব্দুল খালেক, *নারী*, ইফাবা, প্রকাশকাল ১৯৯৫, পৃ. ১।

www.pathagar.com

এ লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের সাথে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে বিবাহ প্রথা চালু করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً.[৫]

বিবাহের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিবাহ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান অংগ। ইহা একটি সুসভ্য পবিত্র ধর্মীয় চুক্তি। তাইতো রাসূল (সা) বিবাহকে তাঁর সুন্নাত হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى.

"বিবাহ করা আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করল না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৬]

বিবাহ যেহেতু মানব জীবনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাই সেই অধ্যায়ে মানুষ নানা আয়োজন করে এটাকে স্মরণীয় করে রাখতে চায়। তন্মধ্যে একটি হলো ওয়ালীমা বা বিবাহোত্তর প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান। ওয়ালীমা শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান বললে ভুল হবে। বিবাহের ঘোষণা প্রদান, প্রচার ও সামাজিক শৃংখলা বিধানে ওয়ালীমার গুরুত্ব অনেক বেশি। সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ইসলামে ওয়ালীমার ব্যাপারে সুন্দর ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

আমাদের দেশে ওয়ালীমার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ইসলামী শরীয়তের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতির কিছু অনুপ্রবেশ এর মধ্যে ঘটেছে। কতিপয় ক্ষেত্রে ইসলাম বহির্ভূত রসম রেওয়াজও এখানে চালু আছে।

ওয়ালীমার পরিচয় : শাব্দিক অর্থে

ওয়ালীমা শব্দটি ولم শব্দ থেকে গৃহীত। এর শাব্দিক অর্থ হলো الجمع বা একত্রিত করা। কেননা একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহিত জীবনে মিলিত হওয়ার উপলক্ষে নিকটাত্মীয়দের একত্রিত করা হয় এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ওয়ালীমা।[৭]

কোন কোন অভিধান গ্রন্থে ওয়ালীমা শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে — العرس। حفلة - مأدبة Feast, party, wedding Feast অর্থাৎ ভোজন, অনুষ্ঠান, ভোজ পরিবেশন।[৮]

---

৫. আল-কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত ঃ ০৩।

৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ্, *সুনানু ইবনে মাযাহ,* (ই.ফা.বা. প্রকাশকাল জানুয়ারী ২০০১) কিতাবুন নিকাহ, পৃ. ১৬২।

৭. সাইয়েদ সাবিক্ব, *ফিকহুস সুন্নাহ,* (লেবানন : বৈরুত, দারুল কিতাব আল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* (ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০০ ইং), পৃ. ১৬৩।

৮. ড. ইব্রাহীম মাদকুর, *আল মু'জিমুল অসিত,* (দেওবন্দ : কুতুবখানা হোসাইনিয়া, প্রকাশকাল ১৯৯৬), পৃ. ১০৫৭; ড. মুহাম্মদ রওয়াস, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা,* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন), পৃ. ৫১১; *কামুস ইলইয়াস আছরী,* পৃ. ৮১৫।

www.pathagar.com

পারিভাষিক অর্থে ওয়ালীমা

শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়ালীমা বলতে বুঝায়

وهى طعام يصنع عند العرس يدعى إليه الناس.

"বিয়ে অনুষ্ঠানের সময়কালীন আয়োজিত খাবার। যার জন্যে লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয়।"[৯]

মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী (র) বলেন—

الوليمة كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرها ولكن اشتهر استعمالها فى النكاح.[১০]

বাসররাত সম্পন্ন হবার পরদিন নবদম্পত্তি বিবাহের খুশী প্রকাশার্থে পরিবার, পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবাইকে একত্র করে খাওয়ানোকে ওয়ালীমা বলে।[১১]

'নারী' গ্রন্থের লেখক আবদুল খালেক বলেন, "বিবাহ বন্ধনের পর পাত্র পক্ষ যে ভোজসভার আয়োজন করে তাকে ওয়ালীমা বলে।"[১২]

মাওলানা আমিন আল আসাদ বলেন, "বাড়িতে নববধূকে এনে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে সামর্থ্যানুযায়ী যে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয় তাকে ওয়ালীমা বলা হয়। এটা সুন্নাত।"[১৩]

আবু উবাইদ বলেন আমি ইয়াজিদকে বলতে শুনেছি,

يسمى الطعام الذى يصنع عند العرس الوليمة

"বিবাহ অনুষ্ঠানে যে খাবার তৈরি করা হয় তাকে ওয়ালীমা বলে।"[১৪]

কারো মতে, "বিবাহ পরবর্তী খাবারকে ওয়ালীমা বলে।"[১৫]

Encyclopaedia of Islam-এ বলা হয়েছে, "Walimah - A Feast Accompanying a wedding the grom may ride throught the strued on a horse fllowed by his friends and well wishers and there is always a feast called the walimah.[১৬]

---

৯ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

১০. সাইয়েদ সাবিক্, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

১১. *মাসিক আদর্শ নারী*, ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০৪, পৃ. ১২।

১২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

১৩. মাওলানা আমিন আল আসাদ, *কোরআন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন*, (আল ইসলাম পাবলিকেশন্স), পৃ. ৮২।

১৪. ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*, (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রকাশকাল ১৯৭৯ ইং) পৃ. ৩৯৯।

১৫. মুহাম্মদ বিন আবু বকর, *মুখতারুছছিহহাহ*, (লেবানন : দায়েরাতুল মায়ালিম), পৃ. ৩০৬।

১৬. *The Encyclopaedia of Islam*, London : Luzac and co. 1965, p. 417.

www.pathagar.com

Dictionary of Islam - এ বলা হয়েছে, Walimah The nuptial feast. The wedding breakfast, whice is generally given on the morning after the marriage.[১৭]

এক কথায় বিবাহের পর বিবাহ উপলক্ষে বরের বাড়িতে যে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলা হয় ওয়ালীমা।[১৮]

ওয়ালীমার উদ্দেশ্য

ওয়ালীমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন,

وفى ذلك مصالح كثيرة

"ওয়ালীমার যিয়াফত করায় অনেক প্রকার কল্যাণ ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে। এরপর তিনি দুটো কল্যাণের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে —

التلطف باشاعة النكاح.... إذ لا بد من الاشاعة لئلا يبقى محل لوهم الواهم فى النسب.[১৯]

এতে খুব সুন্দর করে বিয়ের প্রচার হয়ে যায়। কেননা বিয়ের প্রচার হওয়া এ কারণেও জরুরী যে, তাদের কোন সন্তান হলে তার সদ্‌জাত হওয়া ও তার বংশ সাব্যস্ত হওয়ার কোন সন্দেহকারীর সন্দেহ করার কোন অবকাশই যেন না থাকে।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে — স্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সদাচরণ প্রকাশ করা। তিনি বলেন —

فإن صرف المال ولها جمع الناس فى أمرها يدل على كرامتها عليه وكونها ذات بال عنده.

নববধুর স্বামী যদি অর্থ খরচ করে এবং তার জন্যে লোকদের একত্রিত করে তবে তা প্রমাণ করবে যে, স্বামীর নিকট তার খুবই মর্যাদা রয়েছে এবং সে তার স্বামীর নিকট রীতিমত সমীহ পাবার যোগ্য।[২০] এর ফলে স্ত্রী খুশি হয় এই ভেবে যে, তাকে বিয়ে করে স্বামী যে নেয়ামত লাভ করেছে তার শুকরিয়া আদায় করছে। যা সে ইতিপূর্বে কখনো লাভ করেনি। এ কারণে তার মন অনাবীল আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্তপুলক বোধ করে। এ জন্য যে, এত অর্থ খরচ করছে আর এসব তারই জন্য। ফলে নববধুর মনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর এর দরুন উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের সাথেও পরম মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।[২১]

ওয়ালীমার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজে বিবাহের ঘোষণা দ্বারা বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মিলন ও অবৈধ গোপন প্রেমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা এবং দম্পতি যুগলের

---

১৭. Homas - Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, (Adam-Pub, Delhi), p. 663.

১৮. মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, *হাদীসের আলোকে মানব জীবন*, পৃ. ১০৪।

১৯. শাও ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা*, (মাকতাবাতু থানুভী, দেওবন্দ : প্রকাশ ১৯৮৬), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

২১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

www.pathagar.com

সম্পর্কে যেন কেহই কিছু বলতে না পারে এবং তাদের দাম্পত্য অধিকারে যেন কেহই কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটায়।[২২]

মাওলানা আমিন আল আসাদ বলেন, "বিবাহ একটি আনন্দ উৎসব। এই আনন্দে অংশগ্রহণ করাই এই ভোজ সভার উদ্দেশ্য। তাছাড়া বিবাহের প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি ও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।[২৩]

ওয়ালীমার গুরুত্ব

ওয়ালীমা সম্পর্কে কুরআন মজীদে তাকিদ রয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন,

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ

"তোমরা তোমাদের অর্থ সম্পদের বিনিময়েই স্ত্রী গ্রহণ করতে চাবে।"[২৪]

অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে আয়াতটি মোহর সংক্রান্ত হলেও বিয়ের পরে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের নির্দেশও এরই মধ্যে রয়েছে বলে মনে করতে হবে। কেননা ওয়ালীমা বিয়ে উপলক্ষে হয়ে থাকে এবং তাতে অর্থ ব্যয় হয়।[২৫]

রাসূলে করিম (সা) ওয়ালীমার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি নিজ বিবাহের পরে ওয়ালীমার যিয়াফত করেছেন। যেমন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিয়ে করার পর একটি বকরী জবাই করে ওয়ালীমার যিয়াফত করেছিলেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত—

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نساءه ما. أولم على زينب فإنه ذبح شاة.[২৬]

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার কোন স্ত্রীর বেলায় এরূপ ওলীমা করতে দেখিনি। যেরূপ যয়নব (রা)-এর ওলীমায় করেছিলেন। কেননা এ সময় তিনি একটি বকরী যবেহ করেছিলেন। হযরত আনাস (রা) আরও বলেন —

أولم رسول صلى الله عليه وسلم حين بنى زينب بنت جحش فاشبع الناس خبزاً ولحماً.[২৭]

"রাসূলে পাক (সা) যখন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিয়ে করে ঘর বাঁধলেন। তখন তিনি লোকদের রুটি ও গোশ্ত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিলেন।"

---

২২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

২৩. মাওলানা আমিন আল আসাদ, *স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

২৪. আল কুরআন, সূরা নিসা : ২৪।

২৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

২৬. ইবনু মাযাহ, *সুনানে ইবনে মাযাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, ওলীমা প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

২৭. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, (দিল্লী : মাকতাবা রশিদিয়া), ২য় খন্ড, পৃ. ৭৭৬।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) যখন সফীয়া (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন তখন ছাতু ও খেজুর দিয়ে এই ওয়ালীমার যিয়াফত করেছিলেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত —

أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمرة.[২৮]

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করিম (সা) খায়বার ও মদীনার মাঝখানে পরপর তিন রাত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। তার মধ্যে একদিন সঙ্গীয় সব সাহাবীদের ওয়ালীমার দাওয়াত দিলেন। এ দাওয়াতে না ছিল গোশ্ত না ছিল রুটি। বরং রাসূলে করিম (সা) সকলের সামনে খেজুর ছড়িয়ে দিলেন। হযরত সাফীয়ার সাথে বিয়ের ওয়ালীমা এমনি অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল।[২৯]

নবী করীম (সা) স্বীয় সাহাবীদেরকেও ওয়ালীমার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। যেমন হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ বিয়ে কররে পরে রাসূল (সা) তাঁকে বলেন— بارك الله لك أولم ولو بشاة[৩০] "আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।"

আল্লামা সানয়ানী এ হাদীসের আলোকে বলেন,

فيه دليل على وجوب الوليمة فى العرس

"এ নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়েতে ওয়ালীমার যিয়াফত করা ওয়াজিব।"[৩১]

হযরত আলী (রা) যখন বিবি ফাতিমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন নবী করিম (সা) বলেছিলেন— لابد للعروس من وليمة "এ বিয়েতে ওয়ালীমা অবশ্যই করতে হবে।"[৩২]

ওয়ালীমার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা) আরও বলেন—

الوليمة حق وسنة فمن دعى ولم يجب فقد عصى

"ওয়ালীমা করা হচ্ছে একটা অধিকারের ব্যাপার, একান্তই কর্তব্য। ইসলামের স্থায়ী নীতি। অতএব যাকে এ যিয়াফতে দাওয়াত দেয়া হবে, সে যদি তাতে উপস্থিত না হয়, তাহলে সে নাফরমানী করল।"[৩৩]

---

২৮. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশয়াছ, *সুনানু আবি দাউদ,* (সিরিয়া : হেমছ-দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ- ১৯৭৩ ইং), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২৬।

২৯. শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনু আলী, *নায়লুল আওতার,* (ইদারাতুর কুরআন আল উলূমুল ইসলামিয়া, (করাচী, পাকিস্তান, প্রকাশ ১৯৮৭), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১।

৩০. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আস্সানয়ানী, *সুবুলুস সালাম,* (জামে আজহার, দারুল হাদীস, ৭ম প্রকাশ, ১৯৯২ ইং), ৩য় খন্ড, পৃ. ১০৫০ : *ইবনু মাযাহ, সুনান,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. আলী ইবনু আবু বকর আল হায়সামী, *মাজমাউস ঝাওয়ায়েদ,* (বৈরুত : কায়রো, দারুর রাইয়ান লিত তুরাছি, দারুল কিতাবিল আরাবী, প্রকাশ ১৪০৭), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯।

৩৩. আবু বকর আল বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল কুবরা* (মক্কা : মাকতাবা দারুল বায, প্রকাশ

www.pathagar.com

ওয়ালীমার হুকুম

ওয়ালীমার হুকুম সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য প্রধান মত হলো জমহুর উলামায়ে কেরামের মত। তাদের মত— الوليمة سنة مؤكدة অর্থাৎ ওয়ালীমা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা।[৩৪]

দলীল

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة.

রাসূল (সা) আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে বলেছেন, তুমি ওয়ালীমা কর যদিও তা একটা বকরী দ্বারা হয়।[৩৫]

وعن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.[৩৬]

এই হাদীসে রাসূল (সা) নিজের বিয়েতে ওয়ালীমা করেছেন সেটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

وعن بريدة قال لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لابد للعروس من وليمة.[৩৭]

ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র) বলেন, ওয়ালীমা করা ওয়াজিব।[৩৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ালীমা করা সুন্নাত। আর তা প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী হওয়া উচিত। অতিরিক্ত করা অনুচিত। অতএব যার বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দিয়ে গরু মহিষ যবেহ করে ওয়ালীমা করার সামর্থ্য আছে সে তা দিয়ে ওয়ালীমা করবে।[৩৯]

ওয়ালীমা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ালীমা করা সুন্নাত। তাই এর কিছু বিধি-বিধানও রয়েছে। নিম্নে এর সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো —

দাওয়াতে সাড়া দেয়া

ওয়ালীমায় যাওয়া ওয়াজিব। কেননা এর দ্বারা আহবানকারীর উপর সম্মান দেখানো হয়। আর এর দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নিজের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (সা) বলেন—

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها

১৯৯৪), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

৩৪. সাইয়েদ সাবিক্ব, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৩৫. মুহাম্মদ ইবনুল ইসমাইল, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৪।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৪।

৩৭. আবু বকর হায়সামী, *মাজমাউস যাওয়ায়েদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৩৮. সাইয়েদ সাবিক্ব, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

"তোমাদের কেহ ওয়ালীমার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে সে যেন অবশ্যই তাতে যায়।"[৪০]

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফে অনুরূপ আরো দু'টি হাদীস বিদ্যমান। রাসূল (সা) বলেন ঃ

إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ائتوا الدعوة إذا دعيتم.[৪১] ائتوا الدعوة إذا دعيتم[৪২]

রাসূল (সা) দাওয়াতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে জোর তাকিদ দিয়েছেন। আর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়

من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله

"যে ব্যক্তি দাওয়াত ত্যাগ করে সে যেন আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।"[৪৩]

কিন্তু দাওয়াতকারী যদি ব্যাপকভাবে দাওয়াত দেয় এবং কতজন দাওয়াত করছে তা নির্দিষ্ট না করে তবে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব নয়। যেমন আহবানকারী বলল ঃ হে লোক সকল ! তোমার ওয়ালীমায় আস। কিন্তু নির্দিষ্ট করল না।[৪৪]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে পার্থক্য না করা

যে ওয়ালীমায় কেবল ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়াত করা হয় এবং দীনদার, আলেম-উলামা ও গরীব-মিসকীন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের দাওয়াত করা হয় না সে ওয়ালীমাকে হাদীসে নিকৃষ্টতম ওয়ালীমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী সুন্নাত ওয়ালীমা পালন করা কর্তব্য।[৪৫]

عن إبى هريرة قال شر الطعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء

"সেই ওয়ালীমার খানা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, যেখানে কেবল ধনী লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হবে। আর গরীব লোকদেরকে বাদ দেয়া হবে।"[৪৬]

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে —

شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها.

"ওয়ালীমার সেই খানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সেখানে যারা আসবে তাদেরকে নিষেধ করা হবে বা দাওয়াত দেয়া হবে না। আর দাওয়াত দেয়া হবে কেবল তাদের, যারা তা কবুল করে না। বা আসবে না।"[৪৭]

---

৩৯. *মাসিক আদর্শ নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪০. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ লি মুসলিম,* (দিল্লী ঃ মাকতাবা রশিদিয়া) ১ম খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, পৃ. ৪৬৩।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

৪৩. *সহীহ বুখারী,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৭ : *সহীহ লি মুসলিম,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩।

৪৪. *ফিকহুস সুন্নাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৪৫. *আদর্শ নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪৬. *সহীহ বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭ : *সুনানে আবু দাউদ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৪৭. *সহীহ লি মুসলিম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

www.pathagar.com

সামর্থ্যানুযায়ী ওয়ালীমা করা

নিজেদের সামার্থ্যানুযায়ী ওয়ালীমাতে খরচ করা উচিত। এতে সাধারণ মানের হলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি বড় ধরনের ঋণের মধ্যে আবদ্ধ তার জন্য জাঁকজমক পূর্ণ ভাবে গরু ছাগল জবেহ করে ওয়ালীমা করা ঠিক নয়। বরং সে সাদামাঠাভাবে যা পারে তা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করাবে। কেননা ঋণ থেকে পানাহ চাওয়ার ব্যাপারে খুবই তাকিদ দেয়া হয়েছে।[৪৮]

যেমন রাসূল (সা) হযরত সাফিয়ার ওয়ালীমা সাদামাঠাভাবে করেছেন ঃ

عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق

"রাসূল (সা) সাফিয়ার বিবাহে খেজুর ও ছাতু দিয়ে ওয়ালীমা করেছেন।"[৪৯]

দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে মোমিন ও খোদাভীরু লোকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা

তাফসীরে ইবনে কাসির ও সহীহ ইবনে হাব্বানে রাসূল (সা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূল (সা) দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে মুত্তাকী ও মোমিন লোকদের অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বলেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لاتصحب إلاّمؤمنا : ولاياكل طعامك إلاّتقى

"মু'মিন ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানিওনা। আর মুত্তাকি ব্যক্তি ছাড়া খাবার অন্য কেহ খাবেনা।"[৫০]

ওয়ালীমার খরচ

ওয়ালীমার যিয়াফতে কত বেশী খরচ করা হবে, এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই বলেই বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। আর কমেরও কোন শেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায় না। যার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ও সহজ, তা করাই যথেষ্ট। স্বামীর আর্থিক সংগতি অনুযায়ী খরচ করবে।[৫১]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ইবনে বাত্তালের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—

وهى على قدر الامكان والوجوب لإعلان النكاح

"ওয়ালীমার যিয়াফত স্বামীর আর্থিক সংগতি অনুসারে হবে এবং তা করা ওয়াজিব বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচারের উদ্দেশ্যে।"[৫২]

---

৪৮. *মাসিক আদর্শ নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪৯. *সহীহ বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৪; *সুনানে আবু দাউদ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৫০. মুহাম্মদ ইবনু হাব্বান, *সহীহ ইবনে হাব্বান,* (বৈরুত ঃ মুয়াস্সাস আর রেসালা, প্রকাশ ১৯৯৩), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪ : ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির, *তাফসীরে ইবনে কাসির,* (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, প্রকাশ ১৪০১ হি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ২১।

৫১. *নাইলুল আওতার,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩২।

৫২. বদরুদ্দীন আল আইনী, *উমদাতুল ক্বারী,* (লেবানন ঃ বৈরুত, দারু এহ্ইয়াউত তুরাছ আল আরাবী), ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

www.pathagar.com

আগত মেহমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আহবানকারীর পক্ষ থেকে আগত মেহমানদের অভ্যর্থনার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। রাসূল (সা) মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মু'মিনের কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।"[৫৩]

আমীর নিযুক্ত করা

ওয়ালীমা ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিশেষ নিদর্শন। তাই এই অনুষ্ঠানটি যাতে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় সে জন্য আমীর বা পরিচালক নিযুক্ত করতে হবে। তিনি সকল বিষয় তদারকি করবেন। রাসূল (সা) তিনজন লোক একত্রিত হলে তন্মধ্যে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করার ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছেন।"[৫৪]

পর্দা রক্ষা করা

ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের সম্মিলন ঘটে। এ ক্ষেত্রে পর্দা রক্ষা করা ফরজ। এ অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, কথাবার্তা বলা শরিয়ত সম্মত নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন — وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

"তোমরা জাহেলী যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।[৫৫]

ওয়ালীমায় দেশীয় প্রচলন

ওয়ালীমার দেশীয় প্রচলন এবং আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে ওয়ালীমার পূর্বে এবং পরে এমন কিছু বিষয় পালন করা হয় বা মানা হয় যা শরীয়ত বিরোধী। নিম্নে সেগুলোর আলোচনা করা হলো —

১. সময় ঠিক করা ঃ ওয়ালীমার পূর্বে তথা বিবাহের সময় আমাদের দেশে বিবাহের মাস বা তারিখে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। যেমন ঃ বৈশাখ বা কার্তিক মাসে বিবাহ করা যাবে না, ছেলে বা মেয়ের জন্মদিনে বিবাহ দেয়া যাবে না ইত্যাদি। এসব ভিত্তিহীন ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।[৫৬]

২. গায়ে হলুদ ঃ বিবাহের সময় আমাদের দেশে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গায়ে হলুদের নামে অহেতুক খরচ ও অপচয় হয়। আবার শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড, অশ্লীলতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা হয়। হলুদ শাড়ী পরিহিতা মেয়েরা বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চায় মেতে উঠে। সেখানে যুবতী মেয়েদের নির্লজ্জ প্রদর্শনী হয়। আবার এই ধরনের অনুষ্ঠানে গান এবং বাদ্যযন্ত্রের সমাহার ঘটানো হয়। যা অবশ্যই বর্জনীয়।

---

৫৩. *আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৫৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আঃ রহীম, *হাদীস শরীফ*, (ঢাকা-মগবাজার, খায়রুন প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, জানু ২০০০ ইং), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

৫৫. সূরা আহযাব ঃ ৩৩।

৫৬. *আদর্শ নারী*, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

৩. রং ছিটানো ঃ বিবাহ উপলক্ষে পারস্পরিক রং ছিটানো। কাঁচা হলুদ পিষে যুবক-যুবতীর একে অপরের গায়ে মাখানো। বরের হাতে শরীরে গাইরে মাহরাম মহিলা ও যুবতী কর্তৃক মেহেদী ইত্যাদি দেয়া শরীয়ত বিরোধী নিষিদ্ধ কাজ।

শরীয়ত বিরোধী এসব কাজ অভিভাবকদের বন্ধ করতে হবে। যদি তারা তা না করেন তবে এর পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। রাসূল (সা) বলেন —

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

"তোমরা প্রত্যেকেই যিম্মাদার, তোমাদেরকে যে সব ব্যক্তি ও বস্তুর যিম্মাদার বানানো হয়েছে। সে সব ব্যাপারে তোমাদের পরকালে জবাবদিহী করতে হবে।"[৫৭]

৪. নাচ-গান ঃ ওয়ালীমার সময় আমাদের দেশে নাচ গানসহ বাদ্যযন্ত্রের সমাহার ঘটানো হয়। এমনকি এখন শুধু দেশীয় গানে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিদেশী সংগীতসহ বিজাতীয় পপ সংগীত ওয়ালীমার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাচ গান ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন ঃ "আজকাল নাচকে চারুশিল্প বলে মনে করা হয়। মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, নিজের সৃষ্টিকে ভুলে যায়, আখিরাতকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ রাসূলকে ভুলে যায় তখনই মানুষ নাচ শিল্পে মত্ত হয়। তিনি ترغيب و ترهيب গ্রন্থের এই হাদীসটি উল্লেখ করেন —

لم تظهر الفاحشة فى قوم حتى يعلنون بها إلا فشافيهم الطاعون والارجاع التى لم تكن مضت فى اسلافهم الذين مضوا.

যে জাতির মধ্যে জিনা ব্যভিচার এবং বেহায়ায়ী খুব বেশি হবে এমনকি শেষে লজ্জাবোধ বলতে আর কিছু থাকবে না। প্রকাশ্য হয়ে পড়বে তখন তাদের মধ্যে মড়ক মহামারী দেখা দেবে এবং এমন কঠিন রোগ-ব্যাধি দেখা দিবে যা তাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।[৫৮]

নাচের সাথে গানও হয়ে থাকে অথচ গান ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

"মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তা হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার কথা খরিদ করে...।[৫৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল্লাহর কসম করে বলেন, উক্ত আয়াতে অসার কথা বলতে গানকে বুঝানো হয়েছে।[৬০]

---

৫৭. ইমাম বুখারী, *কিতাবুল আহকাম*-এ, আবু দাউদ কিতাবুল খারাজ ও আল ইমারা ও আল ফাইয়ে হাদীসটি এনেছেন।

৫৮. আশরাফ আলী থানভী, *বেহেশতি জেওর,* (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

৫৯. সূরা লোকমান ঃ ০৬।

৬০. ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.), *তাফসীরুল কুরআনীল কারীম,* (মিসর ঃ কায়রো দারুল হাদীস, ২য়

www.pathagar.com

এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন "গান ব্যভিচারের বার্তাবাহক এবং অন্তরে কপটতা সৃষ্টিকারী।"[৬১] আমাদের উচিত ওয়ালীমায় নাচ-গান না করা।

৫. পুরুষ ও মহিলা একত্রে মেলামেশা করা ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ ওয়ালীমায় নারী-পুরুষ একত্রে অংশগ্রহণ করে। অথচ ইসলামে গায়রে মুহরীমের সাথে দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহ বলেন —

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.[৬২]

৬. ফটো সেশন ঃ আজকাল ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে ফটোসেশন একটা অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু ইসলামে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফটো তোলা হারাম। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন —

ان أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর বিচারে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে ছবি নির্মাতাগণ।"[৬৩]

عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا حبة ويخلقوا ذرة.

যারা আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে তৎপর হয় তাদের থেকে বড় জালিম আর কে আছে। এত যদি পারে তো তারা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক কিংবা অণু সৃষ্টি করুক।[৬৪]

বর্তমানে তো ছবি তোলা এবং সাথে সাথে সিডি করা, ভিসিডি করা খুবই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে। এটা খুবই খারাপ এবং গর্হিত কাজ।

৭. উপহারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ঃ বর্তমানে ওয়ালীমায় উপহারের ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়। অনেকে কেবলমাত্র উপহার-উপঢৌকন প্রাপ্তির আশায় এই অনুষ্ঠান করে থাকে। অনেকে আবার উপহার দেয়ার ভয়ে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে আসতে ইতস্তত বোধ করে। তাই উপহার প্রাপ্তির মানসিকতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। সুন্নাত মোতাবেক অনুষ্ঠান করা। কেউ যদি খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় কিছু উপহার প্রদান করে সেটা কোন দোষের নয়।[৬৫]

৮. কুপ্রথা পালন ঃ আমাদের দেশীয় প্রচলনে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে অনেক অপচয় করতে দেখা যায়। যেমন আতশবাজী ফুটানো, গেইট করা, বা গেইটে বরকে আটকে রেখে টাকা আদায় করা, পন দেয়া। অন্দর সেলামী নেয়া, গায়রে মুহরাম পুরুষ-নারী কর্তৃক বর কনেকে চিনিমুখ বা মিষ্টিমুখ করানো, বর কনেকে দরজার সামনে আটকানো ইত্যাদি কুপ্রথা আমাদের

প্রকাশ- ১৯৯০), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।

৬১. *আত-তাহরীক,* ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ৭।

৬২. সূরা নূর ঃ ৩০।

৬৩. ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী,* (বৈরুত : দারুল ফিকর), ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

৬৫. *আদর্শ নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

www.pathagar.com

দেশে পালন করা হয়।[৬৬] বিশেষ করে পুরান ঢাকার বিবাহ ও ওয়ালীমাগুলোতে এসব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়।

৯. আলোকসজ্জা করা ঃ এখনকার ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের পূর্ব থেকে সারা বাড়ি আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। এটা অপচয় বৈ অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ

নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।[৬৭] রাসূল (সা) আরো বলেন,

من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه

"অর্থাৎ কোন ভাল মুসলমানের পরিচয় এই যে, সে বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।"[৬৮]

১০. বউ দেখার রসম ঃ ওয়ালীমাতে বউ দেখার রসম এই দেশে প্রচলিত। দল বেঁধে পুরুষ-মহিলা নতুন বধুকে দেখে থাকেন। এটা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। ইসলাম পুরুষদের এভাবে নববধূ দেখার অনুমতি প্রদান করে না। অথচ চরম গুনাহের এ কাজটি অতি উৎসাহের সাথে পালিত হয়। আল্লাহ্ পাক কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

"মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"[৬৯]

১১. পটকাবাজি করা ঃ আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ওয়ালীমাতে পটকাফুটানো ও আতশবাজি করার একটি কুপ্রথা চালু আছে। এটা শরিয়ত সমর্থন করে না। এটা থেকে বিরত থাকা উচিত। এটা অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণও হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (সা) বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

من تشبه بقوم فهو منهم

"যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে। সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।"[৭০]

উপসংহার

আমাদের কর্তব্য সুন্নাত তরীকানুযায়ী ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন করা। বিজাতীয় ও দেশীয় অপসংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। ওয়ালীমার মত তাৎপর্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেষ্টা করা আমাদের সকলের অপরিহার্য কর্তব্য।

---

৬৬. *আদর্শ নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৬৭. সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৭

৬৮. আবু ইসা তিরমিজি, *জামে তিরমিজি*, (বৈরুত : দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৪; ইবনে হাব্বান, *সহীহ ইবনে হাব্বান*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৬, বাবু মা'জায়া ফি সিফাতিল মুমিনীন।

৬৯. সূরা নূর ঃ ৩১।

৭০. আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪, কিতাবুল লিবাস।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

ইসলামে সন্তানের প্রতিপালন : পর্যালোচনা

ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ*

সন্তান মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম বড় নিয়ামত। এটি মানব বংশ বিস্তারের একমাত্র উপকরণ। সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা নবীগণের সুন্নাত। এটি হল সুন্নাতে আদীয়া। বহু পয়গাম্বর সন্তান লাভের জন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দুআ করেছেন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে।[১] ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই। মহানবী (সা) নিজে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, সন্তান লালন করেছেন এবং অধিক সন্তানের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। সন্তান লালনে পিতামাতার বহু কষ্ট ও ত্যাগ সইতে হয়। সন্তানের জন্য পিতামাতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন। মা জননী কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে পেটে ধারণ করেন। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সন্তান জন্ম দেন। তারপর সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণকামিতা বুকে নিয়ে তাকে লালন করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজকর্মের সবগুলোই উচ্চপর্যায়ের নেক আমল হিসাবে গণ্য। প্রত্যেকটি কাজের বিপরীতে বাবা ও মায়ের আমলনামায় পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। অধিকন্তু যে কাজটি যত কষ্টসাধ্য সে কাজের বিপরীতে দেওয়া নেক আমলটি তত অধিক মূল্যবান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সন্তান প্রতিপালনে যত্নশীল হওয়ার জন্য ইসলামে বিশেষ তাকীদ করা হয়েছে। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সন্তানদের ব্যাপারে যত্নশীল হও। অবহেলায় পথচ্যুত সন্তান নিজে যেমন ধ্বংস হয় তেমনি নিজ পিতামাতা ও অভিভাবকের জন্যও ধ্বংস টেনে আনে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে কু-সন্তান জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে নিজ পিতামাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে বাধ্য করবে।[২] পক্ষান্তরে নেক ও চরিত্রবান সন্তানের কারণে আল্লাহ তার পিতামাতাকে আখিরাতে উচ্চ সম্মান দান করবেন। কাউকে রাজমুকুটও দান করবেন। সন্তানের কারণে তাঁরা জান্নাত লাভের সুযোগ পাবেন। মানুষের মৃত্যুর পরে তিনটি জিনিসের কারণে কবরে তার জন্য নেক আমল পৌঁছতে থাকে। এ তিনটির মধ্যে অন্যতম হল নেক সন্তান।[৩]

---

* লেখক, মুহাদ্দিস, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক।

১. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৮; মারয়াম ১৯ : ৫; ফুরকান ২৫ ঃ ৭৪, সাফফাত ৩৭ : ১০০।

২. আল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদা ৫৪ : ২৯।

৩. সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্র.। বলা হয়েছে, আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার আমল লেখা হয়ে যায়। তবে তিনটি ক্ষেত্রে চালু থাকে। তা হল— সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও দুআকারী নেক সন্তান। (গবেষক)

www.pathagar.com

সন্তানকে আদর সোহাগ করা এবং উত্তমরূপে প্রতিপালনে মনোযোগী থাকা, মানবতাবোধ ও ঈমান পূর্ণতার পরিচায়ক। তাদেরকে মানুষরূপে গড়ে তোলার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন মা বাবাকে সর্বদা পাঠের জন্য নিম্নোক্ত দুআ শিখিয়ে দিয়েছে ;

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّجعَلنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে বানাও মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৪)

সন্তান প্রতিপালনে মহানবী অনেক মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। নিম্নে তাঁর দিকনির্দেশনাগুলো বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ থেকে বাছাই করে উপস্থাপন করা হল ঃ

উপযুক্ত মা নির্বাচন

সন্তানের শরীর ও মন কেমন হবে তা অনেকটা নির্ভর করে তার মায়ের উপর। ইসলাম তাই সন্তান গ্রহণের পূর্বে মা নির্বাচনে উপযুক্ততা বিচারের প্রতি তাকীদ করেছে। মা সন্তানের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠজন ও প্রথম শিক্ষিকা। মা ভাল হলে তার গর্ভের সন্তানও ভাল হবে। হাদীসে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ فَاِنَّ الْعِرْقَ دِسَاسُ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের বীর্য-ধারণ করার জন্য অর্থাৎ ভাল সন্তান লাভ করার জন্য খান্দান দেখে বিবাহ কর। কারণ সন্তানের মধ্যে পূর্বপুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিস্তার করে থাকে।[৪]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءِ الدِّمَنِ قَالُوْا وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمَرْءَةُ الْحَسْنَاءُ فِيْ مَنْبَتِ السُّوْءِ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা পতিত গন্ধময় স্থানে উদ্গত সবুজ ঘাস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! পতিত গন্ধময় স্থানের সবুজ ঘাস জিনিসটি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কুখান্দানের সুন্দরী নারী।[৫]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ اَلنَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُ هُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا

---

৪. সুনান ইবন মাজা ও মুসনাদে দায়লামী, সূত্র ঃ ড. হাবীবুল্লাহ মুখতার, *ইসলাম আউর তারবিয়্যাতে আওলাদ*, করাচী, দারুত তাসনীফ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২।

৫. হাদীসখানা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, দ্র. সুনান দারা কুতনী, সূত্র ঃ ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ভাল কিংবা মন্দ হওয়ার দিক থেকে মানুষ খনির ন্যায়। তন্মধ্যে যারা জাহিলী যুগে উচ্চ পর্যায়ের ছিল ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা উচ্চ পর্যায়ের বিবেচিত যদি তারা প্রাজ্ঞতা লাভ করে।[৬]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ لاَتَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ فَاِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা স্বগোত্রে বিবাহ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাক। কারণ তাতে সন্তান শারিরীক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে জন্ম। (ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা অধিক ভালবাসা ও অধিক সন্তানদানকারীনী নারীদের বিবাহ কর। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।[৭]

নবজাতকের আগমনে আনন্দ প্রকাশ

সন্তান জন্মের পর অভিভাবক ও আত্মীয়ের পক্ষ থেকে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব। ফকীহগণ বলেন, তৎক্ষণাৎ আনন্দ প্রকাশ কিংবা মুবারকবাদ দেওয়ার সুযোগ না পাওয়া গেলে পরে নবজাতক ও তার পিতামাতার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, মদীনায় মুহাজির সাহাবীগণের প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)। তাঁর জন্ম লাভে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করে ছিলেন।[৮]

নবজাতকের কানে আযান ও ইকামত বলা

নবজাতক শিশু তা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক জন্মগ্রহণের পর তাকে গোসল দিতে হয়। গোসল দানের পর সর্বপ্রথমে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

---

৬. হাদীসখানা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আবূ দাউদ তায়ালীসী গ্রন্থে বর্ণিত। সূত্র ঃ ডঃ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৭. দ্র. সুনান আবূ দাউদ, সুনান নাসায়ী ও মুস্তাদরাকে হাকিম, সূত্র ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, দেওবন্দ ঃ মিরাজ বুক ডিপো, সন অজ্ঞাত, পৃ. ২৬৭।

৮. বিষয়টি আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী (র) রচিত *'তুহফাতুল মাউলূদ'*-এ বিস্তারিত বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখার জন্য দ্র. ডঃ হাবীবুল্লাহ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

www.pathagar.com

হযরত আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান ইবন আলী (রা)-এর জন্ম হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কানে নামাযের আযানের মত আযান দিয়েছেন।[৯]

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَاَذَّنَ فِيْ اُذُنِهِ الْيُمْنٰى وَاَقَامَ فِيْ اُذُنِهِ الْيُسْرٰى لَمْ تَضُرُّهُ اُمُّ الصِّبْيَانِ.

হযরত হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, যেই নবজাতকের জন্মের পর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া হয় সেই নবজাতক 'শিশু-মাতৃকা' রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।[১০]

উল্লেখ্য অতি শৈশবে বিভিন্ন প্রকারের টীকাদান যেমন শিশুকে গোটা জীবনের বহু রোগব্যাধি থেকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখে তদ্রুপ জন্মত্তোর আযানের ধ্বনি ও বাক্যগুলো তাকে রূহানীভাবে ভয়ানক ব্যাধি থেকে নিরাপদ করে দেয়। তখন শিশুর মানসপটে ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সুদৃঢ় হয় এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও প্ররোচনা থেকে আশংকামুক্ত থাকে।

তাহনীক-মিষ্টিমুখকরণ

তাহনীক অর্থ হল খেজুর অথবা কোন মিষ্টিজাত দ্রব্য মুখে চিবিয়ে নরম করে শিশুর মুখে তুলে দেওয়া যেন রসের কিছু অংশ তার পেটে চলে যায়।[১১] হাদীসে আছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ.

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নবজাতক শিশুদের (দুআ করার জন্য) পেশ করা হত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাদরকে মিষ্টিমুখ করাতেন।[১২]

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَوَلَدَتْ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَوَضَعَتْ فِيْ حُجْرِهِ ثُمَّ دَعَا لَهُ بِتَمَرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ فِيْ جَوْفِهِ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَنَّكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ.

হযরত আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা শরীফ অবস্থানকালে স্বামী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র সূত্রে গর্ভবতী হন। তারপর মদীনা হিজরতের পথে কুবা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি সন্তানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এনে তাঁর কোলে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন খেজুর এনে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখ গহ্বরে কিছু থুথু ছিটিয়ে দেন। তাতে শিশুর পেটে সর্বপ্রথম যে

৯. জামি তিরমিযী, দেওবন্দ ঃ আসাহ্হুল মাতাবি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

১০. সুনান বায়হাকী, সূত্র ঃ মিশকাত, প্রাগুক্ত।

১১. *আল মুফরাদাত লিল ইমাম রাগিব ইস্পাহানী*, পৃ. ১৩৪।

১২. সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ ঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, সন ১৯৮৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯।

www.pathagar.com

জিনিসটি প্রবেশ করে তা হল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর থুথু মোবারক। তারপর তিনি শিশুকে মিষ্টিমুখ করালেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করলেন।[১৩]

শিশুর নামকরণ

মানুষের জীবনে নামের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভাল নাম ব্যক্তির জীবনে ভাল প্রভাব ফেলে। আর মন্দ নাম মন্দ প্রভাব ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাই কোন শিশুর মন্দ নাম পছন্দ করতেন না। এমনকি কারো কোন মন্দ নাম দেখলে তিনি তা কিঞ্চিত বদলিয়ে ভাল নামে পরিণত করে দিতেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ اَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, পিতার উপর নবজাতকের অন্যতম হক হল তার জন্য নামটি সুন্দর রাখা।[১৪]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَ اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা নবীগণের নামে নামকরণ কর। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হল 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রহমান'। আর সর্বাপেক্ষা সত্য নাম হল 'হারিস' ও 'হাম্মাম'। আর সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় নাম হল 'হরব' ও 'মুররা'।[১৫]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَخْبَثُهُ رَجُلٌ يُسَمّٰى مَلِكُ الْاَمْلَاكِ لَا مَلِكَ اِلَّا اللّٰهُ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় ব্যক্তি বিবেচিত হবে সে ব্যক্তি যার নাম রাখা হয়েছে 'মালিকুল আমলাক' (সম্রাটদের সম্রাট)। কারণ সম্রাটদের সম্রাট একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।[১৬]

قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ نُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا اَرْبَعَةَ اَسْمَاءٍ اَفْلَحُ وَنَافِعُ وَرَبَاحُ وَيَسَارُ.

সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন গোলামদের জন্য চারটি নাম যথা আফলাহ, নাফি, রাবাহ ও ইয়াসার না রাখি।[১৭]

---

১৩. সহীহ বুখারী, দেওবন্দ ঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, সন ১৯৮৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯।

১৪. *কানযুল উম্মাল*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৪১৭।

১৫. সুনান আবূ দাউদ ও সুনান নাসাঈ, সাহাবী হযরত আবূ ওয়াহহাব জাশমী সূত্রে বর্ণিত, মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।

১৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮।

১৭. সুনান ইবন মাজাহ, ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

www.pathagar.com

আকীকা করা

জন্মের সপ্তম দিবসে শিশুর জন্য আকীকা করা সুন্নাত। সপ্তম দিবসে না হলে পরবর্তী যে কোন সপ্তম দিবসে কিংবা সহজ সাধ্য দিবসে আকীকা আদায় করে নিতে হয়। আকীকা বস্তুত সন্তান লাভজনিত কারণে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ছেলে সন্তানের কারণে স্বভাবত মানুষ বেশি খুশি হয় বিধায় এক্ষেত্রে শুকরিয়া বড় আকারে করতে হয়। তাই ছেলে হলে দু'টি বকরী আর মেয়ে হলে একটি বকরী যবাহ করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিবসে সম্ভব না হলে পরবর্তী সপ্তম দিবসে কিংবা তার পরবর্তী সপ্তম দিবসে আদায় করাকেও কোন কোন ফকীহ মুস্তাহাব বলেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمّٰى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবজাতক নিজ আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। তাই জন্মের সপ্তম দিবসে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হবে।[১৮]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

হযরত আইশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে নবজাতক ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি সমবয়সী বকরী আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি বকরী আকীকা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ.

হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হাসানের জন্য একটি বকরী দ্বারা আকীকা করেন।[২০]

সাত. শিশুর মাথা মুণ্ডানো

সপ্তম দিবসে আকীকার পশু যবাহের পূর্বক্ষণে শিশুর মাথা মুণ্ডানো মুস্তাহাব। নবজাতকের মাথার চুল থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয় বিধায় এ চুল কামিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে শিশু আরাম বোধ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে এ মর্মে সমর্থন পাওয়া যায়। মাথা মুণ্ডানো সম্পর্কে হাদীসে আছে ঃ

---

১৮. সুনান আবূ দাউদ, সাহাবী হযরত সামুরা ইবন জুনদুব থেকে বর্ণিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

১৯. জামি তিরমিযী, দেওবন্দ, মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

২০. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

www.pathagar.com

عَنْ عَلِىٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِىْ رَأْسَهُ وَاصْدُقِىْ بِوَزْنِهِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا اَوْبَعْضَ دِرْهَمٍ.

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (নবাজাতক) হযরত হাসান (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি বকরী দ্বারা আকীকা করেন। তখন বলেছিলেন, 'হে ফাতিমা ! হাসানের মাথা মুড়িয়ে দাও এবং তার চুলের সমপরিমাণ ওজনে রৌপ্য সাদাকা করে দাও।' হযরত আলী (রা) বলেন, তারপর আমি তার কর্তিত চুল ওজন করে দেখলাম, সেগুলো এক দেরহাম বা কিছু বেশি ওজনের সমান।[২১]

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وَلِدَ لاَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللّٰهُ بِالاِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَ نَلْحِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانَ.

হযরত আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের নিয়ম ছিল যে, কারো নবজাতকের জন্ম হলে তার জন্য একটি বকরী যবাহ করা হত এবং বকরীর রক্ত দ্বারা নবজাতকের মস্তক রঞ্জিত করে দেয়া হত। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ দ্বারা ধন্য করলে এখন আমরা আকীকার জন্য একটি বকরী যবাহ করি, তার মস্তক মুণ্ডন করে দেই এবং মুণ্ডিত মস্তক জাফরান দ্বারা মাখিয়ে দেই।[২২]

শিশুর মুখে প্রথম বাক্য

শিশু দিনে দিনে বড় হয়। আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে শিখে। শব্দ, বাক্য ও ভাব প্রকাশে পরিচিত হয়। ইসলামের নির্দেশ হল, শিশু সর্বপ্রথমে যে বাক্যটি শিখবে সেটি যেন হয় 'কালিমায়ে তায়্যিবা'। কেননা যে জিনিসের সূচনা সুন্দর হয় আশা করা যায় যে, সে জিনিসের পরিণতিও হবে সুন্দর। একখানা হাদীসে আছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُوْا عَلَى صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজ শিশুদেরকে সর্বপ্রথম যে বাক্যটি শিখাবে সেটি হবে (কালিমা তায়্যিবা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[২৩]

খতনা করা

শিশুর খতনা করা সুন্নাত। এ কাজ যথাসময়ে করিয়ে নিতে হয়। খতনা ছেলেদের জন্য সুন্নত। মেয়েদের জন্য প্রয়োজন নেই। সুনান বায়হাকী শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা)-কে জন্মের

২১. জামি তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

২২. সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।

২৩. সুনান বায়হাকী, মুস্তাদরাকে হাকিম, ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

www.pathagar.com

সপ্তম দিবসে আকীকার সাথে খাতনাও করিয়ে দিয়েছিলেন। খতনা সম্পর্কে হাদীসের বাণী নিম্নরূপ ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالسِّوَاكُ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَ الْاِسْتِحْدَادُ وَالْاِخْتِتَانُ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মানুষের ফিতরাত অর্থাৎ স্বভাবজাত আমল হল, কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা, গোঁফ কাটা, মিসওয়াক করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার রাখা, নাভীর নিম্ন স্থান পরিষ্কার রাখা এবং খতনা করা।[২৪]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, খতনা করা ছেলেদের ক্ষেত্রে সুন্নাত আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক।[২৫]

মায়ের দুধ পান করানো

ইসলাম শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করেছে। এতে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। সন্তান নিরাপদে লালিত হওয়ার সুযোগ পায়। মাতৃদুগ্ধ পানের সহযোগিতার লক্ষ্যে ইসলাম দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য শরীয়তের বিধানকেও শিথিল করে দিয়েছে। হাদীসে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلٰى.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের অর্ধেক রহিত করে দিয়েছেন। আর মুসাফির, স্তন্যদানী ও গর্ভবতী মহিলা থেকে রমযানের রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা হ্রাস করে দিয়েছেন।[২৬]

উল্লেখ্য খলীফা হযরত উমরের শাসনমালে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি মা'দের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْقُوْا اَوْلاَدَكُمْ لَبَنَ الْبَغْيِ وَالْمَجْنُوْنَةِ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ সন্তানদেরকে দেহপসারিণী ও পাগল মহিলার দুধ পান থেকে দূরে রাখ।

কন্যা সন্তান লালনে যত্ন নেওয়া

জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানকে অপমানের কারণ মনে করা হত। ফলতঃ জন্মের পর কন্যা সন্তান জীবিত দাফন করার মত বর্বরতা মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম শক্ত হাতে এ

---

২৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ডঃ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

২৫. মুসনাদে আহমদ, সাহাবী হযরত শাদ্দাদ ইবন আউস সূত্রে বর্ণিত, ডঃ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

২৬. সুনান আবূ দাউদ, জামি তিরমিযী, সুনান নাসায়ী, মিশকাত, পৃ. ১৭৮।

www.pathagar.com

বর্বরতা ও অমানবিকতার দমন করে এবং কন্যা সন্তানের লালনকে উৎসাহিত করে। হাদীসে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন করে কিয়ামত দিবসে আমি এবং সে এমনভাবে থাকবো- কথাটি বলে তিনি নিজ আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে একত্রিত করে দেখান।[২৭]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلٰاثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلاثُ اَخَوَاتٍ اَوْبِنْتَانِ اَوْاُخْتَانِ فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَ اتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনজন কন্যা সন্তান কিংবা তিনজন বোন কিংবা দুই কন্যা বা দুই বোন আছে আর সে তাদের সাথে ভাল আচরণ করে চলে, তাদের সেবা যত্নে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৮]

একখানা হাদীসে আরো আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, পর্দাশীল কন্যারাই (পিতামাতার) উত্তম সন্তান।

সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

স্নেহ ভালবাসা আদর যত্ন ও সোহাগের ক্ষেত্রে পিতামাতার কাছে পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান হকদার। তাদের মধ্যে স্নেহদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যবধান করা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। হাদীসে আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য বজায় রেখে চল, নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য বজায় রেখে চল, নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য বজায় রেখে চল।[২৯]

---

২৭. সহীহ মুসলিম, সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

২৮. মুসনাদে হুমায়দী, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণিত দ্র. ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

২৯. আবূ দাউদ, ইবন হিব্বান, সাহাবী হযরত নুমান ইবন বাশীর সূত্রে বর্ণিত। সূত্র ঃ ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

www.pathagar.com

সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করা

সন্তান নিজে কর্মক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভিভাবক ও পিতামাতার কাছে দায়গ্রস্ত থাকে। সে কতদিন বেঁচে থাকবে আর বেঁচে থাকলেও পিতামাতার দায় কতটুকু শোধ করবে সে প্রশ্ন কোন মানবতার প্রশ্ন নয়। ইসলামে সন্তান লালনের জন্য এ সময়ে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটিকে উত্তম ইনফাক ও উত্তম নেক আমল বলে গণ্য করা হয়েছে। সন্তানের জন্য ব্যয়কৃত প্রতিটি পয়সাকে সাদাকাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাদাকারূপে হাদীসে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন,

دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُ اَجْرًا اَلَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ

টাকা পয়সা বিভিন্নভাবে খরচ হয়। তন্মধ্যে কোন টাকা তুমি খরচ কর আল্লাহর পথে জিহাদে, কোনগুলো খরচ কর গোলাম আযাদের কাজে, কোনগুলো খরচ কর গরীব মিসকীনের লালনে আর কোনগুলো খরচ কর নিজ পরিবার পরিজন ও সন্তানের জন্য। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সওয়াবের ব্যয় হল সেই টাকা পয়সা যেগুলো নিজ পরিবার ও সন্তানের জন্য ব্যয় করে থাক।[৩০]

সুস্থতা ও স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হওয়া

অভিভাবকের জন্য সন্তানের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। একটি নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত শিশুর শরীর ক্রমে প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এ সময়ে সঠিক যত্নশীলতা না থাকলে অনেক সময় বড় ধরনের ক্ষতি এবং অঘটন ঘটে যায়। সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও এ পর্যায়ে খামখেয়ালী করা ইসলামের দৃষ্টিতে বড় ধরনের অপরাধ। হাদীসে বলা হয়েছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, মানুষ গুনাহগার ও অপরাধী বিবেচিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যাদের ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে সেই পোষ্য লোকেরা তার খামখেয়ালীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩১]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِبُّوا الصِبْيَانَ وَارْحَمُوْهُمْ

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা শিশুদের স্নেহ কর এবং তাদের প্রতি দয়াশীল হও।

সন্তানের চিকিৎসার প্রতি নজর রাখা

শিশু বয়সে রোগ ব্যাধি বেশি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুদের চিকিৎসার জন্য তাকীদ দিতেন। শিশুদের প্রতি 'বদনজর' লাগাকে সত্য বলে অভিহিত করেছেন। আম্মাজান হযরত

৩০. *সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২।

৩১. *সুনান আবূ দাউদ,* সহীহ মুসলিম গ্রন্থেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালিহীন,* নয়াদিল্লী, সলীম বুক ডিপো, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ১৪৪।

www.pathagar.com

আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে কোন রোগীর শুশ্রুষা করতে গেলে তাকে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিতেন,[৩২]

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاسَ اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّشِفَائُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سُقْمًا.

কখনো কখনো নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন,[৩৩]

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اَصَابَ الدَّوَاءَ بَرِءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রোগের জন্য চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং যখন রোগ অনুসারে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করা হয় তখন আল্লাহর হুকুমে রোগ নিরাময় হয়ে যায়।[৩৪]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ রোগ ও চিকিৎসা উভয় দান করেছেন। প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা নির্ধারিত আছে। কাজেই চিকিৎসা কর। হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো না।[৩৫]

ইমাম বুখারী বর্ণিত একখানা হাদীসে নবীজী (সা) আরো বলেন, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলোর মধ্যে তোমাদের কোন চিকিৎসা রাখেননি।

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করা

অসুস্থের চিকিৎসা করা যায় কিন্তু হায়াত প্রদান করা যায় না। সব মানুষকে তার নির্ধারিত আয়ুর শেষে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে বয়স্ক হয়ে মারা যাওয়ার চেয়ে পূর্বে মারা গেলে মানুষের কাছে কষ্ট বেশী লাগে। শিশুমৃত্যু আরো কষ্টদায়ক বেশী। তাই এ মুহূর্তে সবর ও ধৈর্যধারণ করাকে অধিক সওয়াবের জিনিস বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসে আছে ঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তির শিশু সন্তান ইন্তিকাল করে তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ ফিরিশতাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার (অমুক) বান্দার সন্তানকে ছিনিয়ে

৩২. *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯।

৩৩. *জামি তিরমিযী ও মুস্তাদরাকে হাকিম,* হযরত ইবন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত।

৩৪. *সুনান আবূ দাউদ, সহীহ মুসলিম, মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭।

৩৫. *সুনান আবূ দাউদ, মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

www.pathagar.com

নিয়ে এসেছো ? তারা উত্তর দেয়, জ্বি হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি তার হৃদয়খণ্ডকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছো ? তারা উত্তর দেয়, জ্বি হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, তখন আমার বান্দা কি মন্তব্য করেছে? তারা উত্তর দেয়, সে আপনার উদ্দেশ্যে আল্লাহমদুলিল্লাহ ও ইন্নালিল্লাহ পড়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার সেই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ প্রাসাদ নির্মাণ কর এবং এ প্রাসাদে 'বায়তুল হামদ'-এর নামফলক স্থাপন কর।[৩৬]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ كُنَّ امْرَءَةٌ يَمُوْتُ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ اِلاَّ كَانُوْا لَهَا حَجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَءَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاثْنَانِ.

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের যে সব মহিলার তিনটি শিশু ইন্তিকাল করেছে এ শিশুরা তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষাকবচ হবে। জনৈক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি দু'টি শিশু মারা যায় ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দু'টি শিশু মারা গেলেও।[৩৭]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ جِيْئَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ حَتّٰى تَدْخُلَ اٰبَائُنَا فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَاٰبَائُكُمْ.

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মুসলিম পিতামাতার যে সন্তান প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে ইন্তিকাল করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত করে জান্নাতের গেইটে রাখা হবে। তাদেরকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা উত্তর দিবে, না, আমরা প্রবেশ করবো না। যতক্ষণ না আমাদের পিতামাতা প্রবেশ করবেন। তখন তাদের বলা হবে, ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে সঙ্গে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।[৩৮]

ইয়াতীম সন্তানের লালন

পিতৃহীন সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াতীম হিসাবে পরিগণিত। এ ইয়াতীমদের লালন পালনের ভার তার নিকটাত্মীয় নতুবা সমাজের উপর ন্যাস্ত থাকে। সন্তানের জন্য যেমন পিতামাতা জবাবদেহী করতে হয় ইয়াতীমদের ব্যাপারে তদ্রুপ তার নিকটাত্মীয় ও সমাজের লোকজন মহান আল্লাহর কাছে জবাবদেহী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে ইয়াতীম ছিলেন। ইয়াতীমদের প্রতি তাই তাঁর স্নেশীলতাও বেশি ছিল। হাদীসে আছে ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى

---

৩৬. *জামি তিরমিযী,* সাহাবী আবূ মূসা আশআরী সূত্রে বর্ণিত। *মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৩৭. *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম,* দ্র. *মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৩৮. *তাবারানী,* হযরত উম্মে হাবীবা সূত্রে বর্ণিত, *নাসায়ী,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমি ও ইয়াতীমের লালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো— কথাটি বলে নবীজী (সা) নিজের শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন।[৩৯] রাসূলুল্লাহ (সা) একবার দু'আ করে বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِىْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمُ وَالْمَرْأَةُ

হে আল্লাহ ! আমি দুর্বলদ্বয় অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর হক নষ্টকারীর বিরুদ্ধে তোমার কাছে অভিযোগ দায়ের করছি।[৪০]

সন্তানদের ঈমান শিক্ষাদান

শৈশব থেকেই সন্তানদেরকে ঈমানের তালীম দিতে হয়। তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিচিত করতে হয়। তাদেরকে হালাল-হারাম ও পাক পবিত্রতা সম্পর্কে সজাগ করতে হয়। এটি মা বাবা ও অভিভাবকবৃন্দের উপর আবশ্যকীয় ফরয। এ ফরয লঙ্গিত হলে কিয়ামত দিবসে জবাবদেহী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুদেরকে তাদের উপযোগী ভাষায় ঈমাদের তালীম দিতেন। সাহাবী ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা আমাকে বলেছিলেন,

يَا غُلَامُ اِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَاِنِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

হে প্রিয় বৎস ! তোমাকে কয়েকটি কথা বলে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর হুকুমের হিফাযত করবে তাহলে আল্লাহ তোমার হিফাযত করবেন। তুমি হক্কুল্লাহকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে, দেখবে আল্লাহ্ তোমারই সম্মুখে বিদ্যমান। তুমি কোন প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। তুমি সাহায্য চাইলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। তুমি মনে রাখবে, যদি সমগ্র সৃষ্টজগত তোমার উপকার করতে চায় তাহলে তোমার জন্য যতটুকু কল্যাণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন তার বেশি তারা কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। আর সমগ্র জগৎ যদি তোমার অনিষ্ট করতে চায় তাহলে তোমার জন্য যতটুকু অকল্যাণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন তার বেশি তারা কোনই অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হবে না। এ ব্যাপারে লেখার কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, লেখা কাগজের কালি শুকিয়ে গেছে।[৪১]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْيُنَصِّرَانِهِ اَوْيُمَجِّسَانِهِ

---

৩৯. *জামি তিরমিযী,* ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালিহীন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

৪০. *সুনান নাসাঈ,* ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৪১. *জামি তিরমিযী,* হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সকল সন্তান ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে হয়ত ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।[৪২]

নামায ও কুরআনের তালীম দেওয়া

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দাও। দশ বছরে নামায না পড়লে তাদের প্রহার কর। এ বয়সে তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও।[৪৩] হাদীসে আরো আছে,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدِّبُوْا اَوْلاَدَكُمْ عَلٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اٰلِ بَيْتِهِ وَ تِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْاٰنِ فِىْ ظِلِّ عَرْشِ اللّٰهِ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ مَعَ اَصْفِيَائِهِ.

হযরত আলী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নিজ সন্তানদের তিনটি জিনিস শিখাও। তোমাদের নবীর প্রতি ভালবাসা পোষণ, আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা পোষণ এবং পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত। কারণ যারা পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে তারা যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সেদিন নবী ও ওলীগণের সাথে আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে।[৪৪]

আহকামে শরীতের তালীম দান

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِامْتِثَالِ الاَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِىْ فَذَالِكَ وَقَايَةٌ لَهُمْ مِنَ النَّارِ

মহানবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজ সন্তানদেরকে শরীয়তের আদিষ্ট বিষয়াদি পালনে এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার হুকুম দাও। কারণ এটিই হল তাদের জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকার উপায়।[৪৫]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, দীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।[৪৬]

---

৪২. *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

৪৩. *সুনান আবূ দাউদ,* হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস সূত্রে বর্ণিত। *মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৪৪. *তাবারানী,* ডঃ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

৪৫. *ইবন জারীর তাবারী,* ডঃ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৪৬. *ইবন মাজা, মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

শিষ্টাচার শিক্ষাদান

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ব্যক্তি নিজ সন্তানকে শিষ্টাচারিতার শিক্ষাদান করা এক সা সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার চেয়েও বেশি মূল্যবান।[৪৭]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدً اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ.

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, পিতা নিজ সন্তানকে যে উপঢৌকন দান করে তাতে সর্বোত্তম উপঢৌকন হল সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষাদান।[৪৮]

সন্তানের বিবিধ হক

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْغُلَامِ اَنْ يَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُمَاطُ عَنْهُ الْاَذٰى فَاِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِيْنَ اَدَّبَ وَاِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِيْنَ عَزَلَ عَنْ فِرَاشِهِ فَاِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً ضَرَبَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَاِذَا بَلَغَ سِتَّ عَشَرَةَ زَوَّجَهُ اَبُوْهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ قَدْ اَدَّبْتُكَ وَعَلَّمْتُكَ وَاَنْكَحْتُكَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَعَذَابِكَ فِى الْاٰخِرَةِ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, পুত্র সন্তানের অধিকার হল তার জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করা, নাম রাখা, মাথা মুণ্ডিয়ে দেওয়া। তারপর ছয় বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে শিষ্টাচারিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া। তারপর নয় বছরে পৌঁছলে তার শয়নের বিছানা পৃথক করে দেওয়া। তারপর তের বছরে পৌঁছলে নামায রোযার জন্য তাকে প্রয়োজনে প্রহার করা। তারপর ষোল বছরে পৌঁছলে পিতা তাকে বিবাহ করিয়ে দিবে। তারপর তার হাত ধরে বলবে, আমি তোমাকে শিষ্টাচারিতার প্রশিক্ষণ দান করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি তারপর তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যে, তুমি যেন দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত না হও এবং আখিরাতে আযাবগ্রস্ত না হও।[৪৯]

সন্তান কন্যা হলে তাকে অতিরিক্ত পর্দার বিষয়ে তালীম দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ শালিকা হযরত আসমাকে বলেছিলেন ঃ

يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ اَنْ يُرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

হে আসমা ! মেয়েরা যখন প্রাপ্ত বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন তাদের শরীরের কোন অংশ অনাবৃত হওয়া জায়িয নেই। তবে এইটুকু এইটুকু— এ কথা বলে মহানবী (সা) মুখমণ্ডল ও (কব্জি পর্যন্ত) হস্তদ্বয়ের দিকে ইশারা করেছেন।[৫০]

---

৪৭. *জামি তিরমিযী, মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩।

৪৮. *তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩।

৪৯. *ইবন হিব্বান,* হযরত আনাস সূত্রে বর্ণিত, ডঃ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

৫০. *সুনান আবূ দাউদ,* ডঃ হাবীবুল্লাহ মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) থেকে সবচেয়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করেন। এসব মহান ব্যক্তির কল্যাণ ও বরকতে তিনি কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ফারাইয তথা সমস্ত দ্বীনী 'ইলমের সাগরে পরিণত হন; যার কারণে তিনি কূফায় অবস্থানকাল পর্যন্ত মুফতীর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।[৬] তিনি যখন পূর্ণ বয়সে উপনীত হন তখন শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম-এর অধিকাংশ জীবিত ছিলেন না তবুও সেই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) (মৃত ৬৮ হিজরী), হযরত 'আব্দুল্লা ইব্ন জুবাইর (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) (মৃ. ৯৩ হিজরী), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা), হযরত আবূ মাস'উদ (রা) প্রমুখ 'আলিম সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৭] একদল বিখ্যাত তাবি'ঈ-এর নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁরা হলেন হযরত জা'ফর ইব্ন আবী মুগীরা (র), হযরত বিশর জা'ফর ইব্ন ইয়াস (র), হযরত আয়্যুব (র), হযরত আল-আ'মাশ (র), 'আতা ইব্ন সাইব (র) প্রমুখ।[৮]

হাদীস

হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) তাবি'ঈগণের মধ্যে একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (রা), হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), হযরত আবূ মূসা আল-বদরী (রা), হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা), হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর হালকা থেকে হাদীসের ক্ষেত্রে অধিক উপকৃত হন।[৯]

التفسير، واكثر روايته عنه.

দ্র. *তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১-২ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৭৯।

৬. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা',* ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৭. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১; ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'ইয়ান,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা,* ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩২১; দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাস্সিরুন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

৮. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

৯. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৬; ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা',* ১ম খণ্ড, পৃ; ২১৬; তাঁর হাদীস বর্ণনা সম্পর্কে মুজাহিদ (র) ইব্ন সা'দ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,
'একবার ইবনুল 'আব্বাস (রা) ইব্ন জুবাইর (র)-কে বললেন, কিছু হাদীস শোনাও। ইব্ন জুবাইর (র) অতি বিনয়ের সাথে বললেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি হাদীস শুনাই কি করে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, এটাও আল্লাহ্র এক বিশেষ করুণা যে, তুমি আমার সামনে হাদীস বর্ণনা করছ। যদি সঠিক বর্ণনা কর তাহলে ভাল। আর যদি ভুল কর তাহলে আমি ঠিক করে দিব।'

www.pathagar.com

ফিক্‌হ

তিনি ফকীহ্ 'আলিমগণের মধ্যেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ শাস্ত্রের জ্ঞানও তিনি হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট থেকে অর্জন করেন। তিনি ফিক্‌হী জ্ঞানে এত পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন যে, তৎকালীন ফিক্‌হের কেন্দ্র বলে পরিচিত কূফার তাবি'ঈ মুফতীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এমনকি কিছুদিন কূফার[১০] কাজী পদও অলংকৃত করেন। পরে কূফার কাজী আবূ বুরদা ইব্‌ন আবী মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন।[১১] তিনি কিছু দিন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন মাস'উদের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[১২] 'ইলম ও ইফতার কেন্দ্রভূমি মক্কায়[১৩] যখন আসতেন তখন সেখানেও ফাতওয়ার[১৪] কাজে নিয়োজিত থাকতেন। হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হযরত ইব্‌ন জুবাইর (র)-এর ফাতওয়ার উপর এত আস্থা ছিল যে, কূফার কোন লোক যদি তাঁর নিকট ফাতওয়া চাইতে আসত তাহলে তিনি তাকে বলতেন, তোমাদের ওখানে কি সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর নেই ?'[১৫] তিনি তালাক সংক্রান্ত মাসআলায় একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

দ্র. *আত-তাবাকাত,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায,* ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।

১০. **কূফা :** ফুরাতের তীরে অবস্থিত ইরাকের একটি শহরের নাম। ইহা নাজাফ প্রদেশের একটি বিচারালয়। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত 'আলী (রা) এখানে রাজধানী বানান ও এখানেই শাহাদাত বরণ করেন। ৭৪৯ হিজরীতে 'আব্বাসীয়গণ একে বাগদাদ হিসাবে তৈরি করেন। দ্র. লুইস মালূফ, *আল-মুনজিদ,* ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল মাশরিফ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৪৭৫।

১১. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা',* ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; ইব্‌ন কুতাইবা, *আল-মা'আরিফ,* পৃ. ১৯৭; ইবনুল যাওযী, *সিফাতুস সাফওয়ান,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩; *ই'লামুল-মুওয়াক্কিঈন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১২. ইব্‌ন 'আবদি রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল-ফারীদ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৯।

১৩. **মক্কা :** সৌদী 'আরবের পূর্বনাম মক্কা মোকাররমা। হেজাজ, নজদ ও আসির অঞ্চল নিয়ে বর্তমান সৌদী 'আরব গঠিত। রাজধানী রিয়াদ, বড় শহর জেদ্দা এবং মক্কা। এর আয়তন প্রায় ৮,৬৪,৮৬৯ বর্গ কিলোমিটার। বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনায় মুসলিম শাসন স্বীকৃত হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পূর্বেই সমগ্র 'আরব উপদ্বীপ ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে।
দ্র. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, *মুসলিম জাহান* (ঢাকা·: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী/ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৬৩২-৬৪২।

১৪. **ফাত্‌ওয়া :** ফাত্‌ওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া। চাই সে প্রশ্নটি শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কিত হোক অথবা পার্থিব কোন বিষয় হোক। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় শুধুমাত্র দীনী কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ফাত্‌ওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
দ্র. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, *ফাতাওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ২১৫; মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন,
الفتوى : هو الحكم الشرعي يعنى ما افتى به العالم و هى اسم من افتى العالم اذا بين الحكم.
দ্র. *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮১ হিজরী/ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৪০৭।

১৫. ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আ'ইয়ান,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪; ইব্‌ন সা'দ, *আত-তাবাকাত,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.

www.pathagar.com

ইব্ন 'ইমাদ আল-হাম্বলী বলেন, তাবি'ঈগণের মধ্যে তালাক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানতেন হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র)।[১৬]

সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর ব্যক্তিসত্তাটি ছিল বহুজ্ঞান ও শাস্ত্রের সমাহারপূর্ণ। যার কিছু কিছু করে সবটুকু ধারণ করত সেই যুগের বহুজ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু ইব্ন জুবাইর (র) এককভাবে সেই সব জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।[১৭] খসীফ বর্ণনা করেছেন, তালাকের মাস'আলায় সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন হযরত সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র)। হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে ছিলেন, 'আতা' (র), হালাল-হারামে' হযরত তাউস (র), তাফসীর শাস্ত্রে মুজাহিদ (র)-এর একক ব্যক্তিসত্তা।[১৮]

তিনি জ্ঞান বিতরণে ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন, হযরত 'আব্দুল মালিক (র), হযরত 'আব্দুল্লাহ (র), হযরত ইয়া'লা ইব্ন হাকীম (র), হযরত ইয়া'লা ইব্ন মুসলিম (র), হযরত আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ (র), হযরত আবূ যুবাইর মাক্কী (র), হযরত আদাম ইব্ন সুলাইমান (র), হযরত আশ'আছ ইব্ন আবীশ-শাছ (র), হযরত যার ইব্ন 'আব্দিল্লাহ মুবাহ্হিরী (র), হযরত সালিম আল-আফতাস (র), হযরত সালামা ইব্ন কুহায়ল (র), হযরত 'আতা ইব্ন সাইব (র) প্রমুখ।[১৯]

তাকওয়া

'ইবাদত, যুহ্দ ও তাকওয়ায় তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। এ ব্যাপারে তাবি'ঈগণের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে। খোদাভীতি তাঁর অন্তরে এত দৃঢ়মুল হয়েছিল যে সবসময় তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত থাকত। রাতের অন্ধকারে তাঁর 'ইবাদত ও মা'শুকের সাথে একান্ত সংলাপের সময় অস্থিরভাবে কাঁদতেন।[২০] তাঁর নামায ছিল একাগ্রতা ও খুশু-খুযুতে পরিপূর্ণ।

২৫৭; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল-লুগাত,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; ড: হুসাইন আয্-যাহাবী স্বীয় গ্রন্থে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন,

وكان يقول لاهل الكوفة اذا اتوه ليسألوه عن شئ : اليس فيكم ابن ام الدهماء؟ (يعنى سعيد بن جبير)

দ্র. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩; *তাবাকাতুল মুফাসসিরূন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

১৬. মূল 'আরবী : اعلم التابعين بالاطلاق سعيد بن جبير দ্র. *শাযারাতুয-যাহাব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

১৭. ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আ'ইয়ান,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; *তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ,* ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯; আবুল কাসেম আত্-তাবারী বলেন, هو ثقة، حجة، أمام على المسلمين، وذكره ابن حبان فى الثقات দ্র. *তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

১৮. মূল আরবী :

قال خصيف : وكان من اعلم التابعين بالطلاق سعيد ين المسيب وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاوس، وبالتفسير ابو الحجاج بن جبير، واجمعهم لذلك كل سعيد بن جبير.

দ্র. ড: হুসাইন আয্-যাহাবী, *তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

১৯. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৮; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহযীবুত-তহাযীব,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

২০. *সিফাতুস সাফওয়ান,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

কখনও কখনও এক রাকা'আতে পুরো কুরআন শেষ করতেন। ভয়ংকর শাস্তি ও 'আযাবের আয়াতগুলো বার বার আওড়াতেন।[২১] তিনি সুব্হে সাদিক থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত যিকরে মশগুল থাকতেন। এসময় কেবল আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলতেন না। রমযান মাসে তাঁর সবধরনের 'ইবাদতের মাত্রা বেড়ে যেত। এ সময় তিনি একরাত্রে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর কিরা'আত, পরের রাত্রে হযরত যাইদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর কিরা'আত এবং অন্য রাত্রে যে কোন প্রসিদ্ধকারীর কির'আত দ্বারা নামায পড়াতেন।[২২] তিনি 'উলামায়ে সূ' (علماء سوء) বা অসৎ 'আলিমদেরকে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। হিলাল ইব্ন জানাব একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মানুষের ধ্বংস ও বিপর্যয় কোথা থেকে হবে ? জওয়াবে বলেন, তাদের 'আলিমদের থেকেই।[২৩] হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ[২৪] তাঁকে সমীহ করতেন। তঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনও করতেন। তাঁকে কূফার জামে' মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। কূফার কাজী হিসাবেও নিয়োগ দেন। কিন্তু কাজীকে 'আরব বংশোদ্ভূত হতে হবে এ শর্তে কূফাবাসীদের দাবী প্রেক্ষিতে তাঁকে সরিয়ে আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে তাঁর স্থানে নিয়োগ দেন। তবে হাজ্জাজ আবূ মূসাকে বলে দেন তিনি যেন ইব্ন জুবাইর (র)-এর সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ না করেন।[২৫] তাঁর সাথে হাজ্জাজের এত সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি বিন্দুমাত্র তার দ্বারা প্রভাবিত

---

২১. ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২৬০; হযরত সা'ঈদ ইব্ন 'উবায়দ বর্ণনা করেছেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন জুবাইরকে নামাযের ইমামতি অবস্থায় (إذ الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبونه فى الحميم) এ আয়াতটি বার বার আওড়াতে দেখেছি। দ্র. সূরা আল-মু'মিন : ৪০ : ৭১। হযরত মূসা ইব্ন আইউব বলেন, আমি তাকে (واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله) এ আয়াত বার বার আওড়াতে দেখেছি। দ্র. সূরা আল-বাকারা ২ : ২৮১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

২২. *তাবাকাতুল মুফাসসিরূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৯; ড: হুসায়ন আয্-যাহাবী এ সম্পর্কে বলেন,

كان سعيد بن جبير هو منا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره.

দ্র. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২।

২৩. ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬২।

২৪. **হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ :** আবূ মুহাম্মদ আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইবনুল হাকাম ইব্ন আবূ 'আকীল ইব্ন মাস'উদ ইব্ন 'আমের ইব্ন মু'তাব ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব আস-সাকাফী। উমাইয়্যা খলীফা 'আব্দুল মালিকের খিলাফতকালে তাঁকে প্রথমে হিজাযের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এ সময় তিনি হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (র)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবাইর শাহাদাৎ বরণ করেন। অতঃপর ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁকে 'ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তিনি ২০ বৎসর এ দায়িত্ব পালন করেন এবং ৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ মতান্তরে ৫৪ বৎসর। দ্র. *তাহযীবুল আসমা'*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

২৫. ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।

www.pathagar.com

ছিলেন না। এ কারণে ইব্ন আশ'আছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন, তখন ইব্ন জুবাইর (র) তাঁর সঙ্গী হন এবং হাজ্জাজের সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকলকে আহ্বান জানান।[২৬] পরবর্তীতে হাজ্জাজ তাঁকে বন্দী করে ও হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময় উভয়ের মাঝে এক গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ সংঘটিত হয়। এক পর্যায়ে হাজ্জাজ তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি কাঁদতে শুরু করলেন, ইব্ন জুবাইর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাঁদছো কেন ? লোকটি বললেন, আপনার হত্যার নির্দেশ শুনে। বললেন, এ জন্য কাঁদার প্রয়োজন নেই। এ ঘটনা অনাদি কাল থেকে আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,[২৭]

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا.

'এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে (ভাগ্য লিপিতে) লিখে রাখিনি।'

এরপর হাজ্জাজ তাঁর সামনে চামড়া বিছানোর নির্দেশ দিলেন। তখন ইব্ন জুবাইর দু' রাকা'আত নামায আদায়ের অনুরোধ করলেন, তখন হাজ্জাজ বলেন পূর্বদিক মুখ করে পড়তে, তখন তিনি اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ও اَيْنَمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আয়াতদ্বয় পাঠ করেন।[২৮]

তারপর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'আ করেন, হে আল্লাহ ! আমার হত্যার পর তাকে আর কাউকে হত্যার ক্ষমতা ও সুযোগ দেবেন না। হাজ্জাজের নির্দেশে জল্লাদের কোষমুক্ত তরবারী ঝলকে উঠে এবং সত্যের এ সৈনিকের মাথা মাটিতে তড়পাতে থাকে। এ সময় তার কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছিল 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৯৪ সনের শা'বান মাসে। এ সময় ইব্ন জুবাইর (র)-এর বয়স হয়েছিল ৫৭ মতান্তরে ৪৯ বৎসর। ওয়াসিতে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৯]

---

২৬. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

২৭. সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : ২২।

২৮. সূরা আল-আন'আম : ৬; ড: মুহাম্মদ 'আব্দুল মাবুদ উল্লেখ করেছেন, হাজ্জাজ মাথা নিচু করার নির্দেশ দিলে তিনি স্বেচ্ছায় আনুগত্যের সাথে মাথা নিচু করে পাঠ করতে থাকেন,

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى

'আমি এই মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আসার সেই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব। তারপর সেই মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো।' দ্র. সূরা তাহা : ৫৫।

২৯. *তাহযীবুল-কামাল ফি আসমায়ির রিজাল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; আয্-যাহাবী, *তারিখুল-ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮; *শাযারাতুয-যাহাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০; ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; ইব্ন হাতিম, *আল-জারাহ ওয়াত তা'দীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯-১০; ড: হুসায়ন আয্-যাহাবী আপন গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

و قد قتل فى شعبان سنة ٥٧ خمس و تسعين من الهجرة، وهو ابن تسع واربعين سنة قال ابو الشيخ قتله الحجاج صبرا.

www.pathagar.com

তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান

সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) আল-কুরআনের একজন প্রসিদ্ধ মুক্বরী ছিলেন। তারজী[৩০] এর সাথে কির'আত পড়তেন। কিন্তু গানের সুরে তেলাওয়াত করা তাঁর খুবই অপছন্দ ছিল।[৩১] আবূ শিহাব বর্ণনা করেছেন, রমযান মাসে সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) আমাদের নামায পড়াতেন। তিনি তারজী করে কির'আত পড়তেন। মাঝে মাঝে একই আয়াত দু'বার পাঠ করতেন। 'আতা' ইব্ন আস্-সায়িব বলেন : একদিন সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমার পরে তোমরা এ কি নতুন জিনিস চালু করেছো ? লোকটি বললো : আপনার পরেতো আমরা নতুন তেমন কিছু চালু করিনি। তিনি বললেন, এ অন্ধ লোকটি ও ইব্নুস সায়কল তোমাদেরকে গানের সুরে কুরআন শিখায়।[৩২]

সব মাশহুর কির'আতের তিনি ছিলেন একজন 'আলিম। হযরত ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্দিল মালিক বর্ণনা করেন, সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। নিয়ম ছিল একরাতে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-এর কির'আত অনুযায়ী কুরআন শুনাতেন, অন্য রাতে শুনাতেন হযরত যাইদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর কির'আত অনুযায়ী, এভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে পালাক্রমে প্রতিরাতে প্রসিদ্ধ মুক্বরীদের কির'আত শুনাতেন।[৩৩] কির'আত ও তাফসীর শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন এ শাস্ত্রদ্বয়ের ইমাম হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট থেকে। আয়াতের শানে-নুযূল এবং তার তাফসীর ও তা'বীলের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। যখন তাঁর সামনে কোন আয়াত পাঠ করা হত, তখন তিনি তাঁর বিস্তারিত প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা বলে দিতেন। আবূ ইউনুস (র) বর্ণনা করেন, একবার আমি সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর-এর সামনে এ আয়াত وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.[৩৪] পাঠ করলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন, মক্কার কিছু মাযলুম মানুষ। আমি বললাম, আমি এমন লোকদেরই (অর্থাৎ হাজ্জাজের যুলুমের শিকার) নিকট থেকে এসেছি। হযরত

দ্র. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩; আবূশ-শায়খ (র)-এর মতে তাঁকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

৩০. **তারজী** : শাহদাতাইনকে প্রথমে নিম্নস্বরে উচ্চারণ করে পরে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করাকে তার'জী বলে। দ্র. ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ ও ড. হামিদ সাদেক, *মু'জামুল লুগাতুল-ফুকাহা* (পাকিস্তান : ইদারাতুল-কুরআন, তা: বি:), পৃ. ১২৮।

৩১. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৬; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।

৩২. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

৩৩. ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আ'ইয়ান,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; ড: হুসায়ন আয্-যাহাবী, *তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯; শামসুদ্দীন আদ্-দাউদী এ সম্পর্কে বলেন,

عن اسماعيل بن عبد الملك انه قال : كان سعيد بن جبير هو منا فى شهر رمضان فيقرأ الليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره.

দ্র. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

৩৪. সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৮৯।

www.pathagar.com

সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর বললেন, ভাতিজা ! আমরা তার বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কি আর করা যাবে, আল্লাহ্র মর্জিতো এটাই।[৩৫] আ'মাশ বর্ণনা করেন, সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর إِنَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ[৩৬] এ আয়াতের তাফসীরে বলতেন যে, এর অর্থ হল, যখন কোথাও পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয় তখন সেখান থেকে বের হয়ে যাও।

তিনি তাফসীরের দরসও দিতেন। ইব্ন ইয়াস বর্ণনা করেন, 'আযরাহ তাফসীরের বই (সম্ভবত হাতে লেখা কপি) এবং দোয়াত নিয়ে সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর নিকট যেতেন।[৩৭] কিন্তু কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তাফসীর লিখে রাখা পছন্দ করতেন না। একবার একব্যক্তি তাঁর নিজের জন্য তাফসীর লিখে রাখার অনুমতিদানের আবেদন জানান। তিনি বললেন, তাফসীর লিখে রাখার পরিবর্তে আমার এটাই পছন্দ যে, আমার একটি পাশ অবশ হয়ে যাক।[৩৮]

হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) আল-কুরআনের অনেক আয়াতের তাফসীর করেন। তাঁর থেকে যে সব আয়াতের তাফসীর বর্ণিত রয়েছে তা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কিছু আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করলাম :

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

'বরং মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়।[৩৯]

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, গুনাহের কাজ তড়িঘড়ি করে অথচ তওবা করতে বিলম্ব করে এবং বলে অতিসত্বর তওবা করব।[৪০]

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا

'আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি।'[৪১]

উল্লেখিত আয়াতে وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, المعصرات দ্বারা আকাশ মণ্ডলীকে বুঝানো হয়েছে।[৪২]

---

৩৫. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৬; *তাবি'ঈদের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

৩৬. সূরা আল-আনকাবুত ২৯ : ৫৬।

৩৭. *আত-তাবাকাত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

৩৮. ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ড: হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল-ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৩; এ সম্পর্কে ড: হুসায়ন আয্-যাহাবী উল্লেখ করেছেন,

من أن رجلا سأل سعيداً ان يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال : لأن يسقط شقر اجيب الي من ذلك.

দ্র. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২।

৩৯. সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫ : ৫।

৪০. 'আব্দুর রহমান 'আবী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১৫৮।

৪১. সূরা আন-নাবা' ৭৮ : ১৪।

৪২. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

www.pathagar.com

৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ

'তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত।'[৪৩]

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, বান্দা যখন বলবে, আমার 'আমলনামায় আমার কৃতকর্মের তুলনায় বেশি লিখা হয়েছে। ফিরিশতাগণ উত্তরে বলবেন, ما أسغيته অর্থাৎ আমি বেশি বেশি লিখে সীমালংঘন করিনি।[৪৪]

৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

'পথ বিশিষ্ট আসমানের কসম।'[৪৫]

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ذَاتِ الْحُبُكِ অর্থ ذات الزينة অর্থাৎ সৌন্দর্য বা সুসজ্জিত আকাশ।[৪৬]

৫. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

'যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের 'আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।'[৪৭]

উল্লেখিত আয়াতে وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যার পরিবার পরিজন ঈমানের সাথে তাঁর অনুসরণ করবে, জান্নাতে তার পরিবারকে তাঁর সঙ্গে মিলন করে দেয়া হবে। যদিও তাদের 'আমল পূর্বসুরীদের 'আমলের স্তরে পৌঁছেনি। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ মাত্র। তাদের ঈমানদার পূর্বসুরীদের মর্যাদা প্রদানের জন্য তাঁর সন্তান সন্ততিদেরকে তার সাথে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।[৪৮]

৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ

---

৪৩. সূরা কাফ : ২৭।

৪৪. যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত-তাফসীর, ৭ম খন্ড, পৃ. ২৪১।

৪৫. সূরা আয-যারিয়াত ৫১ : ৭।

৪৬. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯।

৪৭. সূরা আত্-তুর ৫২ : ২১।

৪৮. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

www.pathagar.com

'আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় ছবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস ও পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন।'[৪৯]

উল্লেখিত আয়াতে وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হে নবী ! আপনি যখন আপনার বৈঠক থেকে উঠবেন তখন বলবে سبحانك اللهم وبحمدك।[৫০]

৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ

'ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না।[৫১]

উল্লেখিত আয়াতে يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, الشواظ। অর্থ ধোয়া। আর النحاس। অর্থ আগুনের ধোয়া।[৫২]

৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مُتَّكِئِيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

'তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।[৫৩]

উল্লেখিত আয়াতে مُتَّكِئِيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, رفرف অর্থ জান্নাতের বাগানসমূহ।[৫৪]

৯. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيْمٍ

'তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান।[৫৫]

উল্লেখিত আয়াতে فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, روح অর্থ الفرح। তথা আনন্দ ফূর্তি ও الريحان। অর্থ الرزق। তথা রুজী।[৫৬]

১০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

৪৯. আল-কুরআন, পূর্বোক্ত, ৫২ : ৪৮।

৫০. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭১।

৫১. সূরা আর্-রাহমান ৫৫ : ৭৬।

৫২. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১১।

৫৩. সূরা রাহমান ৫৫ : ৭৬

৫৪. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।

৫৫. সূরা ওয়াকি'আহ ৫৬ : ৮৯।

৫৬. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।

www.pathagar.com

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

'মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।'[৫৭]

উল্লেখিত আয়াতে يَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, النور দ্বারা এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।[৫৮]

১১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ .

'তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আ যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।'[৫৯]

উল্লেখিত আয়াতে فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা হযরত 'ওমর (রা)-কে বুঝানো হয়েছে।[৬০]

১২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ مَاأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

'নূন ! শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে। আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।'[৬১]

উল্লেখিত আয়াতে نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ن অর্থ দোয়াত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন অতঃপর ن তথা দোয়াত সৃষ্টি করেন।[৬২]

১৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ — 'আপন পোশাক পবিত্র করুন।'[৬৩]

---

৫৭. সূরা হাদীদ ৫৭ : ২৮।

৫৮. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।

৫৯. সূরা আত্-তাহরীম ৬৬ : ৪।

৬০. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮১।

৬১. সূরা আল-কলাম ৬৮ : ১-২।

৬২. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

৬৩. সূরা আল-মুদ্দাসির ৭৪ : ৪।

www.pathagar.com

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, তোমরা অন্তর পরিষ্কার কর।[৬৪]

১৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ — 'আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু।'[৬৫]

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ذبح عظيم হ'ল সে দুম্বা, যা হযরত আদম (আ)-এর সন্তান 'হাবিল' কুরবানী করেছিল। আল্লাহ্ তাঁর কুরবানী কবুল করেন এবং জান্নাতে রেখে দেন। পরবর্তীতে ইসমাঈল (আ)-কে যবেহ করার পরিবর্তে এ দুম্বাটি যবেহ করা হয়।

হযরত সা'ঈদ ইব্নুল জুবাইর (র) আরও বলেন যে, عظيم বলা হয়েছে কেননা এ জন্তুটি জান্নাতের ঘাস খেয়ে বিশাল আকৃতি ধারণ করেছে।[৬৬]

১৫. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, صٓ وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكْرِ -'ছোয়াদ ! শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনে।'[৬৭]

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, কুরাইশগণ আবূ তালিবের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, 'ভাতিজা ! তুমি তোমার সম্প্রদায় থেকে কি আশা কর ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তাদের কাছে এমন একটি বাক্যের স্বীকারোক্তি চাই, যার মাধ্যমে সকল 'আরব জাতি তাদের আনুগত্য করবে এবং 'আজমীরা এ কালিমার মাধ্যমে জিযিয়া প্রদান করবে। তিনি বললেন, একটি মাত্র বাক্য ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'হ্যাঁ ! একটি মাত্র বাক্য। তিনি বললেন, উহা কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, لا اله الا الله অতঃপর কুরাইশরা বলল, এতগুলো মাবুদ ছেড়ে মাত্র একটি মাবুদ ? তাদের প্রসঙ্গে নাযিল হয় ص وَالْقُرْآنِ থেকে إن هذا إلا أختلاف পর্যন্ত। সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ذي الذكر অর্থ أنهَ الشرف তথা সম্মানিত ব্যক্তি।[৬৮]

১৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

'আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হ'ল।'[৬৯]

উল্লেখিত আয়াতে وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) বাথরুমে প্রবেশকালে তিনি তাঁর আংটি অধিক বিশ্বস্ত স্ত্রীর নিকট রেখে যান, শয়তান হযরত সুলায়মান (আ)-এর আকৃতি ধারণ

---

৬৪. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

৬৫. সূরা আস্-সাফ্ফাত ৩৭ : ১০৭।

৬৬. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৬৭. সূরা সোয়াদ ৩৮ : ১।

৬৮. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩।

৬৯. আল কুরআন, পূর্বোক্ত : ৩৮ : ৩৪।

www.pathagar.com

করে তার কাছে এসে আংটিটি নিয়ে যায়। হযরত সুলায়মান (আ) বাথরুম থেকে বের হয়ে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলে তিনি বলেন আমিতো আংটি তোমাকে দিয়েছি। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে শয়তান উপবিষ্ট হয়। হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, পঞ্চাশ রাত পর্যন্ত সুলায়মান (আ)-এর রাজত্ব শয়তান পরিচালনা করে।[৭০]

১৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ صَدَّقَ بِهِ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

'যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্য মেনে নিয়েছে, তারাই তো খোদাভীরু।'[৭১]

উল্লিখিত আয়াতে وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, সত্যকথা হ'ল لا اله الا الله।[৭২]

১৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (১)حم عسق(২)-'হা-মীম, আইন, সীন, ক্বা-ফ।'[৭৩]

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, العين অর্থ عالم তথা জ্ঞানী, السين অর্থ قدوس তথা দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, القاف অর্থ قاهر তথা কঠিন শাস্তিদাতা, বিজয়ী বা পরাক্রমশালী।[৭৪]

১৯. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِى هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ

'সুতরাং তা হ'ল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।'[৭৫]

উল্লেখিত আয়াতে وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন إِنَّهُ শব্দের মধ্যে (هُ) সর্বনামটি কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।[৭৬]

২০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ ·

'যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হ'ল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হ'ল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।'[৭৭]

---

৭০. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

৭১. সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৩৩।

৭২. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৭৩. সূরা আশ-শূরা ৪২ : ১-২।

৭৪. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।

৭৫. সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩ : ৬১।

৭৬. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪২।

৭৭. সূরা আল-আহকাফ ৪৬ : ২৯।

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিনদের কাছে কিছু তিলাওয়াত করেন নি এবং তাদের দেখেনও নি। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নাখলায় অবস্থায় করেন, তখন জিন্রা তাঁর কাছে আসে এবং কুরআন শ্রবণ করে।[৭৮]

২১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُوْلِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।[৭৯]

উল্লেখিত আয়াতে سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُوْلِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, قـــوم বলতে এখানে হাওয়াজিন ও গাতফান গোত্রদ্বয়কে বুঝানো হয়েছে। আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা, যা হুনাইনের যুদ্ধে সংঘটিত হয়।[৮০]

২২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ اَنْ عَسٰى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

'মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালিম।'[৮১]

উল্লেখিত আয়াতে وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَـابِ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন যুবাইর (র) বলেন لقب বা উপাধি হ'ল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে ধর্মে ছিল, সেদিকে সম্বন্ধ করে ডাকা। যেমন ইয়াহুদী ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণ করার পর ইয়াহুদী বলে সম্বোধন করে ডাকা উক্ত

---

৭৮. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।

৭৯. সূরা আল-ফাত্হ ৪৮ : ১৬।

৮০. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।

৮১. সূরা আল-হুজরাত ৪৯ : ১১।

www.pathagar.com

আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।[৮২]

২৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ, তাদেরকে প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[৮৩]

উল্লেখিত আয়াতে وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, طَائِفَة অর্থ দুই বা ততোধিক সাক্ষী।[৮৪]

২৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।'[৮৫]

উল্লেখিত আয়াতে إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, হাদীফ আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন সতী সাধ্বী রমণীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, আল্লাহ কি তার অভিশাপ বর্ষণ করেন ? উত্তরে আমি বললাম না। উক্ত আয়াতটি শুধুমাত্র হযরত 'আইশা (রা)-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।[৮৬]

২৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَادًا وَّثَمُوْدَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا

'আমি ধ্বংস করেছি 'আদ, সামুদ, কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে।'[৮৭]

উল্লেখিত আয়াতে وَعَادًا وَّثَمُوْدَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) বলেন, এ সম্প্রদায়ের হানযালাতা ইব্‌ন সাফওয়ান নামে একজন নবী ছিলেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন।[৮৮]

---

৮২. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।

৮৩. সূরা আন্-নূর ২৪ : ২।

৮৪. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

৮৫. আল কুরআন, পূর্বোক্ত : ২৪ : ২৩।

৮৬. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর,* ৫ম খণ্ড. পৃ. ৩৭৩।

৮৭. সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৩৮।

৮৮. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭।

www.pathagar.com

২৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

'এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।'[৮৯]

উল্লেখিত আয়াতে وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কতিপয় মুশরিক অসংখ্য মানুষ হত্যা করে এবং অনেক ব্যভিচার করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল আপনি যে পথে আহবান করেছেন, সেটা ভাল তবে আমাদেরকে বলবেন কি? যে, আমরা যদি আপনার দাওয়া গ্রহণ করি ও 'আমল করি তবে কি পূর্বোক্ত গুনাহগুলো মাফ হবে ? তাদের সম্পর্কে আয়াতের غَفُوْرًا رَّحِيْمًا পর্যন্ত নাযিল হয়।[৯০]

২৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالَ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

'সুলায়মান বললেন, হে পরিষদবর্গ 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?'[৯১]

উল্লেখিত আয়াতে قَالَ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, রাণী বিলকিসের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সিংহাসনকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তা চিনতে পারেন কি-না।[৯২]

২৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ.

'কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে

---

৮৯. পূর্বোক্ত, ২৫ : ৬৮।

৯০. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬।

৯১. সূরা আন্-নামল ২৭ : ৩৮।

৯২. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩।

www.pathagar.com

নিজের উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাশীল।[৯৩]

উল্লেখিত আয়াতে قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আপনার চোখের দৃষ্টির শেষসীমা পৌঁছার পূর্বেই আমি উহা নিয়ে আসব।[৯৪]

২৯. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ

'কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে।[৯৫]

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হাবসার সম্রাট নাজ্জাসীর প্রেরিত ৪০জন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আগমন করে তাঁর সাথে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়।[৯৬]

৩০. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায়না। খোদাভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।[৯৭]

উল্লেখিত আয়াতে تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ এ অংশের তাফসীরে হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, العلو শব্দের অর্থ দেশদ্রোহীতা, সীমালংঘন।[৯৮]

উপসংহার

যে সকল খ্যাতনামা তাবি'ঈ তাফসীর অভিজ্ঞানে অভূতপূর্ব অবদান রেখে আল-কুরআনের আয়াতের শাব্দিক, আংশিক ও পূর্ণ আয়াতের তাফসীরসহ শানে নুযূল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য উপস্থাপন করেছেন, হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সীমাহীন সাধনা ও প্রতিভার বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাবি'ঈ আলিমকুলের শিরোমণিতে পরিণত হন, যার কারণে তিনি কূফার মুফ্তীসহ জ্ঞান বিতরণ ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। তাঁর তাফসীরের দরস ও তাফসীর বর্ণনার বিভিন্ন দিক ছিল সর্বজন বিদিত, যার কারণে তিনি 'ইল্ম তথা তাফসীর জ্ঞান পিপাসুদের হৃদয়ে হয়ে আছেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

---

৯৩. আল কুরআন, পূর্বোক্ত ২৭ : ৪০।

৯৪. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৯৫. সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৫২।

৯৬. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১০।

৯৭. পূর্বোক্ত ২৮ : ৮৩।

৯৮. *যাদুল মাসীর ফী 'উলূমুত্-তাফসীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

দ্বীন ঃ আল কুরআনের একটি মৌলিক পরিভাষা

আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুসা*

বাংলা ধর্ম শব্দটি ধৃ-ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। এ অর্থে মানুষ যে সব নিয়ম কানুন বা বিধি-বিধান পালন করে তাই ধর্ম। এ বিধি বিধানগুলো আবার নৈতিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মূল লক্ষ্য হলো সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন। পাশ্চাত্য দর্শনে ধর্মকে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। এ অর্থে ধর্ম মানব জীবনের এক বিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপ। জীবনের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। পারলৌকিক কল্যাণই সেখানে ধর্মীয় চেতনার মূল লক্ষ্য।[১]

আরবী ভাষায় "দ্বীন" শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহার এক অর্থ প্রভুত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ- আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ প্রতিফল ও কর্মফল এবং চতুর্থ অর্থ পথ, পন্থা, ব্যবস্থা ও আইন।[২]

কুরআনে বলা হয়েছে اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।[৩]

উপরোক্ত আয়াতে দ্বীন শব্দটি চতুর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীন শব্দের অর্থ জীবন-যাপনের পন্থা কিংবা কর্মের প্রণালী। এমন পন্থা বা কর্ম প্রণালী যা মানুষের জীবনে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কুরআন কেবল "দ্বীন-ই" বলেনি। কুরআন বলেছে "আ-দ্বীন"। ইংরেজিতে This is a way (এই একটি পথ) এর পরিবর্তে This is the way (এই একমাত্র পথ) বলার অর্থের দিক দিয়ে যতখানি পার্থক্য হয় "দ্বীন" এবং "আ-দ্বীন" শব্দের মধ্যেও অর্থের দিক দিয়ে ঠিক ততখানি পার্থক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন এ কথা বলছেনা যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র কাছে একটি মনোনীত ধর্ম এবং এর দাবি এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে ইসলামই একমাত্র প্রকৃত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বা চিন্তা ও কর্মের প্রণালী। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কুরআন "আ-দ্বীন" কোন সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেনি।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জয়পাড়া ডিগ্রী কলেজ, দোহার, ঢাকা।

১. এ. বি. এম. আমজাদ আলী, প্রবন্ধ, *ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান*, বার্ষিকী, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল, ১৯৬৪, পৃ. ৬৭

২ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *একমাত্র ধর্ম,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭

৩. সূরা- আল্ ইমরান ঃ ১৯

www.pathagar.com

কুরআনে এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, জীবন ব্যবস্থা বলতে জীবনের বিশেষ কোন দিক বা বিশেষ কোন বিভাগের ব্যবস্থা বোঝায় না। এর অর্থ সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা।[৪]

যেমন এক-প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা। দুই. আনুগত্য طَاعَةٌ। বা হুকুম মেনে চলা। তিন. আনুগত্য করার বিধান نِظَامُ الطَّاعَةِ। বা আনুগত্যের নিয়ম। চার- আইন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে আইনে চলে।[৫]

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রন্থে উক্ত হয়েছে দ্বীন শব্দটি কুরআন হাদীস এবং আরবী সাহিত্যের ভাষায় চারটি অর্থ বহন করে। এক. প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি। দুই. আনুগত্য, দাসত্ব ও বিশ্বস্ততা। তিন. আইন-কানুন ও বিধিবিধান। চার. পরিণাম, পরিণতি, প্রতিদান ও প্রতিফল। কোথাও প্রভুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোথাও আইন-কানুন অর্থে, কোথাও প্রতিদান প্রতিফল অর্থে, কোথাও একযোগে একাধিক অর্থ বোঝাতে পারে। "দ্বীন" শব্দটিতে এতগুলো অর্থের প্রয়োগ ও ব্যবহার থাকলে ও বিধি-বিধান ও আইন-কানুন অর্থেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৬]

"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান" প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে দ্বীন শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রতিদান, আনুগত্য বা জীবন বিধান। ব্যবহারিক অর্থে ধর্মের প্রতিশব্দ হিসাবে যখন "দ্বীন" শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন একে জীবন বিধান হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। যদিও "দ্বীন" ধর্মের প্রতিশব্দ হতে পারে না। কুরআন শরীফে ইসলামকে বুঝানোর জন্য "আল-দ্বীন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে জীবন-যাপনের পন্থা কিংবা চিন্তা ও কর্মের প্রণালী, এমন প্রন্থা ও প্রণালী যা মানুষের সামগ্রিক জীবনের অনুসরণ করা যেতে পারে।[৭]

তফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে "দ্বীন" শব্দের একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কুরআনের পরিভাষায় দ্বীন সে সব মূল নীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। শরীয়ত অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। মাযহাব শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয় যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে।[৮] পূর্বেই বলা হয়েছে "দ্বীন" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. শক্তি, ক্ষমতা, শাসন, কর্তৃত্ব, অপরকে আনুগত্যের জন্য বাধ্য করা। তার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা, তাকে গোলাম এবং আদেশানুগত করা। যেমন বলা

৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *একমাত্র ধর্ম,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭-৮

৫. অধ্যাপক গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীন,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫

৬ মতিউর রহমান নিজামী, *দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব* ১৯৮২, পৃ. ৫

৭. এ. বি. এম. আমজাদ আলী, প্রবন্ধ- *ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান,* বার্ষিকী, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল, ১৯৮৪, পৃ. ৬৭

৮. মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র), *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন,* খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিযরী, পৃ. ১৬৮

www.pathagar.com

হয়েছে—

دَانَ النَّاسَ اَىْ قَهَرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ লোকদের আনুগত্যের জন্য বাধ্য করেছে। دِنْتُهُمْ فَدَانُوْ اَىْ قَهَرْتُهُمْ فَأَطَاعُوْا অর্থাৎ- আমি তাদের পরাভূত করেছি, আর তারা অনুগত হয়ে পড়েছে। دِنْتُ الْقَوْمَ اَىْ اَذْلَلْتُهُمْ وَاسْتَعْبَدْتُهُمْ অর্থাৎ আমি অমুকদলকে বশীভূত করে গোলাম বানিয়ে নিয়েছি।

دَانَ الرَّجُلُ اِذَا عَزَّ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি মর্যাদা এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। دِنْتُ الرَّجُلَ جَمَلْتُهُ عَلَى مَا يَكْرَهُ আমি তাকে এমন কাজের জন্য বাধ্য করেছি যার জন্য সে রাজী ছিল না। دِنْتُهُ اَىْ دُيِّنَ فُلَانٌ اِذَا حُمِلَ عَلَى مَكْرُوْهٍ অমুক ব্যক্তি সে কাজের জন্য জোরপূর্বক বাধ্য হয়েছে। دَيَّنْتُهُ الْقَوْمَ اَىْ وَلَّيْتُهُ سِيَاسَتَهُمْ سُسْتُهُ وَمَلَكْتُهُ আমি তার উপর হুকুম চালিয়ে কর্তৃত্ব করছি। লোকের শাসন কর্তৃত্ব আমি অমুক ব্যক্তির ওপর সোপর্দ করেছি।[৯]

এ অর্থে জনৈক কবি তার মাতাকে সম্বোধন করে বলেছে لَقَدْ دُيِّنْتِ اَمْرَ بَنِيْكِ حَتّٰى تَرَكْتَهُمْ اَدَقَّ مِنَ الطَّحْيْنِ তোমাকে স্বীয় সন্তানের রক্ষক তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তুমি তাদেরকে আটার চেয়েও সূক্ষ্ম করে ছাড়লে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে তার নফসকে দমন করে এমন কার্য করেছে যা তার পরকালের জন্য কল্যাণকর। এ অর্থের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তিকে দাইয়্যান دَيَّانٌ বলা হয়। যে ব্যক্তি কোন দেশ জাতি বা দলের উপর বিজয়ী হয়ে কর্তৃত্ব চালায়। আশা আলহারমাযী নবী (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছে يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ হে মানুষের নেতা আরবের সর্দার। এ অর্থে মাদ্বীনুন مَدِيْنٌ অর্থ গোলাম, আর মাদ্বীনাতুন مَدِيْنَةٌ অর্থ বাঁদী-দাসী। আর اَلْمَدِيْنَةُ অর্থ দাসী তনয়। কবি আখতাল বলেছে دَنَتْ وَرَبَّانِىْ حِجْرُ هَابْنُ الْمَدِيْنَةِ আর কুরআন বলেছে فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি কারো কর্তৃত্বাধীন, অনুগত এবং বাধ্য না হয়ে থাক তা হলে মৃত প্রায় ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো কেন ?

দুই

দাসত্ব-আনুগত্য, সেবা, কারোজন্য বশীভূত হয়ে যাওয়া, কারো নির্দেশনাধীন হওয়া, কারো প্রভাব প্রতাপে নিষ্পেষিত হয়ে তার মোকাবিলায় অপমান সহ্য করে নেয়া। বলা হয়ে থাকে دِنْتُهُمْ فَدَانُوْ اَىْ قَهَرْتُهُمْ فَاَطَاعُوْا অর্থাৎ আমি তাদেরকে পরাভূত করেছি, এবং তারা অনুগত হয়ে পড়েছে। دِنْتُ الرَّجُلَ اَىْ خَدَمْتُهُ অর্থাৎ আমি অমুক ব্যক্তিকে খেদমত করেছি।[১০]

---

৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা,* নবচেতনা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৪০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

www.pathagar.com

রাসূল (সা) বলেছেন, اُرِيْدُ مِنْ قُرَيْشٍ كَلِمَةً تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ اَىْ تُطِيْعِهِمْ وَتَخْضَعُهُمْ আমি কুরায়শকে এমন এক বাক্যের অনুবর্তী করতে চাই যে তারা স্বীকার করে নিলে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে। এ অর্থানুযায়ী আনুগত্য পরায়ন জাতিকে বলা হয় 'কাওমুন দাইয়্যেনুন' আর এর অর্থেই হাদীসে খাওয়ারেজে দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন

শরীয়ত আইন-কানুন, পথ-পন্থা, ধর্ম, মিল্লাত, রসম-প্রথা, অভ্যাস। যেমন বলা হয় : يُقَالُ دَانَ اِذَا اِعْتَادَ خَيْرًا اَوْ شَرًّا مَازَالَ ذٰلِكَ دِيْنِىْ চিরকাল আমার এ পথ-পন্থা রয়েছে অর্থাৎ মানুষ ভাল মন্দ যে কোন পন্থারই অনুসারী হোক না কেন, উভয় অবস্থাতেই সে যে পন্থার অনুসারী তাকে দ্বীন বলা হবে।[১১]

হাদীস শরীফে আছে كَانَتْ قُرَيْشُ وَمَنْ دَانَتْ بِدِيْنِهِمْ কুরায়শ এবং যারা কুরায়শের মত পথের অনুসারী ছিল, হাদীসে আরো বলা হয়েছে : اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلٰى دِيْنِ قَوْمِهِ নবুয়তের পূর্বে নবী (সা) তার কাওমের দ্বীনের উপর ছিলেন। অর্থাৎ বিবাহ, তালাক, মিরাস এবং অন্যান্য সামাজিক তামাদ্দুনিক ব্যাপারে তিনি সে সব রীতি-নীতি মেনে চলতেন, যা তার কাওমের মধ্যে প্রবর্তিত ছিল।

চার

কর্মফল, বিনিময়, প্রতিদান, ক্ষতিপূরণ, ফয়সালা, হিসাবনিকাশ। আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ মানে যেমন কর্ম তেমন ফল, তুমি যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল ভোগ করবে। কুরআনে কাফেরদের এ উক্তি উল্লিখিত হয়েছে : اِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ মৃত্যুর পর আমাদের কাছ থেকে কি হিসাব নেয়া হবে ? আমরা কি ফল পাবো ?[১২] আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীসে আছে : لَا تَسُبُّوْا السُّلْطَانَ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ دِنْهُمْ كَمَا يَدِيْنُوْنَ তোমরা শাসকদের গালি দিওনা, যদি কিছু বলতে হয়, তা হলে বলবে : আল্লাহ তারা আমাদের সাথে যেমন করেছে, তুমি তাদের সাথে তেমন কর। এ অর্থেই দাইয়্যান دَيَّانُ শব্দটি কাযী, বিচারক, আদালতের বিচারপতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৩]

কোন বুযুর্গকে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : كَانَ دَيَّانُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا। নবী (সা)-এর পরে তিনি উম্মতের সবচেয়ে বড় কাযী ছিলেন।

কুরআনে দ্বীন শব্দের ব্যবহার

এক. প্রভাব, প্রতিপত্তি, আধিপত্য— কোন ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে।

দুই. এতায়াত— বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য, ক্ষমতাসীনের সামনে মাথা নতকারীর পক্ষ থেকে।

---

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

www.pathagar.com

তিন. নিয়মনীতি, পথ, পন্থা, যা মেনে চলা হয়।

চার. হিসাব-নিকাশ, ফয়সালা, প্রতিদান, প্রতিফল, আরববাসীরা এ শব্দটিকে কখনো এক অর্থে কখনো ভিন্ন অর্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতো, কিন্তু যেহেতু এ চারটি বিষয়ে আরবদের ধারণা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিলনা, খুব একটা উন্নত ও ছিলনা তাই শব্দটির ব্যবহারে অস্পষ্টতা ছিল। ফলে কোন বিধিবদ্ধ চিন্তাধারার পারিভাষিক শব্দ হতে পারেনি। কুরআন এ শব্দটিকে আপন উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে একেবারে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অর্থের জন্য ব্যবহার করেছে। তাকে কুরআনের বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

কুরআনের ভাষায় দ্বীন শব্দটি একটি পরিপূর্ণ বিধানের প্রতিনিধিত্ব করে। চারটি অংশ নিয়ে যে বিধান গঠিত।

এক. সার্বভৌমত্ব, সর্বোচ্চ সার্বিক ক্ষমতা।

দুই. সার্বভৌমত্বের মোকাবেলায় আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য।

তিন. এ সার্বভৌমত্বের প্রভাবাধীনে গঠিত চিন্তা ও কর্মধারা।

চার. সে ব্যবস্থার আনুগত্যের পুরস্কার যা বিদ্রোহ বিরোধিতার শাস্তি স্বরূপ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রদত্ত প্রতিদান প্রতিফল।

কুরআন কখনো প্রথম অর্থে, কখনো দ্বিতীয়, কখনো তৃতীয় আবার কখনো চতুর্থ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেছে। কখনো আদ্ দ্বীন বলে অংশচতুষ্টয়সহ পুরো ব্যবস্থাটাই গ্রহণ করেছে।[১৪]

এ অর্থগুলোকে বুঝাবার জন্যে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লক্ষ্য করা যায় ঃ

দ্বীন ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থে

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থাৎ- তিনি আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বাসস্থান করেছেন, আর আসমানকে করেছেন ছাদ, তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তাকে কতইনা সুন্দর করেছেন। যিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করেছেন, সে আল্লাহ তোমাদের রব। রাব্বুল আলামীন মহান মর্যাদার অধিকারী-বরকতের মালিক।[১৫]

هُوَ الْحَىُّ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থাৎ- তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং দ্বীনকে একান্তভাবে তার জন্য নিবেদিত করে তোমরা তাকেই ডাকো। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।[১৬]

قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۔ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

১৫. সূরা আল-মোমেন ঃ ৬৪

১৬. সূরা আল-মোমেন ঃ ৬৫

www.pathagar.com

অর্থাৎ– বল, একান্তভাবে দ্বীনকে তার জন্য খালেছ করে আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করার জন্য খালেছ করে আমি তার ইবাদত করবো।[১৭]

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِىْ ۔ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّن دُوْنِهٖ ط

অর্থাৎ- বল, আমার দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে আমি তার ইবাদত করবো। তোমাদের এখতিয়ার আছে তাকে বাদ দিয়ে যাকে খুশি তার বন্দেগি করে বেড়াতে পারো।[১৮]

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَا بُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج

অর্থাৎ– আর যারা তাগুতের বন্দেগী হতে বিরত থেকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।[১৯]

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ. اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط

অর্থাৎ– আমরা তোমার প্রতি সত্য-ঠিক গ্রন্থ নাযিল করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেছ করে কেবল তারই ইবাদত করো। সাবধান ! দ্বীন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই জন্য নিবেদিত-নির্দিষ্ট।[২০]

وَلَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ط اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۔

অর্থাৎ- আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। দ্বীন একান্তভাবে তারই জন্য নিবেদিত। তবুও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা ভয় করবে-তাকওয়া করবে।[২১]

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًاوَّ كَرْ هًا وَّاِلَيْهِ يُرْ جَعُوْنَ ۔

অর্থাৎ– তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বীন তালাশ করছে ? অথচ আসমান যমীনের সমুদয় বস্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহরই নির্দেশানুবর্তী। আর তাঁরই কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।[২২]

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّالِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ–

অর্থাৎ– দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য খালেছ করা ব্যতীত তাদেরকে অন্য কিছুর নির্দেশ দেয়া হয়নি।[২৩]

وَقَتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ–

---

১৭. সূরা আয্-যুমার ঃ ১১-১২
১৮. সূরা আয্-যুমার ঃ ১৪-১৫
১৯. সূরা আয্-যুমার ঃ ১৭
২০. সূরা আয্-যুমার ঃ ২
২১. সূরা আন্-নহল ঃ ৫২
২২. সূরা আল-ইমরান ঃ ৮৩
২৩. সূরা আল-বাইয়্যেনা ঃ ৫

www.pathagar.com

অর্থাৎ– তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত ফিতনা শেষ না হয় এবং আনুগত্য শুধু আল্লাহরই বাকী থাকে।[২৪]

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ–

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান)।[২৫]

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ–

অর্থাৎ– যে ইসলাম ছাড়া অন্য প্রকার আনুগত্যের বিধান চায় তা থেকে সেটা গ্রহণ করা হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের বিধান আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলাম।[২৬]

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

অর্থাৎ- তোমাদের জন্য আনুগত্যের বিধান ধার্য করা হয়েছে। নুহ (আ) কেও নির্দেশ করা হয়েছিল এবং যা তোমার নিকট অহী করেছি এবং যা ইবরাহীম (আ), মুসা (আ) ও ঈসা (আ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ করোনা। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সব নবীকেই তার আনুগত্যের বিধানকে কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৭]

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ –

অর্থাৎ– তিনি আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে হেদায়েত ও আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন যেন (রাসূল) তাকে (বিধানকে) আর সবরকমের আনুগত্যের বিধানের উপর বিজয়ী করেন।[২৮]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থাৎ– আজ আমি তোমাদের জন্য আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনিত করলাম।[২৯]

এ সকল আয়াতগুলোতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সে ক্ষমতা স্বীকার করে তাঁর বন্দেগী বা আনুগত্য কবুল করার অর্থে দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্য দ্বীনকে খালেছ করার অর্থ এই যে মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব, শাসন কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য স্বীকার

২৪. সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩
২৫. সূরা আল ইমরান ঃ ১৯
২৬. সূরা আল ইমরান ঃ ৮৫
২৭. সূরা আশ-শুরা ঃ ১৩
২৮. সূরা আস্-সফ ঃ ৯
২৯. সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩

www.pathagar.com

করবে না। তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যকে এমনভাবে আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ করবে যাতে অন্য কারো সরাসরি বন্দেগী আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে মোটেই শরীক করবেনা।

দ্বীন ঃ তৃতীয় অর্থে

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ج وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ- বল, লোকসকল! আমার দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে শোন; তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী-আনুগত্য করছো আমি তার বন্দেগী আনুগত্য করিনা। বরং আমি সে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করি, যিনি তোমাদের জান কবয করেন। যারা এ আল্লাহ্‌কে মানে, তাদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট নির্দেশিত।[৩০]

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থাৎ - আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ একান্তভাবে এ দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং কিছুতেই শিরকবাদীদের পর্যায়ভুক্ত হয়োনা।[৩১]

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-

অর্থাৎ- শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তাঁরই নির্দেশ, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা। ইহাই সত্য সঠিক দ্বীন।।[৩২]

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ-

অর্থাৎ - আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই তার। সকলেই তাঁর হুকুমের তাবেদার[৩৩]

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْمَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط

অর্থাৎ– তোমাদের বুঝবার জন্য তিনি স্বয়ং তোমাদের ব্যাপার থেকেই একটি উদাহরণ পেশ করছেন। বল, এই যে গোলাম তোমাদের অধীন, আমি তোমাদেরকে যে সব জিনিষ দিয়েছি তাদের কেউ কি সেসব বিষয়ে তোমাদের অংশীদার ? তোমরা কি সম্পদের মালিকানায় তাদেরকে তোমাদের সমান অংশীদার করো ? তোমরা কি নিজেদের সমপর্যায়ের লোকদের মতো তাদেরকে সমীহ করে থাকো?[৩৪]

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج

---

৩০. সূরা ইউনুস, ঃ ১০৪
৩১. সূরা ইউনুস ঃ ১০৫
৩২. সূরা ইউসুফ ঃ ৪০
৩৩. সূরা আর-রূম ঃ ২৬
৩৪. সূরা আর-রূম ঃ ২৮

www.pathagar.com

অর্থাৎ– সত্য কথা এই যে, সব যালেমরা জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়াই নিছক নিজেদের খেয়াল খুশির পেছনে ছুটে চলছে।[৩৫]

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ– সুতরাং, তুমি একান্তভাবে নিজেকে সে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহ যে ফিতরাত প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি তাকেই অবলম্বন করো। আল্লাহর বানানো গঠন-আকৃতিতে যেন কোন পরিবর্তন হয়না। ইহাই সত্য-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে আছে।[৩৬]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ– ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনী উভয়কে একশ চাবুক মারো। আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যপারে তোমরা যেন তাদের ওপর দয়া না করো।[৩৭]

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ–

অর্থাৎ– যখন থেকে আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তাঁর বিধানে মাসের সংখ্যা চলে আসছে ১২টিই। এর মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। ইহাই সত্য সঠিক দ্বীন।[৩৮]

كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ط مَاكَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ–

অর্থাৎ– আর এমনি করে আমরা ইউসুফের জন্য পথ বের করেছি। বাদশার বিধানে তাঁর ভাইকে রেখে দেয়া তাঁর জন্য বৈধ ছিল না।[৩৯]

وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط

অর্থাৎ– আর এমনি করে অনেক মুশরিকদের জন্য তাদের বানানো শরীকরা তাদের সন্তান হত্যাকে একটি চমৎকার কার্যে পরিণত করে দিয়েছে, যেন তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলতে পারে। আর তাদের জন্য দ্বীনকে করে তোলে সন্দেহের বস্তু।[৪০]

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ

৩৫. সূরা আর-রূপম ঃ ২৯
৩৬. সূরা আর-রূম ঃ ৩০
৩৭. সূরা আন-নুর ঃ ২
৩৮. সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৬
৩৯. সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬
৪০. সূরা আল-আনআম ঃ ১৩৭

www.pathagar.com

অর্থাৎ– তারা কি এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের অনুরূপ এমন আইন রচনা করে। আল্লাহ যার অনুমতি দেননি।[৪১]

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

অর্থাৎ– তোমাদরে জন্যে তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্যে আমার দ্বীন।[৪২]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْاَنْ يُّظْهِرَ فِىْ الْاَرْضِ الْفَسَادَ

অর্থাৎ– ফেরাউন বলল, আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করব। সে তার প্রভুকে ডাকুক। আমি আশংকা করি যে সে তোমাদের আইন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলিয়ে দিবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।[৪৩]

مَاكَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ

অর্থাৎ– বাদশার আইনে অন্য কাউকে ধরা যায় না, অর্থাৎ- যে চুরি করেছে তাকেই ধরতে হবে। দেশের আইনে দোষীর বদলে অন্য কাউকে ধরা যায় না।[৪৪]

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ– যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তোমাদের মনে তাদের প্রতি যেন দয়া না জাগে।[৪৫]

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ– তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দ্বীনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করেনা এবং আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য করে না।[৪৬]

উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোতে দ্বীনের অর্থ আইন বিধান, নিয়ম-কানুন, পথ-পন্থা, শরীয়ত এবং সে সব চিন্তা ও কর্মধারা, মানুষ যা মেনে চলে জীবন যাপন করে। যে ক্ষমতার সনদ অনুযায়ী কোন বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলা হয়, তা যদি খোদার হয়, তবে মানুষ খোদার দ্বীনে আছে। আর তা যদি হয় কোন রাজা বাদশাহর, তাহলে মানুষ হবে রাজা বাদশহার দ্বীনে। তা যদি হয় পণ্ডিত পুরোহিতের তাহলে মানুষ হবে তাদের দ্বীনে। আর তা যদি হয় বংশগোত্র,

৪১. সূরা আশ্-শুরা ঃ ২১
৪২. সূরা আল-কাফেরুন ঃ ৬
৪৩. সূরা আল-মোমেন ঃ ২৬
৪৪. সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬
৪৫. সূরা আন্-নুর ঃ ২
৪৬. সূরা আত্-তাওবা ঃ ২৯

www.pathagar.com

সমাজ বা গোটা জাতির, তবে মানুষ হবে তাদের দ্বীনে। মোট কথা, যার সনদকে চূড়ান্ত সনদ এবং যার ফয়সালাকে চূড়ান্ত ফয়সালা মনে করে মানুষ কোন ব্যবস্থা মেনে চলে, সে তার দ্বীনের অনুসারী।

দ্বীন ঃ চতুর্থ অর্থে

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ

অর্থাৎ– যে সংবাদ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে (মৃত্যু পরপারের জীবন) তা নিশ্চিত সত্য, এবং দ্বীন অবশ্যই ঘটবে।[৪৭]

اَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۔ فَذَالِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ۔

অর্থাৎ- তুমি কি তাকে দেখেছ, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে ? এই সে ব্যক্তি যে এতিমকে ধাক্কা দেয়, মিসকিনদের খাবারের ব্যাপারে উৎসাহিত করে না।[৪৮]

وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ۔ ثُمَّ مَااَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ۔ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ–

অর্থাৎ– তুমি কি জান, ইয়াওমুদ্দীন কি ? হাঁ, তুমি কি জান কি ইয়াওমুদ্দীন ? ইয়াওমুদ্দীন সে দিন, যে দিন অন্যের কাজে আসার কোন এখতিয়ারই থাকবে না কোন মানুষের। সেদিন সব এখতিয়ারই থাকবে আল্লাহর হাতে।[৪৯]

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ–

অর্থাৎ– প্রতিদান দিবসের মালিক।[৫০]

كَلَّابَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ–

অর্থাৎ– না তা নয়, বরং তোমরা প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর।[৫১]

উপরের আয়াতগুলোতে দ্বীন শব্দটি হিসাব নিকাশ, ফয়সালা, কর্মফল, প্রতিফল, প্রতিদান, বদলা, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পরকালে মানুষের কাজের যে প্রতিদান পুরস্কার দেয়া হবে তাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

---

৪৭. সূরা আয্-যারিয়াত ঃ ৫-৬
৪৮. সূরা আল্-মাউন ঃ ১-৩
৪৯. সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১৭-১৯
৫০. সূরা আল্-ফাতিহা ঃ ৩
৫১. সূরা আল ইনফিতার ঃ ১

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

স্বদেশী আন্দোলনের মুসলিম সাহিত্য প্রয়াস : 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য'

আছমা সুলতানা*

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কথাশিল্পী হিসেবে মোহাম্মদ নজিবর বরহমান সাহিত্যরত্নের (১৮৬০-১৯২৩) অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রথম মুসলিম গদ্যশিল্পী হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের পরবর্তীকালে যে কয়েকজন উপন্যাস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজিবর রহমান অন্যতম। তাঁর 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসসমূহ কালোত্তীর্ণ এবং পাঠকসম্পৃক্ত। বিশ শতকের প্রথমভাগ তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র হলেও তিনি মুসলিম ঔপন্যাসিক হিসাবে আধুনিক সাহিত্যের উন্মেষপর্বের অন্যতম প্রতিনিধি। নজিবর রহমান সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। সচেতনভাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। সে যুগে মুসলমান সমাজের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অসচ্ছল জীবন-যাত্রা তাঁকে মর্মাহত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ইংরেজিশিক্ষা, নারীশিক্ষা এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই এ দেশের মুসলমান সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগতভাবে সচেতন করে তোলা সম্ভব। স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে তিনি অবহিত ও সচেতন ছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য'। এছাড়া মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকার আদায়ের জন্য ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' গঠন উপলক্ষে ঢাকা-অধিবেশনে তিনি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বাংলার গ্রামীণ সমাজচিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন ঃ

> কোন জাতি যখন তাহার সাহিত্য-দর্পণে নিজের অধঃপতিতরূপটিকে দেখিতে পায় তখন আপনা হইতেই সত্য ও ন্যায়ের আলোকে মুক্তির পথটি খুঁজিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হয় না। নজিবর রহমান দেখিলেন মুসলমান সমাজকে সত্যপথে পরিচালিত করিবার মতো তেমন কোন গ্রন্থ সেই পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের এই

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কয়া মহাবিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

অভাব মোচনের জন্যই তিনি সেইকালে বাংলা সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।[১]

নজিবর রহমান তাঁর সাহিত্য সাধনায় উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে গ্রামীণ সমাজের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন-চিত্র বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত করেছেন। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী[২] ও বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি[৩] সূত্রে জানা যায় নজিবর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থ নয়খানা এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা চারটি।[৪] নজিবর রহমানের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো ঃ ক. নাট্যধর্মী ঃ *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য,* খ. উপন্যাস ঃ *আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, পরিণাম,* গরীবের মেয়ে, *চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গা বাহমণি,* গ. ছোটগল্প ঃ আখ্যাণ ঃ *দুনিয়া আর চাইনা।*

নজিবর রহমানের উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা পরিক্রমার পাশাপাশি ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস *'চাঁদ তারা বা হাসন গঙ্গা বাহমণি'* (১৯১৭) তে ঔপন্যাসিক জাতীয় মঙ্গল ও উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমানের মিলিত সমাজ প্রত্যাশা করেছেন। পাঠক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে উপন্যাসের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এ উপন্যাসে হিন্দু প্রভুর ঘরে মুসলমান কৃষাণ-ভৃত্য চাঁদের অবস্থান এবং চাঁদের প্রতি প্রভুকন্যা তারার প্রেম নিবেদন— পরিশেষে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চাঁদ-তারার বিবাহ হয়। এ উপন্যাসে হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের মহানুভবতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বঙ্গভঙ্গের পর প্রথম মহাযুদ্ধের উষ্ণ আবহের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে *চাঁদ-তারা বা হাসন গঙ্গা বাহমণি* বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত একটি উপন্যাস। সৃষ্টিশীল সমাজ-জীবনের রূপকার হিসেবে নজিবর রহমানের রচনা বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তিনি বিষয়ভাবনা, আখ্যান পরিকল্পনা, আঙ্গিক-গঠন, ভাষাশৈলী ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে সচেতন শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা, চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে রচনা করেছেন সাহিত্যসম্ভার।

বিলাতী বর্জ্জন রহস্য

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য* নাট্যভঙ্গিতে রচিত প্রবন্ধমূলক রচনা। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'বঙ্গভঙ্গ' বিষয়ে নজিবর রহমানের চিন্তাধারার সাহিত্যিক প্রকাশ *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য*। প্রথম প্রকাশ ঃ বাংলা ১৩১১ সাল[৫] ও ইংরেজি ১৯০৪ সাল।[৬]

---

১. অধ্যাপক হাবীবুর রশীদ, *নজিবর রহমান ও বাংলা সাহিত্য ॥ মাসিক মোহাম্মদী,* ২৮ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ঢাকা- ১৩৬৬, পৃ. ৪৮৯

২. আলী আহম্মদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* ॥ ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ৪৯০

৩. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, *বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি* ॥ (২য় খণ্ড), রাজশাহী- ১৯৮৮, পৃ. ২০৭

৪. খোন্দকার মোঃ বশির উদ্দিন, *মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন* ॥ ঢাকা - ১৯৮৭, পৃ. ৩২

৫. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* ॥ দ্বি-সং ১৯৬৯, পৃ. ১৮১

৬. জুলফিকার মতিন, *মোহাম্মদ নজিবর রহমান* ॥ ঢাকা, ১৯৯৩

www.pathagar.com

প্রকাশস্থান ঃ মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের মতে ফরিদপুর হতে প্রকাশিত।[৭] এই ফরিদপুর 'জেলা ফরিদপুর' নাও হতে পারে। কেননা ফরিদপুর নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম পাবনা জেলাতেও আছে।[৮]

বর্তমানে *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য* গ্রন্থটি বাজারে প্রচলিত না থাকলেও ডঃ গোলাম সাকলায়েন কর্তৃকপ্রাপ্ত কপিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণা সংসদের *সাহিত্যিকী* ১২শ বর্ষ ১৩৮৪ বসন্ত সংখ্যায় হুবহু প্রকাশিত হয়। গোলাম সাকলায়েন যে কপিটি পেয়েছিলেন তাতে টাইটেল পৃষ্ঠা ছিন্ন থাকায় এর প্রকাশকের নাম, মূল্য সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম বলেছেন—

> রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক পুস্তিকা, স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। তৎকালীন সরকার এ পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ করেন। ইহাতে ইংরেজ ও মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুদের সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্যকথা লিখিত বলিয়া সরকার ইহা বাজেয়াপ্ত করিয়া দিয়েছিলেন।[৯]

গ্রন্থটির প্রাপ্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। "বইখানির প্রথমাংশে (টাইটেল পৃষ্ঠা) এবং শেষাংশ খণ্ডিত। শেষাংশে বইয়ের কতিপয় পৃষ্ঠা ছিন্ন হওয়ায় পরবর্তী পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি।"[১০] গ্রন্থটি সাধু বাংলাভাষায় রচিত। মোহাম্মদ নজিবর রহমান এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'পাবনা জেলার অধীন সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাতটিকরী নিবাসী জনাব মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সাহেবকে'। উৎসর্গ পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

> মাননীয় সুহৃদ,
>
> সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, প্রায় সকল লোকই নিরন্তর স্ব-স্ব স্বার্থসাধনে ব্যস্ত আছে। ক্বচিৎ বিরাম বিশ্রামের সময়টাও তাহারা বাহুল্য পচালে, হাসি-তামাশায় ও তাস পাশায় ক্ষেপণ করে। কিন্তু আপনাকে সেরূপ দেখিনা। আপনি, কিসে পতিত মুসলমান জাতির পুনরুন্নতি হইবে, কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, কিসে নিরক্ষর, সরলপ্রাণ কৃষককুল পেট ভরিয়া একমুঠা ভাত পাইবে ইত্যাদি — মনুষ্যোচিত চিন্তায় ও কার্য্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাই আজ আমি আমার সাধের এই *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য* স্বদেশী তরঙ্গের যুগে আপনার স্বদেশ ও সমাজ হিতৈষিতার কর্মঠ-উদার হস্তে অর্পণ করিলাম। সাধের সামগ্রী সামান্য হইলেও সুহৃদের নিকট উপেক্ষণীয় নহে, ইহায় ভরস। ইতি।[১১]

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে নজিবর রহমান শুধু সচেতন ছিলেন

---

৭. মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* ॥ ঢাকা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৩

৮. মোহাম্মদ নজিবর রহমান ॥ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৯. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* ॥ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

১০. গোলাম সাকলায়েন, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য*, **'সাহিত্যিকী'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪, ১২শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, পৃ. ১৫৬

১১. ঐ পৃ. ১৫৭

www.pathagar.com

না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনার প্রকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে রচনা করেন এই গ্রন্থ। বিলাতি পণ্য বর্জনের রহস্য কথোপকথনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। প্রকাশের পর ইংরেজ সরকার পুস্তকটির প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই পুস্তকের মধ্যদিয়ে নজিবর রহমান সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলেও *বিলাতী বর্জ্জন রহস্যের* ভাষাশৈলী ও সাহিত্যাদর্শ নির্মাণের প্রচেষ্টা ছিল অনুপস্থিত। নজিবর রহমান এই পুস্তকের 'মুখবন্ধে' লিখেছেন–

> *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য* প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গবেষণা, যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই। নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও দৃষ্টান্তই ইহার মূলভিত্তি। দ্রুততা ও সময়ের অভাব বশতঃ ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। অতএব প্রার্থনা-সহৃদয় বিদ্বান পাঠক তজ্জন্য কপাল কুঞ্চিত করিবেন না। এই সামান্য পুস্তকে সমাজের সামান্যটুকু উপকার হইলেও শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।–গ্রন্থাকার[১২]

সরলপ্রাণ নিরক্ষর কৃষককুলের উন্নতিচিন্তা, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল এবং পতিত মুসলমান জাতির পুনরুন্নতি ছিল সে সময়ের দাবী। *বিলাতী-বর্জ্জন রহস্য* রচনার পটভূমি বা প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতীয় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা ছিল অনেক পিছিয়ে। এর মূল কারণ ছিল মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা। অনগ্রসর জনগণ বিশেষত মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮২ সালে ডক্টর ডব্লিউ হান্টারের সভাপতিত্বে এক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ইংরেজ প্রবর্তিত চিন্তা-চেতনা অনুসরণ ও অনুকরণ করে মুসলমানদের তুলনায় ভারতীয় হিন্দুরাই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপকৃত ও প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে। "১৯০৫ সালে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় হিসেবে শাসক ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভক্ত হয় এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। এবং নবগঠিত প্রদেশের ভার পড়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের (ব্যামফিল্ড ফুলার) উপর।"[১৩]

এই নতুন প্রদেশ গঠিত হবার ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসামে হিন্দু আধিপত্য ক্ষুণ্ন হবার আশংকায় 'বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তীব্র বিরোধিতা ও আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জনের কর্মসূচী শুরু হয়। *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ* গ্রন্থে জানা যায় এই আন্দোলন ক্রমে 'স্বরাজ আন্দোলনে' রূপান্তরিত হয় এবং বিলাতি দ্রব্যাদি বর্জন করে দেশী পণ্য ব্যবহারের প্রচারণা চলতে থাকে। বস্তুত যুগ প্রেক্ষাপটে নজিবর রহমান *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য* নামে 'নাট্য প্রবন্ধ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে উল্লেখিত চরিত্রগুলো হলো- সদু মোল্লা, মুন্সী, দীন দয়াল বসু, হাজি সাহেব, মাতু জমাদ্দার, কেতাব ফকির,

---

১২. *বিলাতী বর্জ্জন রহস্য,* (সাহিত্যিকী), পৃ. ১৫৬-১৫৭

১৩. ঐ, পৃ. ১৬২

www.pathagar.com

মনির উদ্দীন, বালক ও মুসলমান বিধবা। চরিত্রসমূহের সংলাপের মধ্য দিয়ে 'স্বদেশী আন্দোলন' ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের রহস্য সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ কারণেই বিলাতী বর্জ্জন রহস্য গ্রন্থের চরিত্র, ভাষা-সংলাপ, কাহিনী এ সবের বিকাশ ঘটেনি। ফলে এ গ্রন্থ শিল্প বিচারের মানদণ্ডে দুর্বল।

বিলাতী বর্জ্জন রহস্য গ্রন্থে নজির রহমানের সংলাপ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় ঃ

মুসলমানের বৈঠকখানায় *হিতবাদী* হস্তে চশমাধারী হিন্দুর প্রবেশ।

মুসলমান ॥ এস এস, ... পান্ডা, এস আজ তোমার জন্য ১০ ঘা বেতের ব্যবস্থা করিব।

হিন্দু ॥ তা পার, কারণ আজকাল তোমরা যে, ফুলার সাহেবের প্রিয়তমা বিবি হইয়া উঠিয়াছ।[১৪]

'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করার আন্দোলন রূপ নেয় স্বদেশী আন্দোলনে। বিলাতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আন্দোলন রাজধানী অতিক্রম করে মফঃস্বল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। দীন দয়াল, মুন্সী সাহেব ও সদু মোল্লার বৃদ্ধ পিতা হাজি সাহেবের সংলাপের মধ্যদিয়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তৎকালে বিলাতি পণ্য বর্জন প্রসঙ্গে মফঃস্বল অঞ্চলের জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা ও অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়েছে। দীন দয়াল সমাজ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছে পক্ষান্তরে মুন্সি সাহেব শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবিভাগকে স্বাগত জানিয়েছে। অধিকাংশ মুসলমানদের ধারণা ও বিশ্বাস এই বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু আধিপত্য শিথিল হবে এবং দরিদ্র-মুসলমান-কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতি হবে। হিন্দু আধিপত্য বা নেতৃত্ব খর্ব করার আশঙ্কায় বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন চলতে থাকে। এর বিপরীত চিন্তা চেতনার প্রতিনিধি মুন্সি সাহেব— তার সংলাপে লক্ষ্য করা যায় ঃ

'মু ॥ বঙ্গ বিচ্ছেদের কল্যাণে যদি বঙ্গীয় জমিদারগণের বাড়াবাড়ি কমিয়া যায় তবেই দেশের মঙ্গল। তাই একদিকে বাঙ্গালাদেশের চৌদ্দআনা জমিদার হিন্দু, অপরদিকে বাঙ্গালাদেশের চৌদ্দআনা লোক মুসলমান কৃষক।

এবং—

'মু ॥ ভাই হিন্দু, তোমাদের মুসলমান বিদ্বেষের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। মুসলমান যোগ্য হইলেও তোমাদের নিদারুণ হিংসায়— কোন চাকুরীতেই ঢুকিতে পারিতেছে না। ... ভাই, সংসারের উন্নতি লইয়া মুসলমানদিগের প্রতি তোমরা এতখানি বজ্জাতি ও নেমকহারামী করিতেছ।[১৫]

নজিবর রহমান— মুন্সি সাহেবের সংলাপের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষহীন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমুক্ত স্বদেশচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে ইংরেজ সরকারের বঙ্গবিভাগকে সঙ্গতকারণেই স্বাগত জানিয়েছেন। মুন্সি চরিত্রের

---

১৪. ঐ পৃ. ১৭৭-১৭৮

১৫. ঐ, পৃ. ১৮৫

www.pathagar.com

মধ্যে অসাম্প্রদায়িক স্বদেশচিন্তা লক্ষণীয় ঃ

> ভাই হিন্দু আর বেশি বলিব না, যে ধর্ম্মভাব হইতে প্রকৃত একতার উৎপত্তি সেই ধর্ম্মভাবেই যখন হিন্দু-মুসলমানের এইরূপ দারুণ পার্থক্য রহিয়াছে...[১৬]

এছাড়াও—

> রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করাও আর এক উদ্দেশ্য। ... যে দেশে পৌত্তলিক একশ্বরবাদের একত্ববাস, অথচ উভয়েই পরাধীন, যে দেশে পৌত্তলিকতায় হাজার মত, হাজার জাতি, হাজার রীতি সে দেশে ঐ সকল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। .... স্বদেশের দুরবস্থা মোচন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তবে আমি বলি স্বদেশের জীবন যাহারা সেই কৃষককুলের জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এবং ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।[১৭]

নজিবর রহমান সংলাপ নির্ভর নাট্যভঙ্গিতে বিলাতী বর্জ্জন রহস্য রচনা করলেও এ গ্রন্থটিকে নাটক হিসেবে উল্লেখ করেন নি। এ গ্রন্থে তিনি সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ— সংলাপকে গতিশীল ও জীবন্ত করেছে। তাছাড়া সাধু গদ্যরীতির সাথে চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়—

> হা বিধাতাঃ। এমন মূর্খের সহিত কথা বলিতে আছে। অরে গোখাদক গণ্ডমূর্খ। স্বদেশী সেবায় দেশের টাকা দেশে থেকে যাবে, তাতে দেশের হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই উন্নতি হবে, তাহার ফলে তোমার আমার অর্থ কষ্ট দূর হবে।[১৮]

এছাড়া আরবি ফারসি ও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় —

> তুমি যে মৌলবীর দোহাই দিয়া আমাকে তোমার মতাবলম্বী হইতে বল সেই মৌলবীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তোমার কথার ভাবে বুঝিতেছি মৌলবীটি মিষ্টার ব্যারিষ্টারদিগের করুণাভিখারী সমাজদ্রোহী লোক। নামাজ রোজা করাকে, ইহারা অজ্ঞ লোকের মূর্খতা বলিয়া ধরে।[১৯]

নজিবর রহমান বিলাতি বর্জন আন্দোলনকে পটভূমি করে সামাজিক নাটক রচনা করতে পারতেন কিন্তু তিনি সেদিকে অগ্রসর না হয়ে সেচতনভাবে 'নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও দৃষ্টান্ত' তুলে ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এতে চরিত্র বিকশিত হয়নি এবং সমগ্র ঘটনার একাংশ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। নজিবর রহমানের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসাবে এর ভাষা, শব্দচয়ন, আঙ্গিকশৈলী যথাযথভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত না হলেও এই *বিলাতি বর্জ্জন রহস্য* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। সাহিত্যকর্ম হিসেবে এই পুস্তকটি অকিঞ্চিৎকর হলেও নজিবর রহমানের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হিসেবে এর তাৎপর্য অপরিসীম। একজন অসাম্প্রদায়িক মুসলিম কথাশিল্পী হিসেবে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

১৬. ঐ, পৃ. ১৮১
১৭. ঐ, পৃ. ১৮৯
১৮. ঐ, পৃ. ১৭৮
১৯. ঐ, পৃ. ১৮০।

www.pathagar.com

ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪৫ বর্ষ , সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৬

হাদীস শাস্ত্রে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা)-এর অবদান

তাহেরা আরজু খান*

সারসংক্ষেপ

[কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হল হাদীস। কুরআন, হাদীস, ব্যবহারিক রীতিনীতি, সমাজ ও সংসারের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ স্মরণ রাখতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তা নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট তুলে ধরতেন। তাঁরা সকলেই হাদীস বর্ণনায় এক বিশেষ মর্যাদার .অধিকারী ছিলেন। ইব্ন জাওযীর 'তালকীহ' গ্রন্থের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে নয়জন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৮২৩টি। কারও কারও মতে ২৮৩২টির উল্লেখ রয়েছে। হযরত আইশা (রা) থেকে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর অপর আটজন উম্মাহাতুল মু'মিনীন থেকে ৬১৩, মতান্তরে ৬২২টি হাদীস বর্ণনার কথা পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ কে কতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা কার কার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের নিকট থেকে কে কে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

১. হযরত 'আইশা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা' (রা) (৬১৪ খ্রি.-৫৮ হি./৬৭৮ খ্রি.) জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, রা. বি. ও প্রভাষক, হাজী জমির উদ্দীন শাফিনা মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

১. তাঁর প্রকৃত নাম 'আইশা। কুনিয়াত উম্মু 'আব্দুল্লাহ, লকব হুমায়রা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন ও সিদ্দীকা লকবেই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। মাতার নাম যয়নাব উপনাম উম্মু রুমান। হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়্যাতের চার অথবা পাঁচ বছর পর এবং হিজরতের নয় বছর পূর্বে শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, কবিতা, চিকিৎসা, ইলমুল ফারাইয প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। হযরত 'আইশা (রা) ৫৮ হিজরী মোতাবেক ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের বুধবার ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী তাঁর মৃত্যুকাল ৫৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। কারও কারও মতে, তিনি ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সীয়ারু আ'লামিন, নুবালা,* ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ মুয়াস্সাসাতুর্-রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭) পৃ. ১৩৫; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল

www.pathagar.com

ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[২] ছয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, নয় বছর বয়সে তাঁর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। এরপর তিনি দীর্ঘ ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'ইলমে হাদীসের চর্চা করেন। ফলে তাঁর থেকে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রিজালশাস্ত্রবিদগণ তাঁকে হাদীসে হাফিয বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে যে ছয়জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর নিকট থেকে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩] তন্মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে ৩১৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৭৪টি। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে এককভাবে ৫৪টি হাদীস সংকলন করেন। আর ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এককভাবে ৬৯টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৪] বদরুদ্দীন 'আইনী (র) বলেন, হযরত 'আইশা (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে সমানভাবে ১৭৪টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আলাদাভাবে সহীহ বুখারীতে ৫৪টি এবং সহীহ মুসলিমে ৫৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫] 'দাইরাতুল মা'আরিফ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আইশা (রা) থেকে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে ৩০০টি হাদীস স্থান লাভ করেছে।[৬]

ফিকর, তাঃ বিঃ), পৃ. ৩৭; ইব্ন হাজার আসকালানী, *আল-ইসাবা* ৪র্থ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, তাঃ বিঃ) পৃ. ৩৫৯; ইব্ন হাজার আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃ. ৪৮৭; ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড (তেহরানঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃ. ৫০১; ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ২য় খণ্ড (মদীনাঃ বারলীন, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৪১১; বুতরুস্-বুসতানী, *দায়েরাতুল-মাআরিফ*, ১৫শ খণ্ড, (বৈরূতঃ দারুল মা'আরেফাহ, তাঃ বিঃ) পৃ. ৪৩১; *Encyclopaedia of Islam*, V-I (Leiden : E. J. Brill, 1960), P. 695.

২. 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ হযরত 'আইশা (রা)-এর জ্ঞান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

كانت عائشة من افقه الناس وأحسن الناس رأيا فى العامة

দ্র. ইবন সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

৩. *'উলূমুল হাদীস ওয়ামুসতালাহুহু*,, পৃ. ৩৬৪; 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী বলেন,

وكانت من أكبر فقهاء الصحابة واحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية روى لها الفًا حديث ومأتا حديثٍ وعشرة أحاديث.

দ্র. *'উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, তাঃ বিঃ) পৃ. ৩৮

৪. আজ্জাজ আল খতীব, *আস্-সুন্নাহ কাবলাত্-তাদভীন*, পৃ. ৩৭৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة احاديث إتفق لها البخاري ومسلم على مئة واربعة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين

দ্র. *সীয়ারু আ'লামীন নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

৫. মূল আরবী, إتفق البخارى ومسلم على مائةٍ وأربعة وسبعين حديثًا وأنفرد البخاري أربعة وخمسين ومسلم بثمانية وخمسين

দ্রঃ *'উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

৬. *দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামীয়্যা*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪২৪।

www.pathagar.com

হযরত 'আইশা (রা) সাহাবীগণের মধ্যে যাঁদের থেকে হাদীস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন— হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা), হামযাহ ইব্ন 'আমর আল-আসলামী (রা), জুদামাহ বিন্ত ওয়াহাব (রা), হযরত ফাতিমা (রা) প্রমুখ।

হযরত 'আইশা (রা) থেকে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ 'আমর ইবনুল আস (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), যায়েদ ইব্ন খালেদ (রা), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ওমর (রা), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), রবীয়াহ্ ইব্ন 'আমর (রা), হারেস (রা), আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রা), হযরত 'আউফ (রা), আসমা বিন্ত 'আব্দুর রহমান (রা), 'আইশা বিন্ত তালহা (রা), যাকওয়ান (রা), সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা), আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা) প্রমুখ। এছাড়াও হযরত 'আইশা (রা) থেকে আরও অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন।

তাবে'ঈগণের মধ্যে সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা), আলকামাহ ইব্ন কায়েস (রা), মাসরুক ইবনুল আজদাহ (রা), 'আইশা বিন্ত তালহা (রা), আমরাহ বিন্ত 'আব্দুর রহমান ও হাফসা (রা)সহ অনেকেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৭]

প্রবীণ পুরুষ সাহাবীগণের ন্যায় হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে হযরত 'আইশা (রা)-এর অবদান অপরিসীম। কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যত বেশী নৈকট্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, হাদীস সংরক্ষণে তাঁর ভূমিকা তত বেশী। তাই হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী হিসেবে এ সুযোগটি বেশী পেয়েছিলেন। আর তিনি হাদীসের হাফেযাহ ও উচ্চ পর্যায়ের ভাষা জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮]

সাহাবী 'আব্দুর রহমান ইবন আওফের পুত্র তাবেয়ী আবূ সালমা বলেন,[৯]

مارأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله عليه وسلم ولاافقه فى رأى ان احتيج الى رأية ولا اعلم بأي فيما نزلت ولا فريضة من عائشة.

'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সম্বন্ধে, ফিক্হ ও প্রয়োজনে কোন ব্যাপারে নিজ মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দান, আয়াতের শানে নুযূল এবং ফরজ বিষয়সমূহে 'আইশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী ও সুচিন্তিত মতামতের অধিকারী আর কাউকে দেখি নি।'

হযরত 'আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে একদিন এক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপনি বলুন তো, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় আলিম কে ? লোকটি বলল আপনি। 'আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, না। আমি কসম দিচ্ছি আপনি সত্য কথাটি বলুন।

---

৭. *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮; *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু,* পৃ. ৩৬৫-৩৬৬; *সীয়ারু আ'লামিন্ নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৩৭।

৮. *আস্-সুন্নাহ কাবলাত্-তাদবীন,* পৃ. ৪৭৫; *সীয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯; বতরূস আল-বুস্তানী বলেন, وكانت عائشة فصحية اللسان حافظة للحديث روث عنها الرواة من الرجال والنساء ٢٢١٠ احاديث.

দ্র. আল বুস্তানী, *দায়েরাতুল মা'অরিফ,* ১১শ খণ্ড (বৈরূত ঃ দারুল ফিক্র, তাঃ বিঃ), পৃ. ৪৬৮।

৯. *আল-মুস্তাদরাক,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

তখন লোকটি বলল যদি তাই হয়, তাহলে 'আইশা (রা)।

হযরত উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) বলেন,[১০]

مارأيت احداً أعلم بالحلال والحرام، والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين

'আমি হালাল-হারাম, জ্ঞান, কবিতা ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী অন্য কাউকে দেখি নি।'

অপর এক বর্ণনায় উরওয়ার কথাগুলো এভাবে এসেছে ঃ[১১]

ماريتُ احداً اعلم بالقرآن ولابفريضة ولا بحلال ولابفقه ولابشعر ولابطب ولابحديث العرب ولانسب من عائشة.

'আমি কুরআন, ফারায়েজ, হালাল-হারাম, ফিক্হ, কাব্য, চিকিৎসা, আরবের ইতিহাস ও নসব বিদ্যায় 'আইশা (রা)-এর চেয়ে বড় আলিম আর কাউকে দেখি নি।'

হাদীস ও সুন্নাতের হিফাজত ও প্রচার প্রসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্য স্ত্রীগণ ও করেছেন তবে তাঁদের কেউই হযরত 'আইশা (রা)-এর স্তরে পৌঁছতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে মাহমূদ ইব্ন লাবীদ মন্তব্য করেন,[১২]

كان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيراً ولامثلا لعائشة وأم سلمة.

'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ বহু হাদীস স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু কেউ 'আইশা (রা) ও উম্মু সালামার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি।'

হাদীস মুখস্থ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাতের প্রচার কর্ম অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনও করতেন, কিন্তু তাঁরা কেহই হযরত 'আইশা (রা)-এর মত প্রচার করতে পারেন নাই। ইমাম যুহরী (র) বলেন,[১৩]

لوجمع علم الناس كلهم وعلم ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة أوسعهم علماً

'যদি সকল মানুষ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের ইলম একত্র করা যেত, তাহলে তাদের মধ্যে 'আইশা (রা)-এর ইলম বা জ্ঞান অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত হত।'

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন,

خذو شطر دينكم من حميراء

---

১০. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১১. পূর্বোক্ত ঃ *আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্-তাদবীন,* পৃ. ৪৭৪।

১২. *সীয়ারু আ'লামিন্ নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

১৩. *আল-ইসাবা,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; আল্লামা ইবন কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯২; *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু,* পৃ. ৩৬৫।

www.pathagar.com

'তোমরা তোমাদের দীনের একটি অংশ হুমাইরা হতে গ্রহণ কর।'[১৪]

মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান বলেন,[১৫]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

—'রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত 'আইশা (রা)-এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সমস্ত নারীদের উপর 'আইশা (রা)-এর ফযীলত তেমন, যেমন সমস্ত খাদ্যের উপর সারিদ খাদ্যের ফযীলত।[১৬]

২. হযরত উম্মু সালমা (রা)

হাদীসের ক্ষেত্রে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালমা[১৭] (রা) হযরত 'আইশা (রা)-এর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। তাঁর থেকে সর্বমোট ৩৭৮টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[১৮] এর মধ্যে তেরটি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি। ইমাম বুখারী (র) স্বতন্ত্রভাবে তাঁর সহীহ বুখারীতে তিনটি এবং

---

১৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

১৫. *তাবাকাতুল কুবরা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

১৬. *সুনান ইবন মাজাহ,* পৃ. ২৩৬; আসকালানী, *ফতহুল বারী,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

১৭. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালমা (রা)-এর প্রকৃত নাম হিন্দা। উপনাম উম্মু সালমা। তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। পিতার নাম আবু উমাইয়্যা ইবনে আল মুগীরা। তাঁর উপাধী ছিল যাদুর রাকব। মা ছিলেন আতিকা বিনতে আমির ইবনে রাবীআ। তাঁর বংশ ধারা হল উম্মু সালমা বিনতে আবী উমায়্যা ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মাখযুম আল কুরাইশীয়া আল মাখযুমীয়া। হিজরী চতুর্থ সনের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত উম্মু সালমা (রা) যে দিন রাসূল (সা)-এর ঘরে আসেন সে দিনই নিজ হাতে খাবার তৈরি করেন। হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা) অল্প কিছু দিন আগে ইন্তিকাল করেন। ফলে উম্মু সালমা (রা)-কে তাঁরই ঘরে উঠানো হয়। মহানবী (সা)-এর প্রতি উম্মু সালমার গভীর ভালবাসা ও পরম শ্রদ্ধাবোধ ছিল। রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসার স্মৃতি হিসেবে তাঁর দেহের একটি পশম তিনি নিজের কাছে রুপোর একটি পাত্রে সংরক্ষণ করেছিলেন। সাহাবীদের কেউ কোন দুঃখ-বেদনা পেলে এক পেয়ালা পানি এনে তাঁর সামনে রাখতেন; তিনি পশম মুবারকটি সেই পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন। সেই পানির বরকতে তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব বলেন, আমি উম্মু সালমার নিকট গেলাম। তিনি হিন্নাওকাতান- এ রক্ষিত রাসূল (সা)-এর একটি পশম বের করেন। হযরত উম্মু সালমা (রা) ছিলেন একজন লজ্জাবতী ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মহিলা। হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর গোটা জীবনই ছিল যুহদ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও চাক-চিক্যের প্রতি খুবই কম দৃষ্টি দিতেন। তিনি নিজে যেমন দানশীল ছিলেন তেমনি অন্যকেও দানশীলতার জন্য উৎসাহিত করতেন। তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল ওয়াকেদীর মতে ৫৯ হিজরী ; ইবনে হিব্বানের মতে ৬১ হিজরী ; আবূ খায়সামার মতে ৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় উম্মু সালমার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযা নামায পড়েন। মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১; *তাহযীবু আসমা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৯; *উসদুল গাবাহ,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০; *Encyclopaedia of Seerah,* Vol-2, p. 185

১৮. *বিশ্ব নবীর দাম্পত্য জীবন,* পৃ. ১৫১।

www.pathagar.com

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থে তেরটি হাদীস বর্ণনা করেন।[১৯] এই হিসেবে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী। তিনি ছিলেন গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী। তাঁর হাদীসের প্রজ্ঞা সম্পর্কে মাহমূদ ইব্ন লাবীদ বলেন,[২০]

كَانَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِىِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا وَلاَ مَثَلاً لعائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ.

'যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের প্রচুর হাদীস মুখস্থ ছিল। তবুও তাঁদের মধ্যে হযরত 'আইশা (রা) এবং উম্মু সালমা (রা)-এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।'

তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর হাদীস শ্রবণের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী ঠিক করছিলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বারে দণ্ডায়মান হলেন। যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে يَاَيُّهَا النَّاس -'হে লোক সকল!' উচ্চারণ হতেই তিনি চুল বিন্যস্তকারীকে বলেন, তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে দাও। তিনি বললেন, এত তাড়াহুড়া কিসের ? কেবলমাত্র يَاَيُّهَا النَّاس - 'হে লোক সকল' উচ্চারিত হয়েছে। উম্মু সালমা (রা) বলেন, আমরা কি লোকদের মধ্যে শামিল নই ? এরপর তিনি নিজে চুল বেঁধে উঠে দাঁড়ান এবং গোটা খুতবা শুনেন।[২১]

হযরত উম্মু সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবী সালমাহ ইবন 'আব্দুল আসাদ (রা) ও ফাতিমা বিনতে (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২]

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাঁর পুত্র হযরত 'ওমার এবং যায়নাব, তাঁর ভাই আমের, ভ্রাতুষ্পুত্র মুস'আব ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন রাফে', নাফে', ইব্ন সাফীনা, আবূ কাসীর, খযরা, সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা, হিন্দা বিন্ত হারিস, কাবীসা বিন্ত জুরাইব, আবূ 'ওসমান নাহদী, আবূ ওয়ায়িল শাকীক ইব্ন সালামাহ, হুমাইদ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ, যাকওয়ান আবূ সালাহ, আর্-রাবীহ' ইবন আনাস, সা'ঈদ ইব্ন আবী সা'ঈদ, সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, 'আমের আশ্শাবী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরাইদ আল-আসলামী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিস নওফেল, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী

---

১৯. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

واتفق البخاري، ومسلم لها على ثلاثة عشر. وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة عشر.

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০।

২০. *তাবাকাতুল কুবরা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬; *হায়াতুস্-সাহাবা,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

২১. *মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৯৭; *ইলমুল মু'আক্কেইন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

২২. তাহযীবুল কামাল, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন,

روت عن النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبى سلمة بن عبد الأسد، وفاطمة بنت رسول اللّٰه صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

দ্র. *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯।

www.pathagar.com

বকর আস্-সিদ্দীক, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী মুলায়কাহ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্হাব ইব্ন যামআ', ওয়াহাব ইব্ন 'আব্দ যামআ', 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ, 'ওসমান ইব্ন মাওহাব, 'ইকরামাহ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন হারেস ইব্ন হিশাম, মাসরূক ইব্নুল আযদ, নাফী' ইব্ন জুবাইর ইব্ন মুত'ইম, নাফী' ইব্ন 'ওমর প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈ।[২৩]

হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর হাদীসগুলো ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর মুসনাদের ষষ্ঠ খণ্ডে ২৮৯ থেকে ৩২৪ পৃষ্ঠায় সংকলিত করেছেন।

হযরত উম্মু সালমা (রা) ফিক্হ সম্পর্কেও অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যেমন,

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মনে করতেন, রমযানে নাপাক হলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এক ব্যক্তি হযরত 'আইশা (রা) এবং হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর নিকট এ ধারণার অনুমোদন চাইলে তাঁরা উভয়ে এটা রদ করে বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রমযানে নাপাক অবস্থায় পাওয়া গেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জানতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমি কি করবো, ইব্ন 'আব্বাস (রা) আমাকে এটা বলেছেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, উম্মু সালমা (রা) এবং 'আইশা (রা)-এর জ্ঞান বেশি।[২৪]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের আসরের নামাযের পর দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। মারওয়ান জিজ্ঞেস করেন, আপনি এ নামায কেন পড়েন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়তেন। যেহেতু হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা) এ হাদীসটি হযরত 'আইশার সিলসিলায় শুনেছেন, তাই মারওয়ান অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট লোক পাঠান। তিনি বললেন, উম্মু সালমার মাধ্যমে এ হাদীসটি আমার কাছে পৌঁছেছে। হযরত উম্মু সালমার কাছে লোক গিয়ে একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন,[২৫]

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِعَائِشَةَ لَقَدْ وَضَعَتْ اَمْرِي عَلَى غَيْرِ مَوْضَعِهِ اَوَلَمْ أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْنَهٰى عَنْهَا

"আল্লাহ্ 'আইশাকে ক্ষমা করুন। তিনি আমার কথা ভুল বুঝেছেন। আমি তাঁকে এটা বলিনি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পড়তে নিষেধ করেছেন।"

একবার কোন এক লোককে কিছু একটা মাস'আলা বলেন, এতে লোকটির তৃপ্তি হয় নি। তিনি তাঁর কাছ থেকে অন্য স্ত্রীদের নিকটে যান। সকলে একই জবাব দেন। ফিরে এসে হযরত

---

২৩. *তাহযীবুল কামাল*, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৪৪০; *তাহযীবুত্-তাহযীব*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯; শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী বলেন,

روى عنها : سعيدُ بن المُسيَّب، وشَقِيْقُ بنُ سَلَمَة، والأَسودُ بنُ يزيد، والشَّعْبِيُّ، وأبو صالح السمان، ومُجَاهِدُ، ونافعُ بنُ جُبَيْر بن مطعم، ونافعُ مولاها، ونافعُ مولى ابنِ عمر، وعَطاءُ بن أبي رَباح، وشَهْرُ ابنُ حَوْشَب، وابنُ أبي مُلَيكة، وخلق كثير.

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২।

২৪. *সহীহ বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬, ৩৩৮।

২৫. *মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৯ ও ৩০৩।

www.pathagar.com

উম্মু সালমা (রা)-কে এটা জানালে তিনি বলেন, দাঁড়াও আমি তোমাকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করছি। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাদীস শুনেছি।[২৬]

৩. হযরত উম্মু হাবীবা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা[২৭] (রা) থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে দুইটি হাদীস মুত্তাফাকুন 'আলাইহি এবং দুইটি ইমাম মুসলিম (র) এককভাবে তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে সংকলন করেন।[২৮]

তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৯] তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা অনেক। তাঁরা হলেন, যাকওয়ান আবু সালেহ আস্-সামান, তাঁর গোলাম সালিম ইব্ন শাওয়াল, শুতাইর ইব্ন শাকাল ইব্ন হুমাইদ আল-আনসীয়্যু, শাহ্র ইব্ন হাওশাব আশ্-শামী, আবদুল্লাহ ইব্ন ওতবাহ ও মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফইয়ান (আবূ সুফইয়ানে দুই পুত্র), ওরওয়াহ ইব্নুয্-যুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সুফইয়ান, আবুল জার্রাহ, আবূ সুফইয়ান ইব্ন সা'ঈদ ইব্নুল মুগীরাহ ইবনুল আখনাস ইব্ন শারীক আশ-শাকাফী, আবূ মালীহ আল-হুযালী, হাবীবা বিন্ত আবী হাবীবা (কন্যা), 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ আল-আসাদী, যায়নাব বিন্ত আবী সালমা, সুফিয়্যাহ বিন্ত আবী শায়বাহ প্রমুখ।[৩০]

---

২৬. *মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৯।

২৭. তাঁর প্রকৃত নাম রামলা। কারও কারও মতে তাঁর নাম ছিল হিন্দা। উপনাম উম্মু হাবীবা। পিতার দিক থেকে বংশ পরিচয় হল, রামলা বিন্ত আবী সুফইয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমাইয়্যাহ ইব্ন আবদ শামস। মাতার নাম সুফিয়া বিন্ত আবুল আস ইব্ন উমায়্যাহ ইব্ন আব্দ শামস আম্মাহ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। হযরত উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের ১৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ওসমান আল-আখনাসী বর্ণনা করেন, উম্মু হাবীবা (রা) হাবশায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উম্মু হাবীবা (রা)-এর প্রথম বিবাহ উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ ইব্ন রুবাবের সাথে হয়। উবায়দুল্লাহর সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর উম্মু হাবীবা (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ হয়।
দ্র. *তাবাকাতুল কুবরা*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; *উসুদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০১-৪০২; *তাহযীবুল কামাল*, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮, ৪৫, ৫৭; *আল-ইসাবা*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১২; *আল-মা'আরিফ*, পৃ. ৮২; *তাকরীবুত-তাহযীব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭৬; তাহযীবুত-তাহযীব, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬; শাযারাতুয-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২, ৮৫; *মুসনাদে আহমদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সীয়ারু 'আলামিন্-নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

২৮. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

مسندها خمسة وستون حديثًا. واتفق لها البخاري ومُسلم على حديثين، وتفرد مسلم بحديثين.

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯।

২৯. *তাহযীবুত্-তাহযীব*, ১০ম খন্ড, পৃ. ৪৭৩; হাফিয মিয্যী বলেন,

روت عن : النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وعوزينب بنت جحْش

দ্র. *তাহযীবুল কামাল*, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩২।

৩০. *তাহযীবুত্-তাহযীব*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩; *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯; হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : ذكْوَان أبو صالح السَّمان، ومولاهم سالم بن شَوَّال المكيُّ، وشُتَيْر بن شَكَل بن العَنْسيُّ، والمحفوظ

www.pathagar.com

রত উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের ওপর অত্যন্ত কঠোরভাবে 'আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও আমল করার প্রতি তাকীদ দিতেন। একদা তাঁর ভাগিনী আবু সুফিয়ান ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন মুগিরা উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট দেখা করতে আসেন। তিনি যবের ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করলেন, উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, তোমার ওযু করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে জিনিস আগুনে রান্না করা হয়েছে তা খেলে ওযু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৩১]

৪. হযরত হাফসা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা[৩২] (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পিতা হযরত 'ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৩] তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন— হারিস ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী রাবীয়াহ আল-মাখযুমী, হারিস ইব্ন ওয়াহাব আল-খুযায়ী, হামযাহ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ওমর শুতাইর ইব্ন শাকাল ইব্ন হুমায়দ আল-'আব্বাসী, আবূ যায়দ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী সাদ আল-মাদানী, 'আব্দুর রহমান ইব্নুল হারেস ইব্ন হিশাম, 'আমর ইব্ন রাফী, আল-মাসাইয়্যেব ইব্ন রাফী, আল-মুত্তালেব ইব্ন আবী ওদা'আহ, হুনাইদ

حديث شُتَير عن حفصة، وشَهْر بن حَوْشَبٌ الشَّاميُّ، وابن أختها عبد الله بن عُتبة بن أبي سفيان، وعُروة بن الزبير، وأخوها عَنْبَسَة بن أبي سفيان، ومحمد بن أبي سُفيان بن العلاء بن حارثة الثَّقَفِيُّ، وأخوها مُعاوية بن أبي سُفيان، ومولاها أبو الجَرَّاح، وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيْق الثَّقَفِيُّ، وأبو المَلِيح الهُذَلِيُّ، على خلافيه، ابنتها حَبيبة بين أبي حبية، وهي بنت عُبَيْد الله بن جحش الأَشَدِيُّ، وزينب بنت أبي سلمة، وصَفِية بنت أبي شيبة.

দ্র. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩২।

৩১. *মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৬; অবশ্য এ হাদীসটি পরবর্তীতে মানসুখ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণ আগুনে রান্না করা জিনিস খেতেন এবং যদি প্রথম থেকে ওযু থাকত হবে দ্বিতীয়বার আর ওযু করতেন না। বরং প্রথম ওযু দিয়েই নামায পড়ে নিতেন।

৩২. তাঁর প্রকৃত নাম হাফসা। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশীয় লৌহ মানব সুযোগ্য ও প্রভাবশালী নেতা এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'ওমর (রা)-এর কন্যা ছিলেন। মাতার নাম যয়নব ইব্ন মাজ'উন। হযরত হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয় হিজরীর শাবান মাসে তাঁকে বিবাহ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর। হযরত হাফসা (রা) ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। ইব্ন কুতাইবা (র) (মৃ. ২৭৬ হি.) বলেন, তিনি হযরত 'ওসমান (রা)-এর খিলাফতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৪৪৮ হি.) বলেন, এক জামা'আতের মতে, হযরত হাফসা (রা) ৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু 'আলামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭; ইব্ন সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৫; *উসদুল গাবাহ,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯; *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩১৫; *সিফাতুস্-সাফওয়াহ,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; *আল-ইসাবা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫১; *আল-মা'আরিফ,* পৃ. ৮১; *তাকরীবুত্-তাহযীব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৯; *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪; *শাযারাতুয-যাহাব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০, ১৬; *মুসনাদে আহমদ,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

৩৩. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ডে, ৩১৫; *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ.।

www.pathagar.com

ইব্ন খালিদ আল-খুযায়ী, আবূ মিযলাহ, আবূ বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবী খায়শামাহ, সাফিয়্যা বিন্ত আবী উবায়দ, উম্মু মুবাশ্শার আল-আনসারিয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[৩৪]

হযরত হাফসা (রা) থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩৫] তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে চারটি হাদীস মুত্তাফাকুন 'আলাইহি এবং ছয়টি হাদীস সহীহ বুখারীতে এককভাবে বর্ণিত রয়েছে।[৩৬]

হাফসা (রা) তৎকালীন 'আরবের অন্য সকল পুরুষ-নারীর মতই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন নি। তবে তাঁর পিতা হযরত 'ওমর (রা) ও স্বামী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চেয়ে বড় শিক্ষক আর কে হতে পারতেন ? তাঁদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জন ও দীনকে বোঝার প্রবল আগ্রহ জন্ম নেয়। দীনী বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিভিন্ন ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়। যেমন একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশকারীগণ জাহান্নামে যাবে না। হযরত হাফসা (রা) আপত্তি করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,[৩৭]

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا .

'তোমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই তা অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার রবের উপর কর্তব্য। এটা অবশ্য ঘটে থাকবে। অতঃপর আমরা পরহেযগারদের মুক্ত করবো আর যালিমদেরকে হাঁটু গেড়ে তাতে নিক্ষেপ করবো।'

হযরত হাফসা (রা)-এর মধ্যে জানার ও শিখার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব সময় তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শিখানোর চিন্তা করতেন। হযরত শিফা বিন্তে 'আব্দিল্লাহ

---

৩৪. *তাহযীবুত্-তাহযীব*, ১০ম খণ্ড, পৃ. হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : الحارث بن عبد الله بن أبي رَبيعة المخزوميُّ، وحارث بن وَهْب الخُزَاعيُّ، وله صحبة، وابن أختها حمزة بن عبد الله بن عمر، وسَوَاء الخزاعيُّ، وشُتَيْر بن شَكَل بن حُمَيْد العَبْسيُّ، وأبو زيد عبد الله بن أبي سعد المدينيُّ، وعبد الله بن صفوان بن أَمَيَّة الجَمَحيُّ، وأخوها عبد الله بن عُمر، وعبد الرَّحمن بن الحارث بن هشَام، وعَمرو بن رافع، والمُسَيِّبْ بن رافع، والمطلب بن أبي وداعة، وهُنيدة بن خالد الخُزَاعيُّ، وأبو مِجْلَز لاحِق بن حُميد، وأبو بكر بن سُلَيْمَان بن أبي خَيْثمَة، وصفية بنت أبى عُبيد، وأَمّ مُبَشَّر الانصارية ولها صُحبة.

দ্র. *তাহযীবুল কামাল*, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

ومسندُها في كتاب بَقِيَ بن مَخْلد ستونَ حديثًا

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০।

৩৫. যারকানী, *আল-মাওয়াহিব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১।

৩৬. *বুলূগুল 'আমানী*, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৩১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

إتفق لها الشيخان علي أربعة أحاديث. وانفرد البجارى بستة أحاديث

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০।

৩৭. সূরা মারইয়াম ঃ ৭১-৭২।

www.pathagar.com

ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। হযরত হাফসা (রা) তাঁর নিকট লেখা শিখেন। এই শিফা নামলা নামক এক প্রকার ক্ষত-রোগ নিরাময়ের ঝাঁড়-ফুঁক জানতেন। জাহিলী জীবনে এই ঝাঁড়-ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) শুনে বললেন, এই ঝাঁড়-ফুঁকটি তুমি হাফসাকে শিখিয়ে দাও। অন্য একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সা) শিফাকে বলেন, তুমি কি হাফসাকে এই নামালার দু'আটি শিখিয়ে দেবে না যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছিলে ?[৩৮]

৫. হযরত মায়মূনা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা[৩৯] (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০] তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মা'বাদ ইব্ন 'আব্বাস (রা), সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সুলাইত, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'আব্দুর রহমান ইবনুস্-সায়িব আল-হিলালীয়্য, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উতবাহ ইব্ন মাসঊদ, 'উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী, 'উবায়দুল্লাহ ইবনুস্-

---

৩৮. আওনুল মাবুদ, *শারহ সুনানে আবী দাউদ,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; আল-মুফাস্সার ফী আহকামিল মারয়াতি ওয়াল বায়ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।

৩৯. তাঁর প্রকৃত নাম বার্‌রাহ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিয়ের পর তাঁর নাম পরিবর্তন করে মায়মূনা রাখেন। তাঁর বংশ পরিচয় হল, মায়মূনা বিন্ত হারিস ইব্ন হাজন ইব্ন যুবাইর ইব্ন হাযম ইব্ন রোওয়বা ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হেলাল ইব্ন 'আমের ইব্ন সা'অসা'আ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন বকর ইব্ন হাওয়াযেন ইব্ন মনসুর ইব্ন ইকরামা ইব্ন খলিফা ইব্ন কায়েস ইব্ন আয়লান ইব্ন মুদার। তাঁর মাতার নাম হিন্দ, তিনি ছিলেন হোমায়ের গোত্রের মহিলা। মাতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিচয় হচ্ছে, হিন্দ বিন্ত 'আউফ ইব্ন জুবাইর ইব্ন হারিস ইব্ন হুমাতা ইব্ন জারশ। হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে আরবের অনেক বড় নামী-দামী বংশ ও ঘরের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বোন উম্মুল ফাদল লুবাবা আল-কুবরা ছিলেন হযরত 'আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী। হযরত মায়মূনার স্বামী আবু রুহম ইন্তিকাল করলে লোকেরা তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের ব্যাপারে চেষ্টা করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) 'ওমরাতুল কাযা আদায় করার জন্য মক্কায় যাওয়ার পথে সারাফ নামক স্থানে জিলকদ মাসে তাঁকে বিবাহ করেন। জিলকদ মাসে পাঁচশত মতান্তরে চারশত দিরহাম দেন-মোহরের বিনিময়ে হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হাফিয মিয্যীর মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের সর্বশেষ বিবাহ ছিল এবং হযরত মায়মূনা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ স্ত্রী। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কোন বিবাহ করেন নি। হযরত মায়মূনা (রা)-এর ইন্তিকালের তারিখ নিয়ে রিজালশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বর্ণনাতে দেখা যায় তিনি ৫১, ৬১, ৬৩ ও ৬৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তবে অধিকাংশ রিজালশাস্ত্রবিদগণের মতে তিনি ৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. *তাবাকাতুল কুবরা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; *উসদুল গাবাহ,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০১-৪০২; *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; *আল-ইবার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮, ৪৫, ৫৭; *আল-ইসাবা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১২; *আল-মা'আরিফ,* পৃ. ৮২; *তাকরীবুত্-তাহযীব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭৬; *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬; *শাযারাতুযয-যাহাব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১২, ৮৫; *মুসনাদে আহমদ,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৯; *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

৪০. *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬; *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪।

www.pathagar.com

সাবাক, 'আতা ইব্ন ইয়াসার, 'ইমরান ইব্ন হুযায়ফাহ, কুরাইব, ইয়াযীদ ইবনুল 'আসিম, 'আলীয়া বিন্ত সুবায় এবং নাদাবাহ কারও কারও মতে বুদাইয়্যাহ প্রমুখ।[৪১]

হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৬টি মতান্তরে ৭৬টি। তার মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে একসাথে বর্ণিত সংখ্যা ৭টি। আলাদাভাবে বুখারীতে একটি এবং মুসলিমে পাঁচটি। এছাড়া বাকীগুলো বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে।[৪২]

হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত কিছু হাদীসের মধ্যে শরী'আতের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

৬. হযরত সাফিয়্যা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা[৪৩] (রা)-এর নিকট থেকে দশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি হাদীস মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।[৪৪] কারও কারও মতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২৪টি।[৪৫]

হযরত সাফিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইসহাক ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইব্ন নাওফাল, 'আলী ইবনুল হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী

---

৪১. তাহযীবুত্-তাহযীব, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬; *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯; হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، ومولاها سليمان بن يسار، وعبيد الله بن سليط، و ابن أختها عبد الله بن شداد بن الهاد، وابن أختها عبد الله بن عباس، وابن أختها عبد الرحمن بن السائب الهلالى، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وربيبها عبيد الله الخولاني، وعبيد بن السباق، ومولاها عطاء بن يسار، وعمران بن خذيفة، وكريب ،ولى ابن عباس، وابن أختها يزيد بن الأصم، والعلالية بنت سبيع، ومولاتها ندبة ويقال : بدية.

দ্র. *তাযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪।

৪২. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

روي لها سبعة أحاديث في (الصحيحين)، وإنفرد لها البخاري بحديث، ومسلم بخمسة، وجميع ما روت ثلاثة عشر حديثا

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

৪৩. সাফিয়্যাহ (রা)-এর প্রকৃত নাম যয়নাব। তাঁর পিতা ছিলেন হারূন (আ)-এর অধঃস্তন পুরুষ। এ জন্য তাঁকে সাফিয়্যাহ বিনত হুয়াঈ ইসরাঈলিয়াও বলা হয়। মাতার নাম বাররা বিনত সামাওয়াল। পিতৃ ও মাতৃ বংশ যথাক্রমে বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা'র কারণে তিনি অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

৪৪. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

ورد لها من الحديث عشرة أحاديث، منها واحد متفق عليه

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

৪৫. *বিশ্ব নবীর দাম্পত্য জীবন,* পৃ. ১৫১।

www.pathagar.com

তালীব, কিনানা, ইয়াযীদ ইব্ন মুআত্তাব, মুসলিম ইব্ন সাফওয়ান প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৬]

৭. হযরত যায়নাব (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব[৪৭] (রা) খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর থেকে কেবলমাত্র এগারটি হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়। এর মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা দু'টি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৮]

হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আস্-সিদ্দীক, কুলসুম ইব্নুল মুসতালাক আল-খাযায়ী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ, যায়নাব বিন্ত আবী সালামাহ, উম্মু হাবীবাহ বিন্ত আবী সুফইয়ান।[৪৯]

---

৪৬. *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

حدث عنها : علي بن الحسين، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث، وكنانة مولاها، وآخرون

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومولاها كنانة، ومسلم بن صفوان، ومولاها يزيد بن معتب، وابن أختها.

দ্র. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬

৪৭. তাঁর প্রকৃত নাম যয়নাব। তাঁর কুনিয়াত উম্মুল হাকাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। তিনি কুরাইশ বংশীয় প্রসিদ্ধ আসাদ ইব্ন খুজাইমার বংশদ্ভুত ছিলেন। পিতার নাম জাহাশ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, যয়নব বিন্ত জাহাশ ইব্ন রিয়াব ইব্ন ই'মার ইব্ন সাবরাতা ইব্ন মুররা ইব্ন কাবীর ইব্ন গানাম ইব্ন দুওদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুজাইমা আল-আসাদিয়্যাহ। মাতার নাম উমাইমাহ বিন্ত আব্দুল্লাহ ইব্ন হিশাম ইব্ন আব্দ মান্নাফ ইব্ন কুসাই। উমাইমাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু ছিলেন। এদিক থেকে হযরত যয়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফাতো বোন। রাসূলুল্লাহ (সা) তৃতীয় হিজরীতে যয়নব (রা)-কে বিবাহ করেন। কাতাদা, ওয়াকিদী ও আহলে মদীনার কিছু লোকের মতে, পঞ্চম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন।

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১; ইব্ন সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮০; *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; *উসদুল গাবাহ,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯; *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫; *তাকরীবুত্-তাকরীব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬৪; *আল-মা'আরিফ,* পৃ. ৮১; *শাযারাতুয্-যাহাব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০, ৩১; *আল-ইবার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৫, ২৪।

৪৮. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।

৪৯. *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫; হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكُلثوم بن المُصْطلق الخُزاعيُّ، وابنُ أخيها محمد بن عبد الله بن جَحَشُ، ومولاها مذكور، وزينب بنت أبي سَلَمَة رَبيبة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأُمُّ حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي سلَّى الله عليه وسلَّم.

দ্র. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

روى عنها : ابنُ اختها محمدُ بنُ عبد الله بن جحش، وأُمُّ المؤمنين أُمُّ حبيبة وزينتُ بنت أبي سلمة، وأرسل عنها القاسمُ بنُ محمد.

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২।

www.pathagar.com

৮. হযরত জুওয়াইরিয়া (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া[৫০] (রা) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এর সংখ্যা সাতটি বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন। এর মধ্যে সহীহ বুখারীতে একটি এবং সহীহ মুসলিম শরীফে দুইটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[৫১] কারও কারও মতে হযরত জুওয়ারিয়ার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২৫ এবং কারও কারও মতে ২৪ বলে উল্লেখ করেন।[৫২]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৩] তাঁর থেকে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আল-হাদ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'উবায়দ ইব্ন আস্-সাব্বাক, কুরাইব ইব্ন 'আব্বাস (রা), কুলসুম ইব্ন মুসতালিক (রা), মুজাহিদ ইব্ন জাবর আল-মাক্কী, আবূ আইউব আল-মারাগী আল-আয্দী।[৫৪]

---

৫০. তাঁর নাম জুওয়াইরিয়া। পিতার নাম হারিস। তিনি বনু মুসতালিক বংশের পুরোধা-প্রধান ছিলেন। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, জুওয়াইরিয়া ইব্ন হারিস ইব্ন আবী দীরার ইব্ন হাবিব ইব্ন আইয্ ইব্ন মালিক ইব্ন জুযাইমা ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন রাবিয়া ইব্ন হারিস ইব্ন 'আমর মুযিকিয়া। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা)-এর প্রথম বিবাহ নিজের বংশের মুসাফি ইব্ন সফওয়ান (জীশফর)-এর সাথে হয়েছিল। তিনি হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) চাচাতো ভাই এবং জী আশ্-শফর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতা হারিস ও স্বামী মুসাফি উভয় ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। পরবর্তীতে তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেছেন,

فَلَقَدْ أَعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فَمَا اَعْلَمُ اِمْرَاَةً اَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا

— আমি জুওয়াইরিয়া (রা)-এর চেয়ে স্বীয় জাতির জন্যে মহৎ সৌভাগ্যস্বরূপ নারী দেখিনি। কারণ তাঁর সূত্রে বনু মুসতালিক গোত্রের সহস্র পরিবারকে মুক্ত করে দেয়া হয়। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) পঞ্চাশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। অপর এক বর্ণনা মতে, তিনি হিজরী ৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১; ইব্ন সা'দ, *তাবাকাতুল-কুবরা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯২; *উসদুল গাবাহ,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩; *সিফওয়াতুস্-সাফওয়া,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩০৮; *আল-ইসাবা,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫১; *আল-মা'আরিফ,* পৃ. ৮২; *তাকরীবুত্-তাহযীব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪, ৪৪৯; *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১; *শাযারাতুয-যাহাব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১; *মুসনাদে আহমদ,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৫৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *আল-ইবার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭, ৬১।

৫১. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; *সহীহ বুখারী,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩; *সহীহ মুসলিম,* হাদীস নং ১০৭৩, ২৭২৬।

৫২. *বিশ্ব নবীর দাম্পত্য জীবন,* পৃ. ১৫১।

৫৩. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

৫৪. হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد، وعبد الله بن عبَّاس، وعُبيد بن السبَّاق، وكُريب مولى ابن عَبَّاس، وكُلْثُوم بن المُصْطَلِق، ومُجَاهِد بن جَبْر المكيُّ، وأبو أيُّوب المَراعيُّ الأَزْدِيُّ

দ্র. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

حَدَّثَ عَنْهَا : ابنُ عَبَّاس، وعُبَيْدُبنُ السبَّاق، وكُرَيْب، ومُجَاهِد، وأبو أيوب يحيى بنُ مالك الأزدي، وآخرون.

www.pathagar.com

৯. হযরত সাওদা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৫] তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) ইয়াহইয়া ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন সা'দ কারও কারও মতে ইব্ন আসাদ ইব্ন যুরারাহ আল-আনসারী।[৫৬]

হযরত সাওদা (রা) থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্যে একটি হাদীস সহীহ বুখারীতে স্থান লাভ করেছে।[৫৭]

উপসংহার

ইলমে হাদীসে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের অবদান এক বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁদের মধ্যে নয়জন হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তাঁরা অন্যান্য বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কাজ, ইচ্ছা ও মন-মানসিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। এজন্য প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনায় তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদানকারী। সারাবিশ্বের ইতিহাসে তাঁরা ছিলেন উজ্জ্বলতর নক্ষত্রস্বরূপ।

দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১।

৫৫. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৫১।

৫৬. *তাহযীবুত্-তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. হাফিয মিয্যী বলেন,

روى عنها : عبد الله بن عبَّاس، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن سَعْد ويقال : ابن أسعد بن زُرارة الأنصاري.

দ্র. *তাহযীবুল কামাল,* ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩৫১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

حدَّث عنها : ابنُ عَبَّاس، ويحيى بن عَبد الله الأنْصَارىُّ

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

৫৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

يروى لسَوْدَةَ خمسةُ أحاديث : منها في الصحيحين : حديث واحد عن البخاري.

দ্র. *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

www.pathagar.com

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD. DA 20/76 APRIL-JUNE 2006

ইসলামী চিন্তাধারায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ

- Scientific Indications in the Holy Quran- By Board of Editors
- Muslim Contribution to Science and Technology-By Board
- Islam in Bangladesh Through Ages-By Board of Editors
- Men of Letters Men of Science – Syed Ashraf Ali
- বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খণ্ড)-সম্পাদনা পরিষদ
- ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)-সম্পাদনা পরিষদ
- ছোটদের বিশ্বকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)-সম্পাদনা পরিষদ
- আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম - ৪র্থ খণ্ড)-সম্পাদনা পরিষদ
- ইসলামের ইতিহাস দর্শন-মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)
- স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব-মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)
- ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন-সম্পাদনা পরিষদ
- হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)-সম্পাদনা পরিষদ
- ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ-মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম
- আরবী প্রবাদ সাহিত্য-ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
- তাফসীরুল কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
- আল-আমসালুল কুরআন আল কারীম (আরবী) ড. আবদুল্লাহ্ আল মারূফ
- শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)-ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
- বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব-ড. মোঃ আবদুস সাত্তার
- ঈমান তত্ত্ব ও দর্শন-লেখক মণ্ডলী
- মি'রাজুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সংকলন
- সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম- সংকলন
- উমার ইবন আবদুল আযিয (র) ঃ জীবন ও কর্ম - ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্
- আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম - সংকলন
- ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম - ড. মোঃ আবদুল করিম
- ইসলামী দর্শন - সংকলন
- শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম - সংকলন
- আল-কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ - এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
- ইসলামী আইন - সংলকন
- ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি - সংকলন
- হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও বৈশিষ্ট্য - সংকলন
- হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান - ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম
- ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা - ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
- ঈসা খান - মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান
- আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ -মোহাম্মদ জাকির হুসাইন
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম-ড. মীর মনজুর মাহ্‌মুদ
- মুনশি শেখ জমিরুদ্দীন- মুহাম্মদ আবদুর রউফ
- আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য - ড. মোঃ গোলাম মাওলা
- রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি- মোঃ মাহফুজুর রহমান
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী- ড. মাহবুবা রহমান
- মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) : ও তাঁর আল জামী'- ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ
- ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ- ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ